বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(প্রাচীন পর্যায়)

শ্রীনিখিলেশ পুরকাইত, এম. এ.

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

বি. এন. কলেজ, ধুবড়ী

: পরিবেশক :

জে. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রগতি প্রকাশনী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীসিতাংশুকুমার ভট্টাচার্য
অরুণাচল
অশোকনগর, ২৪ পরগনা।

প্রথম প্রকাশ :—ভাদ্র, ১৩৭২,

মূল্য—দশ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২সি শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের সূচনা থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিকাশের ধারাটিকে "বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস—প্রাচীন পর্যায়" গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। রচনাকালে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মনের অনেক সংশয় ও সন্দেহ দূর করেছি এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের নিকট হতে অশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। এঁরা উভয়েই আমার শিক্ষক। এঁদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

গ্রন্থটি প্রকাশকালে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর শ্রীবিনয়কুমার হাজরা ও শ্রীমতী শেফালী হাজরা। এঁদের প্রতি রইল আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ইতি—

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বি. এন. কলেজ, ধুবড়ী। শ্রীনিখিলেশ পুরকাইত
১।৮।৬৫

যাঁরা আমার সাঁজ-সকালে
জ্ঞানের দীপে জ্বালিয়ে দিলেন আলো
—তাঁদের উদ্দেশে

Bangla Sahityer Itihash
—Prachin Paryaya

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

মঙ্গল কাব্যের ধারা

প্রথম অধ্যায়

পৃষ্ঠাঙ্ক

তৃতীয় খণ্ড

অনুবাদ সাহিত্যের ধারা

চতুর্থ খণ্ড

লোকসাহিত্যের ধারা

প্রবেশিকা

বাংলা ও বাঙালী

মানুষের জীবন-যৌবন-ধন-মানের মত তার গড়া রাজ্য-সাম্রাজ্যও ভেসে চলেছে জগতের কালস্রোতে। পথে পথে তার রূপের, তার রঙের, তার চেহারার কত পরিবর্তন হচ্ছে। জগৎকে জীবনকে জানতে গেলে তাই বর্তমানের দুটি চর্মচক্ষু মেলে দেখলে চলবে না, তাকে জানতে গেলে প্রয়োজন, সর্বকাল-দর্শী মর্মচক্ষু। বাংলা দেশের রূপসন্দর্শনকালে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

ভারতের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ছোটবড় প্রত্যেকটি রাজ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা দেশেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ভারতসম্রাটগণ বিভিন্নযুগে বাংলার বিভিন্ন অংশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাই বাংলাদেশের একটি স্থায়ী রূপসীমা কল্পনা করা মুশকিল। তবে সাহিত্য যদি জাতির মানসমুকুর হয় এবং ভাষাই যদি হয় সেই সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন তাহলে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা জুড়ে দীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর ভাষা-সাহিত্যের সৌধ-বনিয়াদ গড়ে উঠেছে তাহাই বাংলার প্রকৃত রূপসীমা।

বাংলার রূপসীমা

এদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়,—উত্তরে তুষারমৌলী হিমালয়, নেপাল, সিকিম ও ভুটানরাজ্য; উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ভাগীরথীর উত্তর সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম পর্বতশ্রেণী; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতালপরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেয়ঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের পার্বত্যময় অরণ্য-ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর—এই হল বাংলার প্রকৃত রূপসীমা।

আমরা বাঙালী যে দেশে বাস করি, তার নাম 'বাংলা'। প্রাচীন হিন্দুযুগে ইহার এরূপ কোন বিশেষ নাম ছিল না। ইহা কয়েকটি জনপদ বা অঞ্চলে

বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বঙ্গে গৌড়, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চল ছিল। কালক্রমে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল একটি অবিভক্ত বৃহৎ দেশে পরিণত হলে ইহার নাম হয় 'বাংলা'। 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' থেকে এই 'বাংলা' নামের উৎপত্তি।

বাংলা নামের উৎপত্তি

মোগল যুগে আমাদের দেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল তাঁর সুবিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাংলা নামের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে এদেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ'-এর সহিত 'আল' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'বাংলা' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে। 'আল' শব্দের অর্থ শস্যক্ষেত্রের আলি বা ছোটবড় বাঁধও বোঝাতে পারে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক, কৃষিপ্রধান। কাজেই বন্যানিরোধ ও কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য ছোটবড় অনেক বাঁধের প্রয়োজন সবসময়ে রয়েছে। প্রাচীন লিপিতে বাঁধের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাঁধবহুল বা আলিবহুল বাংলাদেশের এই উপরিভাগের চিত্র আবুল ফজলের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি আলিবহুল বঙ্গদেশকে বাংলা বলেছেন। ভাষাতত্ত্বের বিচারে অবশ্য আবুল ফজলের বাংলা শব্দটির ব্যুৎপত্তি যথার্থ বলে মনে হয় না। প্রাচীন 'বঙ্গাল' শব্দটিই যে কালোচিত ধ্বনিপরিবর্তন লাভ করে 'বাংলা', 'বাঙ্‌লা' বা 'বাঙ্গালা' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। *

মধ্যযুগে ইউরোপীয় পর্যটকগণের (Gastaldi—1560, Hondivs—1613, Hermann Moll—1710, Van den Broucke—1660, Izzak Tirion—1730, F. de Witt—1726—বাঙালীর ইতিহাস—নীহার রঞ্জন রায়) নক্শায় ও বিবরণে এদেশের নাম পাওয়া যায় Bengala। ইংরেজরা এদেশের নাম বরাবরই Bengal বলে এসেছেন। এদেশের ভাষাকে তাঁরা বলতেন Bengal Language। ১৭৭৮ খ্রীঃ হ্যালহেড ইংরেজী ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন তার নাম—Grammar of the Bengal Language।

---

* 'বাংলা' শব্দটি অনার্য ভাষা ('বোরো'—বাংলার উত্তরপূর্ব প্রত্যন্তে, হিমালয়ের পূর্বাংশের পাদদেশে প্রচলিত) থেকে আসতে পারে। বোরো ভাষায়—'বা°' অর্থ শস্যক্ষেত্র এবং 'লা' অর্থ বিস্তৃত। গোটা বাংলাদেশটা যখন একটা বিরাট শস্যক্ষেত্র, কবির ভাষায়, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, তখন ইহার নাম যে হবে 'বাংলা' তাতে আর আশ্চর্য কি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী কবি-সাহিত্যিকগণ সমগ্র বাংলাদেশ বোঝাতে গিয়ে কখন গৌড় (গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি—মধুসূদন), কখন বঙ্গ (এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা—ঈশ্বর গুপ্ত ; জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল—মধুসূদন), আবার কখনও বা বাংলা শব্দটি (আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—রবীন্দ্রনাথ) ব্যবহার করেছেন।

বাঙালী মিশ্র জাতি। আর্যাগমনের পূর্বে বাংলাদেশে অনার্য ভাষাভাষী কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতি বসবাস করত। ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর। যে মানব-গোষ্ঠী হতে এদের উদ্ভব তাকে বলা হয় 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' বা 'অস্ট্রিক'। কেহ কেহ ইহাদের 'নিষাদ জাতি'ও বলেছেন। অস্ট্রিক বা নিষাদ জাতি চাষবাস করে জীবনধারণ করত। লৌহ-তাম্রের ব্যবহারও তারা শিখেছিল। সমতলভূমিতে ও পাহাড়ে জায়গায় ধানচাষের প্রণালী তারাই উদ্ভাবন করে। কলা, নারকেল, পান, সুপারি, নানাবিধ সব্জী, আদা, হলুদ প্রভৃতি তারা চাষাবাদ করত। আনুমানিক পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে অস্ট্রিক জাতির আগমন হয় বাংলা দেশে। বাংলায় ব্যবহৃত অস্ট্রিক জাতির ব্যবহার্য অনেক শব্দ—ডাঙ্গা, ডিঙ্গা, ঢিল, ঢিপি, ডিম্ব, ঝিঙ্গা, চিঙ্গড়ি, মুড়ি, মুড়কি, হুড়ুম, খড়, খুঁটি, বাখারি, খামার, ঝোপ, চোঙা, ডোম, নারকেল, তাম্বুল, গুবাক, বাইগন (বেগুন), দামোদর, গঙ্গা, কপোতাক্ষ (কবতক্ষ) ইত্যাদি অস্ট্রিক জাতির স্মৃতি আজও বহন করে আসছে।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি

রিজলি (Risley) প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদদের মতে, মোঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এ মত বর্তমানে অচল। বাংলার উত্তরপূর্ব অঞ্চলে মোঙ্গলীয় পার্বত্য জাতি বসবাস করলেও বাঙালীর ধমনীতে ইহাদের রক্ত প্রবাহিত নেই।

বাঙালী জাতি সৃষ্টিতে দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের প্রভাব বর্তমান। নৃতাত্ত্বিক-গণের মতে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে দ্রাবিড়রা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। ইহাদের আদি বাস ছিল ইরান, ইরাক, এশিয়া মাইনর, গ্রীস ও গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ। সভ্যতায় ইহারা খুবই উন্নত ছিল। দ্রাবিড় ভাষার অনেক শব্দ—খোকাখুকি, ছেলেপিলে, খাড়ি, ঘোঁটা, গণ্ডগোল ইত্যাদি বাংলায় প্রচলিত আছে।

নৃতাত্ত্বিকগণ বাঙালী জাতির উপর নেগ্রিটো (ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো) জাতির প্রভাব

কল্পনা করেন। এই জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রমাণ মেলে না; বাঙালী-রক্তে ইহার উপাদান খুব সম্ভব নেই। আসামের নাগাদের মধ্যে ও রাজমহল পাহাড়ের দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে নেগ্রিটো জাতির কিছু কিছু মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষা বা বাংলার জনজীবনে ইহাদের রেখামাত্র চিহ্নেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আর্যপ্রভাবের পর থেকে অনার্যসম্ভূত বাঙালী জাতি শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, শক্তি-সাহসে সুসভ্য ও সু-উন্নত জাতিতে পরিণত হয়। মৌর্য রাজগণের আমল থেকে বাংলা দেশে আর্যীকরণের পালা শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দিকে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ্‌ (Hiuen Thsang) যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি সমগ্র বাংলাদেশকে আর্যভাষী হয়ে উঠতে দেখে যান। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, মৌর্যযুগ (খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) থেকে শুরু করে হিউ-এন সাঙের আগমনকাল (খ্রীঃ ৭ম শতক) পর্যন্ত এই হাজার বছরের মধ্যে বাঙালীর জনজীবনধারায় আর্যসংস্কৃতির পাকা রঙ ধরে। গুপ্ত-সম্রাটগণ পাণ্ডববর্জিত এই বাংলাদেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত সাহিত্যকে সংস্থাপিত করার জন্য আর্যাবর্ত থেকে ব্রাহ্মণদের ভূমি দিয়ে বৃত্তি দিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তিকালে আর্যাবর্তীয় ব্রাহ্মণগণ বাংলায় এসে উত্তর ভারতের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেন এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতির সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মিশে এক হয়ে যান।

বাংলায় আর্যদের আগমনের পরে ভোটচীন জাতি (Sino-Tibetan) হিমালয় পার হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে। বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ইহার প্রভাব এখনও বিদ্যমান। বাংলার জনজীবনধারায় আর্যধারার পালিশ ইতিপূর্বে পড়ে যাওয়ার জন্য বাঙালীর উপর ইহাদের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেই তাই ইহারা সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

বাঙালীর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য

বাংলাদেশে আর্য-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব থেকে আর্যেরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপন

করেন। ইহাদের বিদ্যাচর্চা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং আটপৌরে বা ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত-উদ্ভূত প্রাকৃত-অপভ্রংশ। গুপ্তযুগ থেকে শুরু করে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী হতে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) দীর্ঘকাল ধরে আর্যগণ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন। শিলালিপি, তাম্রলিপি, শাস্ত্র-সংহিতা, কাব্য-নাটক, শ্লোক-সংগ্রহ ইত্যাদির মধ্যে এসব লেখার নমুনা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে যে সংস্কৃত সাহিত্য গভীরভাবে অনুশীলিত হয়েছিল তার প্রমাণ গৌড়রীতি। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকগণ গৌড়রীতিকে নিপুণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আলংকারিকগণ কাব্যে বিশিষ্ট পদরচনারীতিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—'সা ত্রিধা—বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চ'। গৌড়রীতিতে সমাসবহুল শব্দ ও উৎকট শব্দ প্রয়োগের একটু বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে', রাজশেখরের 'কাব্য-মীমাংসা'য়, ভামহের 'কাব্যালংকারে' বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে' গৌড়রীতির উল্লেখ রয়েছে।

সংস্কৃতসাহিত্য ও গৌড়রীতি

প্রায় সহস্র বৎসর ধরে (খ্রীঃ পূঃ ২য়-৩য় শতাব্দী হতে খ্রীঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী) বাঙালী কবি-পণ্ডিতগণ শিলাখণ্ডে বা তাম্রপটে যে লিপি প্রশস্তি রচনা করেন তাহার ভাষায় গৌড়রীতির অনুসরণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে গৌড়রীতিতে শব্দ সমাবেশ ও সমাসের উৎকট আতিশয্য থাকা সত্ত্বেও লিপিলেখনের ভাষায় স্থানে স্থানে বেশ কবিত্বশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে পদ্যে রচিত দু'একটি লিপি-প্রশস্তির উল্লেখ করা হচ্ছে।

লিপিলেখনে সংস্কৃত ভাষা

১। **ধর্মপালের খালিমপুর লিপি—**

গোপৈঃ সীম্নিবনচরৈর্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতি চত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ।
লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকরুদ্গীত-মাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়ত স্ত্রপা-বিচলিতা-নম্রং সদৈবাননং ॥

অনুবাদ: সীমান্ত দেশে গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রাম-

সমীপে জনসাধারণ কর্তৃক, (গৃহ) চত্বরে শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিকসমূহ কর্তৃক এবং বিলাসগৃহের শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্র-ভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে। (গৌড় লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কৃত অনুবাদ)।

২। বিজয়সেনের প্রশস্তি—

বক্ষোংশুকাহরণ সাধ্বস কৃষ্ট মৌলি মাল্যচ্ছটা হতরত্নালয়দীয় ভাসঃ।
দেব্যাস্ত্র পামুকুলিতং মুখমিন্দুভাতিবীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ॥

অনুবাদ: বক্ষের অংশুক হরণ করিলে যখন লজ্জায় আকৃষ্ট শিরোমাল্যের ছটায় রতালয়দীপের দীপ্তি ম্লান হইল, তখন ইন্দুকিরণে লজ্জায় মুকুলিত দেবীর মুখদর্শনে শম্ভুর বদনসমূহের যে হাস্য তাহার জয় হউক। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন কৃত অনুবাদ)।

সংস্কৃত ভাষা দীর্ঘকাল অনুশীলনের ফলে বাংলাদেশে কিছু ন্যায়-বৈশেষিক সংক্রান্ত তর্কবিদ্যা, স্মৃতিসংহিতা, আয়ুর্বেদ সংহিতা, ব্যাকরণ-অভিধান, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ন্যায়বৈশেষিক সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধর হুগলী জেলার ভুরশুট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অসাধারণ মেধা-শক্তির পরিচয় দেন। অভিজাতবর্গের বাঙালীগণ আর্য-সংস্কৃতির প্রবর্তনার দ্বারা বাঙালী-সমাজের একটা স্থায়ী বিশুদ্ধ রূপ দান করার উদ্দেশে অনেকগুলি স্মৃতিসংহিতা রচনা করে যান। ইহাদের মধ্যে ভবদেবের 'ব্যবহার তিলক', 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', 'ব্যবহারমাতৃকা', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত গ্রন্থাবলীতে বাঙালীর সমাজগঠনের বিচিত্র প্রকরণ নিপুণভাবে বর্ণিত করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাচীন বাঙালী যে উল্লেখ্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিচিত্র আয়ুর্বেদ সংহিতায়। পালকাপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' (হস্তিচিকিৎসাশাস্ত্র), চক্র-পাণি দত্তের 'চিকিৎসা সারসংগ্রহ', বঙ্গসেনের 'চিকিৎসা সারসংগ্রহ' ইত্যাদি সেযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। বাঙালী-রচিত ব্যাকরণ-

সংস্কৃত শাস্ত্র-সংহিতা
ব্যাকরণ-অভিধান

অভিধানেরও কিঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থাপিত করা যেতে পারে চন্দ্রগোমীর 'ব্যাকরণ', সুভূতিচন্দ্রের 'কামধেনু' (অমরকোষের টীকা) ও বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের 'টীকা সর্বস্ব' (অমরকোষের টীকা)।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রধান শাখা মহাযান ধর্মমতের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। অনুমিত হয় পালযুগে (৮ম—১১শ শতাব্দীর মধ্যে) বাংলাদেশে বহু তান্ত্রিক বৌদ্ধগুরুর আবির্ভাব ঘটে। ইঁহারা সিদ্ধাচার্য নামে অভিহিত হতেন। ইঁহারা সংস্কৃতে বহু মৌলিক গ্রন্থ, টীকাটিপ্পনী ও গীতিকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থগুলির নিদর্শন বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। তিব্বতে 'তেঙ্গুর' নামক গ্রন্থমালিকায় ঐ সকল সিদ্ধাচার্য ও তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল; ইহাদের কিছু কিছু এখনও তিব্বতে পাওয়া যায়। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে মহাজেতারি, কনিষ্ঠজেতারি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, কুক্কুরীপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ, বিরূপ প্রভৃতি বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ—শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইঁহারা সকলেই সংস্কৃতে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। ইহাদের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শীলভদ্রের 'আর্যবুদ্ধভূমিব্যাখ্যান', শান্তিদেবের 'বোধিচর্যাবতার,' লুইপাদের 'অভিসময় বিভঙ্গ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ-শাস্ত্র

বাঙালী-রচিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য 'রামচরিত'। ইহা রামায়ণের কাহিনী অনুসরণে লেখা। কাব্যটির রচয়িতা অভিনন্দ খুব সম্ভব দেবপালের সভাকবি ছিলেন (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে)। পালরাজাদের আমলে (১০ম শতাব্দীর শেষভাগে) রামায়ণ-কাহিনী এবং রামপালের জীবনী একই সঙ্গে দ্ব্যর্থের সাহায্যে বিবৃত হয়ে রামচরিত নামে আর একখানি ঐতিহাসিক শ্লেষকাব্য রচিত হয়েছিল। রচয়িতার নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। ইনি সম্ভবত রামপালের পুত্র মদনপালের অনুচর ছিলেন। গ্রন্থটিতে সমসাময়িক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গিয়েছে। অনুমান করা যায় কবি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখ্য ঐতিহাসিক কাব্যাবলির আদর্শে (বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', হেমচন্দ্রের

সংস্কৃত কাব্য-নাটক

'কুমারপালচরিত,' কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি) কাব্য রচনা করেছিলেন। ইহাতে যে কবি একাধারে রামচন্দ্র ও রামপালের কাহিনী বিবৃত করেছেন তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে কবির আত্মপরিচয়ে। সেখানে কবি বলেছেন—

অবদানং রঘুপরিবৃঢ়গৌড়াধিপ রামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগ রামায়ণমিদং কবিরপি কলিকালবাল্মীকি॥

অনুবাদ: রঘুপতি রামদেব (রামচন্দ্র) ও গৌড়াধিপ রামদেব (রামপাল)—এই দুই রাজার এই অবদান বা প্রশস্তকর্মের ইতিহাস কলিযুগের রামায়ণরূপে পরিগণনীয়, এবং এই কবিও (সন্ধ্যাকর নন্দী) কলিকালের বাল্মীকিস্বরূপ ছিলেন। (রামচরিত—ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত)।

অনুমিত হয় এ যুগে বাংলাদেশে কয়েকখানি উল্লেখ্য নাটক বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', নারায়ণ ভট্টের 'বেণীসংহার', মুরারির 'অনর্ঘরাঘব', ক্ষমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' রচিত হয়েছিল। কিন্তু এগুলি বাঙালী-রচিত কিনা (অর্থাৎ নাট্যকারগণ বাঙালী কিনা) সে বিষয়ে কোন প্রামাণ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। পণ্ডিত-ঐতিহাসিকগণের মতে নাট্যকারদের কেহই বাঙালী ছিলেন না। সেজন্য তাঁদের গ্রন্থাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা স্থগিত রাখা হল।

বাঙালী-রচিত প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও সেনযুগে কাব্যরচনায় বাঙালী কবিগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। হিন্দুরাজগণ বরাবরই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণসেনের সভা-কবিবর্গ—উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য, ধোয়ী, শরণ এবং জয়দেব কাব্যরচনায় অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকের রচিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। উমাপতি ধরের রচিত কেবল কয়েকটি প্রশস্তি ও কতকগুলি প্রকীর্ণ শ্লোক পাওয়া গিয়েছে। শ্রীধর দাসের শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' তাঁর রচিত নব্বইটি শ্লোক গৃহীত হয়েছে। কয়েকটি শ্লোক ছাড়া পণ্ডিত শরণেরও কোন কাব্য পাওয়া যায়নি। তাঁর কিছু কিছু শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ও রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'তে স্থান পেয়েছে। গোবর্ধন আচার্য প্রাকৃত কবি হালের 'গাথাসপ্তশতী'র আদর্শে 'আর্যাসপ্তশতী' কাব্য রচনা করেন; কিন্তু রসসম্ভোগের দিক থেকে কাব্যটি প্রাকৃত কবির সমকক্ষ নহে। কাব্যটিতে সাতশত বিচ্ছিন্ন আদিরসাত্মক কবিতা রয়েছে। পরিহাস-রসিকতায় গোবর্ধন যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার

পরিচয় 'আর্যাসপ্তশতী'তে বিদ্যমান। যেমন, কন্যার শ্বশুরবাড়ী যাত্রাকালীন দৃশ্য বর্ণনকালে কবি লিখছেন,—

অস্যাঃ পতিগৃহগমনে করোতি মাতা অশ্রুপিচ্ছিলাঃ পদবীম্।
গুণগর্বিতা পুনরসৌ হসতি শনৈঃ শুষ্করুদিতমুখী॥

অনুবাদ: কন্যা পতিগৃহে গমনের কালে মাতা অশ্রুজলে পথ ভিজাইয়া ফেলিতেছে, কিন্তু সৌভাগ্যগর্বিতা কন্যা, মৃদু মৃদু হাসিতেছে আর বাহিরে শুষ্কমুখে কান্নার ভান করিতেছে। (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যে ধোয়ী বোধ হয় সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি ছিলেন। স্বয়ং রাজা তাঁকে 'হস্তিব্যূহং কনক কলিতং চামরং হেমদণ্ডং' সহ কবিচক্রবর্তী বা কবিরাজ উপাধি প্রদান করেছিলেন। ধোয়ী প্রখ্যাত 'পবনদূত' কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের কাহিনী-পরিকল্পনা ও রচনারীতি অনুকরণে রচিত। এই কাব্যের নায়ক হলেন রাজা লক্ষ্মণসেন। দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে কুবলয়বতী নাম্নী এক গন্ধর্ব কন্যা লক্ষ্মণসেনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পরে রাজা গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করলে কুবলয়বতী অন্তরের নিদারুণ বিরহবার্তা জ্ঞাপনের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব পবনকে দূত রূপে রাজার নিকট প্রেরণ করেন। সংক্ষেপে ইহাই 'পবনদূতে'র কাহিনী। কবি মন্দাক্রান্তা ছন্দে একশত চারটি শ্লোকে কাহিনীটি বিবৃত করেন। কাব্যটির স্থানে স্থানে কবির বর্ণনশক্তির অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সুহ্ম-দেশের বর্ণনা—

গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংস—
শোধ্যাসত্বুচ্চৈস্ত্বয়িরসময়ো বিস্ময়ঃ সুহ্ম দেশঃ।
শোত্র ক্রীড়াভরণপদবীঃ ভূমিদেবাঙ্গ নানাং
তালীপত্রং নবশশিকলা কোমলং যত্র ভাতি॥

অনুবাদ: সেই সুহ্মদেশ, উহার পরিসরভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত। সুধা-ধবলিত প্রাসাদরাজি উহার কর্ণভূষণ স্বরূপ। সেই রসময় দেশে উপস্থিত হইলে, তুমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবে। সেখানে নবশশিকলার ন্যায় কোমল তালপত্র ব্রাহ্মণ মহিলাদের কর্ণভূষণ হইয়া থাকে। (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডাঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।)

লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যে কবিত্বশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন 'গীত

গোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই কাব্যটির প্রধান উপজীব্য। রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কোন গ্রন্থ জয়দেবের পূর্বে রচিত হয়নি। পরবর্তিকালের বৈষ্ণবকবিগণ এই কাব্যটির দ্বারা বহুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব রায় রামানন্দসনে রাত্রিদিনে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্য আস্বাদন করতেন। জয়দেব তাই বৈষ্ণব ভক্ত-কবিদের নিকট মহাজন। এজন্য কবি জয়দেব সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচ্য বিষয় "বৈষ্ণবপদাবলী" আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করা হবে।

সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ

ভিন্ন কবির রচিত সংস্কৃত শ্লোকাবলীর দুখানি সঙ্কলন গ্রন্থ— 'কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' আবিষ্কৃত হয়েছে। সঙ্কলন গ্রন্থ দুটির অধিকাংশ শ্লোক আদিরসাত্মক হলেও ইহাতে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি ও বাঙালী-হৃদয়ের চিরন্তন লীরিক উচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পরবর্তিকালে বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গল-কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থদুটির একটা নাড়ীর যোগ রয়েছে। প্রথমত, এই সঙ্কলন গ্রন্থদ্বয়ে বাঙ্গালা প্রথম তার প্রাণের আসল সুরটি (গীতিপ্রাণতা) উপলব্ধি করতে পেরেছিল, যার প্রভাবে প্রাচীন গীতিসাহিত্যের ধারাটি বিশেষ ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইহাতে দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকা, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, ও গার্হস্থ্য জীবনের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তারই ছায়াসম্পাত ঘটেছে পরবর্তিকালের মঙ্গলকাব্যসমূহে। এসকল কারণে সঙ্কলন গ্রন্থদুটির বিস্তৃত পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র পুঁথি নেপালে আবিষ্কৃত হয়। পুঁথিটির প্রথমদিকের কিয়দংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পুঁথিটির নাম ও ইহার সঙ্কলয়িতার নাম জানা যায়নি। পুঁথিটির টীকার একস্থলে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' কথাটি উল্লিখিত থাকায় উহার সম্পাদক এফ. ডবলিউ. টমাস গ্রন্থের নামকরণ করেন 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক, রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক, প্রকৃতিবিষয়ক (বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতির নিখুঁত চিত্র) শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। শ্লোকগুলির অধিকাংশই আদিরসাত্মক। শ্লোকগুলি মোট একশত এগার জন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবির রচিত। তন্মধ্যে কালিদাস-ভবভূতি, বাঙালী বলে অনুমিত বন্দ্য তথাগত, গৌড় অভিনন্দ, মধুশীল, শ্রীধর নন্দী, রতিপাল প্রভৃতির নাম রয়েছে।

শ্লোক সংগ্রহের অপর গ্রন্থটি—'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলন করেন শ্রীধর দাস। সঙ্কলয়িতা লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত-চূড়ামণি বটুদাসের পুত্র। গ্রন্থটি সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সঙ্কলিত হয়। ইহাতে চারশত পঁচাশী (৪৮৫) জন জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা কবির দুহাজার তিনশত সত্তরটি (২৩৭০) পদ গৃহীত হয়েছে। সঙ্কলয়িতা শ্লোকগুলিকে পাঁচটি 'প্রবাহে' এবং প্রত্যেক প্রবাহকে আবার নানা 'বীচি'তে বিভক্ত করেছেন। কবিদের মধ্যে ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরি, ভামহ, রাজশেখর, বিশাখদত্ত প্রভৃতি রয়েছেন; আর সেই সঙ্গে লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ বাঙালী কবিও রয়েছেন। দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকা, ঋতু বর্ণনা, গাছ-পালা, পশুপক্ষী প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ক শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

সদুক্তিকর্ণামৃত

বাঙালী-রচিত প্রাকৃত সাহিত্যের নিদর্শন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে দুখানি প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থে—'গাথাসপ্তশতী' ও 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' বাঙালী জীবনের অনুরূপ কিছু কিছু চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এমন কি স্থানে স্থানে ইহার ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু অনেকটা বাংলা বলেই মনে হয়। সঙ্কলন গ্রন্থ দুটি আলোচনা করলে বাঙালী জীবনের কিছু কিছু নতুন তথ্য জানা যাবে, এ-কারণে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া হল।

প্রাকৃত সাহিত্য

মহাকবি হাল মারাঠী প্রাকৃতে 'গাথাসপ্তশতী' রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন ইনি দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন বংশের (খ্রীঃ পূঃ ২য় বা ১ম—খ্রীঃ ১ম শ) হাল নামক কোনও এক রাজা। আবার কারো কারো মতে খ্রীঃ ৫ম শতকের শেষে সালবাহন নামক কোনও রাজা গ্রন্থটি রচনা করেন এবং ইনিই হাল নামে পরিচিত। 'গাথাসপ্তশতী'র সর্বপ্রধান আকর্ষণ হল—ইহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে এবং ইহাতে রাধার উল্লেখই রাধার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগৃহীত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হল—

গাথাসপ্তশতী

মুহমারুএণ তং কণহ গোরঅং রাহিআএঁ অবণেন্তো।
এতাঁণ বল্লবীনং অন্নান বি গোরঅং হরসি॥

অনুবাদ: হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে

খুলি অপনীত করিয়া পুরোবর্তিনী অন্যান্য বল্লবীগণের গৌরব হরণ করিতেছে। (ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক কর্তৃক অনূদিত)।

'প্রাকৃতপৈঙ্গল' সম্ভবত ১৪শ শতাব্দীতে কাশীধামে সঙ্কলিত হয়। ইহা শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত এবং ইহার সঙ্কলনকর্তার নাম পিঙ্গল।

প্রাকৃতপৈঙ্গল

গাথাসপ্তশতী অপেক্ষা প্রাকৃতপৈঙ্গলের ভাব-ভাষা অনেক পরিমাণে বাংলারই অনুরূপ এবং ইহাতে বাঙালী জীবনের ছায়াসম্পাত ঘটেছে। মনে হয় ইহার কিছু কিছু শ্লোক বাঙালী কবিদের দ্বারা রচিত। রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক শ্লোকও ইহাতে রয়েছে। নৌকা-বিলাসের একটি উপভোগ্য চিত্র ইহাতে পাওয়া গিয়েছে।

অরে রে বাহহি কাহ্ন নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগইণ দেহি।
তুহুঁ এখণই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি॥

অনুবাদ: ওরে রে, কৃষ্ণ, নৌকা বাইছ, ডগমগ ছাড়, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করে দাও এবং যা চাও তা লও।

বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের প্রাত্যহিক চিত্র ইহাতে সজীব হয়ে উঠেছে,—

ওগ্গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা, দুগ্ধ সজুত্তা॥
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা, খাঅ পুণ্যবন্তা॥

অনুবাদ: কলাপাতার উপর ওগরাভাত। গাওয়া ঘি, সুস্বাদু দুধ, মৌরলা মাছ, নালতে শাক (কান্তা) কান্তকে দিচ্ছেন। আহার করছেন পুণ্যবান (কান্ত)।

খ্রীঃ ৮ম হতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বহু মৌলিক গ্রন্থ ও টীকাটিপ্পনী রচিত হয়। মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়

অপভ্রংশ সাহিত্য

অপভ্রংশ ভাষায় রচিত অনেকগুলি মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। নেপালের রাজদরবার থেকে সর্বপ্রথম শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে সরহ ও কাহ্নপাদের দোহাকোষ, ডাকার্ণব, চর্যাচর্য-বিনিশ্চয় প্রভৃতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে আনেন।

পরবর্তিকালে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতানুযায়ী প্রাচীনতম বাংলাভাষার নিদর্শনরূপে একমাত্র 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থখানি গৃহীত হয় এবং বাকীগুলি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ইহার পর ১৯২৯ খ্রীঃ বাগচী মহাশয় পুনরায় নেপালের রাজদরবার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত সরহের বত্রিশটি দোহা এবং তিল্লোপাদের দোহাকোষ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। ইহা যে অপভ্রংশে রচিত সাহিত্যিক নিদর্শনের একটি অভিনব সংযোজনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিত সমালোচকগণের ধারণা সরহ, কাহ্ন এবং তিল্লো তিনজনেই বাঙালী এবং তাঁরা একই সময়ে শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং বাংলায় দোহা ও পদ রচনা করেন। ডাকার্ণবের লেখক সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। প্রবাদ-প্রবচনের ডাক-খনার সঙ্গে ডাকার্ণবের লেখক ডাকের কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। তেঙ্গুর গ্রন্থমালাতেও ডাকের কোন উল্লেখ নেই।

দোহাকোষের স্বরূপ

দোহাকোষগুলিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের নিন্দা-কুৎসা রটনা করা হয়েছে এবং সহজিয়া দর্শন ও সাধনতত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তিল্লোপাদ একস্থলে বলেছেন,—

দেব ন পুজহু তিত্থণ জাবা।
দেবপুজাহি ন মোক্‌খ পাবা॥

অনুবাদ : দেবতাকে পূজা করো না, তীর্থে যেয়ো না। (কারণ) দেবপূজায় মোক্ষ লাভ হয় না।

সরহ বলেছেন,—

জই ণগ্‌গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণে অত্থি সিদ্ধি তা জুবই ণিঅম্বহ॥

অনুবাদ : নগ্ন হলেই যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহলে শৃগাল কুকুরেরও মুক্তি হবে। লোমোৎপাটন করলেই যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তাহলে যুবতী-নিতম্বেরও (সিদ্ধিলাভ) হবে।

সরহ অন্যত্র বলেছেন,—

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জঁ।
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ॥

কিন্তহ তিথ তপোবন জাই।

মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী ণহাই ॥

অনুবাদ: দীপের দ্বারা কি হবে? নৈবেদ্যের দ্বারা কি হবে? মন্ত্রসেবায় বা কাজ কি? তীর্থ তপোবনে গিয়েও কি কাজ হবে? স্নান করলেই কি মোক্ষলাভ হয়?

কাহ্নপাদও বলেছেন,—

আগম-বেঅ-পুরাণেঁ পণ্ডিআ মাণ বহন্তি।

পক্ক সিরিফ লেঁ অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি ॥

অনুবাদ: আগম বেদ-পুরাণ পড়ে পণ্ডিতগণ বৃথা দম্ভ করে থাকেন। যেমন পাকা বেলের চারিদিকে ভ্রমর বৃথা ঘুরে মরে।

সহজিয়াগণের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহার সবই রয়েছে মানুষের দেহের মধ্যে। মানুষের দেহই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ। দেহের মধ্যে যে সত্য তাহাই সহজ স্বরূপ—তাহাই বুদ্ধ-স্বরূপ। দোহাকারগণ তাই বলেছেন,—

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।

পই-দেক্‌খই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥

অনুবাদ: ঘরে (দহ-ঘরে) আছে, বাইরে জিজ্ঞাসা করছে। (ঘরে) পতি (সহজ-স্বরূপ বা বুদ্ধ-স্বরূপ) দেখছে, কিন্তু প্রতিবেশীকে (তার খোঁজ) জিজ্ঞাসা করছে।

বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥

বাংলা লিপির উদ্ভব ঘটে বাংলা ব্রাহ্মী লিপি হতে। সম্রাট অশোকের পূর্ব থেকে এই লিপির উৎপত্তি হয় এবং অশোকের সময়ে ইহা একটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোক তাঁর অধিকাংশ শাসনমালা ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ করেন। এরপর থেকে এই লিপি সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতীয় লিপিসমূহের উদ্ভব ঘটায়। শুধু ভারতীয় লিপি নহে বহির্ভারতীয় বিবিধ লিপি—সিংহলী, ব্রহ্মী, শ্যামী, যবদ্বীপী, তিব্বতী এই ব্রাহ্মী লিপি হতেই জন্মলাভ করে।

অশোকের সময়ে ব্রাহ্মীলিপির সমকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে খরোষ্ঠী নামে

অপর একটি লিপির প্রচলন ছিল। ইহা ডান হতে বামদিকে লেখা হত। পাঞ্জাব পর্যন্ত খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার চলত। অতি অল্পকালের মধ্যে এই লিপি লোপ পেয়ে যায় এবং ব্রাহ্মী লিপি ইহার স্থান অধিকার করে। অশোকের দুখানি মাত্র অনুশাসনে—সাহাবাজগঢ়হি ও মান্সেরাতে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার দেখা যায়।

অশোকের পর ব্রাহ্মী লিপির কিছু কিছু বিবর্তন ঘটতে থাকে। স্থানীয় লোকের রুচিভেদে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে গুপ্তরাজগণের পূর্ব পর্যন্ত ইহা তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বর্ণমালার প্রচলন শুরু হলেও তাদের মধ্যে খুব একটা প্রভেদ ছিল না। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের বর্ণমালা পড়তে পারত। গুপ্তযুগেই প্রথম প্রাদেশিক বর্ণমালার স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ বেড়ে ওঠে। খ্রীঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পূর্বভারতে ও পশ্চিমভারতে দুটি পৃথক বর্ণমালার উদ্ভব ঘটে। পূর্বভারতীয় বর্ণমালা ('কুটিল') থেকে বাংলা বর্ণমালা এবং পশ্চিমভারতের বর্ণমালা ('নাগর') থেকে দেবনাগরী বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।

পূর্বভারতীয় বর্ণমালার নিদর্শন পাওয়া যায় সমাচার দেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনে। সপ্তম থেকে নবম শতক পর্যন্ত এই বর্ণমালার পরিবর্তন হতে থাকে। অতঃপর প্রথম মহীপালের সময়ে (১০ম শতক) এই পূর্বভারতীয় বর্ণমালায় বাংলা বর্ণমালার আভাস বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহীপালের বাণগড় লিপিতে ব্যবহৃত অ, উ, ক, খ, গ, ধ, ন, ম, ল, এবং ক্ষ অনেকটা বাংলা অক্ষরের আকার ধারণ করে। এরপর দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলা লিপি নিজস্ব রূপ লাভ করে। দ্বাদশ শতকের শেষে ও ত্রয়োদশ শতকের প্রথমের দিকের তাম্রশাসনে আধুনিক বাংলা অক্ষরের প্রায় সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এরপরেও অবশ্য বাংলা লিপির পরিবর্তন চলতেই থাকে। পঞ্চদশ শতকে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির অক্ষরকে বাংলা লিপি বলে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য বাংলা লিপির পরিবর্তন-স্রোত এখানেই থেমে যায়নি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পরিবর্তন চলতেই থাকে। উনিশ শতকে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে বাংলা অক্ষর একটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে এবং তারপর আর ইহার কোন মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

বাংলা লিপির উদ্ভব ভারতীয় লিপিমালার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেছে। একদা গয়া হতে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বাংলা লিপি

এবং বারাণসী হতে সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে দেবনাগরী লিপি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া লিপির উদ্ভব ঘটে বাংলা লিপি থেকে। অধুনা আসাম ছাড়া অন্য কোথায়ও বাংলা লিপির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ॥

এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম পথে আর্যজাতির আগমন হয় এদেশে। প্রথমে তাঁরা পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পরে ক্রমশ তাঁরা পূর্বদিকে অগ্রসর হতেথাকেন। শক্তিশালী সুসভ্য আর্যগণ কোল-ভীল, সাঁওতাল, দ্রাবিড় প্রভৃতি এদেশীয় আদিম অধিবাসিগণকে সহজেই পরাভূত করেন। বিজিতদের মধ্যে কেহ কেহ অরণ্য-পর্বতে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করল, কেহ সুদূর দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করল, আবার কেহ কেহ আর্যজাতির সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল। আর্যগণ শুধু দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন না, তাঁদের ভাষাও ছিল তেজোসমৃদ্ধ। বশ্যতাকারিগণকে তাই আর্যভাষাকে মেনে নিতে হল। অবশ্য আর্যপ্রভাবে, অনার্যভাষা দেশ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। আজও দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা—তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী প্রভৃতি এবং উত্তর ভারতে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা—কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো কুরকু, শবর প্রভৃতি জীবিত আছে। তবে প্রতিবেশী আর্যভাষীদের প্রভাবে পড়ে অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষা যেভাবে ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি হারাচ্ছে, তাতে মনে হয়, দু'একশ বছরের মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ঘটবে, আর তার জায়গায় বাংলা, হিন্দী, বিহারী, ওড়িয়া প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে ইহা নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কালগত ধ্বনিপরিবর্তন লাভ করে নব্যভারতীয় ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটায়। আর্যজাতির আদিম শাখা, খুব সম্ভব, ইউরোপে বাস করত এবং আনুমানিক খ্রীষ্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেন। নৃবিজ্ঞানে তাঁরা ইন্দো-

ইউরোপীয় জাতি এবং ভাষাতত্ত্বে তাঁরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাই হল আদি আর্যভাষা। আর্যভাষার বর্তমান বংশধর ভাষাসমূহ ইউরোপে, ভারতবর্ষে ও ইউরোপ-ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী ভূভাগে (পূর্ব এশিয়ায়) প্রচলিত আছে বলে ইহাকে বলা হয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। আদি আর্যভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নয়টি শাখা—কেল্‌টিক, ইটালিক, জার্মানিক, গ্রীক, বাল্‌তোস্লাবিক, আলবানীয়, আরমানীয়, তুখারীয় ও ইন্দো-ইরানীয়। ইহাদের মধ্যে তুখারীয় বহুপূর্বে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যগুলি অদ্যাবধি জীবিত রয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি ইরান হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইরানে ইহা ইরানীয় আর্য এবং ভারতবর্ষে ইহা ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত। ভারতীয় আর্য হতে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অধিকাংশ জন্মলাভ করে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হতে ৬০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) বলতে বোঝায় বৈদিক বা ছান্দস্ ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা উভয়কেই। বৈদিক ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক রূপ। ঋগ্বেদের মধ্যে ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন বিদ্যমান এবং ঋগ্বেদের পরবর্তিকালের বৈদিক সাহিত্য এই ভাষায় রচিত। বৈদিক সাহিত্যের তিনটি স্তর—(১) বেদ বা সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ (বিবিধ যজ্ঞকার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা—প্রাচীন উপাখ্যান ও উপাখ্যানাংশ), এবং (৩) উপনিষদ (ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট, ইহাতে কবি-মনীষীদের আধ্যাত্মিক চিন্তা-অনুভূতির সরল কবিত্বময় প্রকাশ আছে)। ইহার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হতে ৬০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অপেক্ষা ভিন্নতর এবং স্থানে স্থানে অত্যন্ত জটিল। আর্যগণ ইরান থেকে ভারতবর্ষে এসে ইরানীয় আর্যভাষা সম্পূর্ণ ভুলতে পারেননি। এজন্য ঋগ্বেদের কোন কোন অংশের সঙ্গে ইরানীয় আর্যভাষার মিল রয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan Language)

বৈদিক সাহিত্য ছাড়া আর্যগণ লৌকিক কাব্যকাহিনীতে অন্য একটি ভাষা ব্যবহার করতেন। এই ভাষায় রচিত কোন সুপ্রাচীন রচনা পাওয়া যায়নি, তবে পরবর্তিকালের রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন পুরাণ, স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন-তর্কবিদ্যা প্রভৃতিতে ইহার নিদর্শন রয়ে গিয়েছে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে পাণিনি এই ভাষাকে সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত করে তোলেন বলে ইহার নাম

হয় 'সংস্কৃত' ভাষা (purified speech)। পাণিনি প্রধানত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শিষ্টজনের ভাষার উপর ভিত্তি করে অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় আজও এই মহামনীষীর 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রচলিত হয়ে আসছে।

পাণিনির ব্যাকরণের বিধিবিধানে সেকালের শিষ্টজনের ভাষা একটি চিরকালের নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল বটে, কিন্তু অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ পাণিনির ব্যাকরণের কোন ধার ধারেনি। তারা অবৈয়াকরণ ভাষায় পুরাণকথা, কবিতা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি শুনত। পরবর্তিকালে উত্তরাপথের বৌদ্ধগণ এই অসংস্কৃত ব্যাকরণদুষ্ট ভাষায় শাস্ত্র রচনা করেছিলেন এবং ঐ ভাষায় তাঁরা ধর্মোপদেশও দিতেন। ইহাকে 'গাথা ভাষা' বা 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' বলা হয়।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক হতে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃতের পরিবর্তন দেখা দিল এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo Aryan Language) অর্থাৎ পালি—প্রাকৃত অপভ্রংশ জন্ম নিল। ইহার আয়ুষ্কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হতে খ্রীষ্টীয় ১০০০ অব্দ পর্যন্ত। সাধারণভাবে আর্যভাষার এই মধ্যস্তরকে 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত করা হয়। 'প্রাকৃত' শব্দটি অবশ্য বহু অর্থবোধক। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা সংস্কৃত নাটকের নারী ও নিম্নশ্রেণী পুরুষের ভাষা, গাথা-সপ্তশতী-সেতুবন্ধ-গৌড়বধ প্রভৃতি কাব্যের ভাষা এবং জৈন শাস্ত্র সাহিত্যের ভাষাকে 'প্রাকৃত' বলেছেন। 'প্রাকৃত' শব্দটি 'প্রকৃতি' শব্দ হতে উৎপত্তিলাভ করেছে। যা কিছু স্বাভাবিক এবং অবিকৃত তাকেই প্রকৃতি বলা যেতে পারে। বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিকদের মতে 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ, যাহা প্রকৃতি অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা হতে উৎপন্ন। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'প্রাকৃত' বা 'প্রাকৃত ভাষা' কথাটির আসল তাৎপর্য হচ্ছে 'প্রকৃতির' অর্থাৎ জনগণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। জনগণের কাব্যভাষা হিসেবে 'প্রাকৃত' শব্দটি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (Middle Indo Aryan Language)

প্রাকৃত অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তিনটি সুস্পষ্ট স্তর অতিক্রম করে পরিণতি লাভ করেছে। এই তিনটি স্তর হল—(১) পালি (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দ), (২) প্রাকৃত (খ্রীঃ পূঃ ১০০—খ্রীষ্টীয় ৬০০ অব্দ) এবং (৩) অপভ্রংশ (খ্রীষ্টীয় ৬০০—খ্রীষ্টীয় ১০০০ অব্দ)।

পালি বলতে অশোকের অনুশাসনের ও বৌদ্ধধর্মসাহিত্যের ভাষাকে বোঝায়। ইহা ঠিক জনগণের কথ্য ভাষা নহে। শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের কথ্যভাষা শৌরসেনীর উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিক পালি ভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণ ও উচ্চারণের দুরূহতার জন্য লোকমুখে বিকৃত হতে থাকে এবং পুনর্বার ব্যাকরণের সরল নিয়মে বাঁধা পড়ে পালি ভাষায় পরিণত হয়।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর প্রাকৃত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সাহিত্যগুণান্বিত। এখানে অবশ্য প্রাকৃত বলতে কাব্য-নাটকে ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রাকৃতকে বোঝান হয়েছে। প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা অঞ্চলভেদে প্রাকৃতকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেমন,—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী ও পৈশাচী।

প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা মাহারাষ্ট্রীকেই মূল প্রাকৃত বলে গ্রহণ করেছেন। এই প্রাকৃতে কাব্যকবিতা বেশী রচিত হয়েছে। গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ বা রাবণ-বধ, গৌড়বহো প্রভৃতি প্রাকৃতকাব্য সুমধুর মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত।

শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের কথ্যভাষা শৌরসেনী। ইহার উপর সংস্কৃতের প্রভাব একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত নাটকে নারী ও অশিক্ষিত পুরুষের মুখে শৌরসেনী ব্যবহৃত হয়েছে।

মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা হল মাগধী প্রাকৃত। ইহা মগধের কথ্যভাষাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সংস্কৃত নাটকে নিতান্ত অশিক্ষিত ইতরলোকের মুখে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা ছাড়া ইহার আর তেমন কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। পূর্বাঞ্চলের ভাষা-সমূহ—বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলী, মাগধী, ভোজপুরিয়া এই মাগধী প্রাকৃত হতে উদ্ভূত হয়।

অর্ধমাগধীর ব্যবহার জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ ও কাব্যে দেখা যায়। ইহাতে মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর কিছু কিছু লক্ষণ বিদ্যমান। অর্ধমাগধীর প্রাচীন নিদর্শন অশ্বঘোষের নাটকে পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তিকালের সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। পূর্বী হিন্দী বা 'আওধি' ভাষার উদ্ভব ঘটে অর্ধমাগধী থেকে। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' এই পূর্বী হিন্দী বা আওধি ভাষায় রচিত।

শিষ্ট সাহিত্যের পংক্তিভোজে পৈশাচী প্রাকৃতের ডাক পড়েনি, তবে লোক-সাহিত্যে ইহা খুব সমাদৃত হয়েছিল। রূপকথা ও রোমাণ্টিক কাহিনী অবলম্বন করে গুণাঢ্য 'বৃহৎকথা' পৈশাচী প্রাকৃতে রচনা করেন। কিন্তু মূল গ্রন্থটি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য পৈশাচী প্রাকৃতের স্বরূপ জানা যায় না।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার শেষস্তরকে 'অপভ্রংশ' নাম দিয়েছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মকানুন ভঙ্গ করে এবং জনসাধারণের সরল উচ্চারণের প্রভাবেই 'অপভ্রংশের' উৎপত্তি। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ যাকে লৌকিক বা অবহট্‌ঠ (অপভ্রষ্ট) বলেছেন, গ্রীয়রসন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকগণ তাকেই 'অপভ্রংশ' নাম দিয়েছেন। এই অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহ জন্মলাভ করে। ভাষাচার্যগণ প্রত্যেক প্রকার প্রাকৃত থেকে একটি করে অপভ্রংশ কল্পনা করেছেন। যেমন,—'মাহারাষ্ট্রী' হতে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, 'শৌরসেনী' হতে শৌরসেনী অপভ্রংশ, 'মাগধী' হতে মাগধী অপভ্রংশ, 'অর্ধমাগধী' হতে অর্ধমাগধী অপভ্রংশ এবং 'পৈশাচী' হতে পৈশাচী অপভ্রংশ। মাগধী-প্রাকৃত হতে যে মাগধী অপভ্রংশ সৃষ্টি হয়, আমাদের বাংলা ভাষার উৎপত্তি সেই ভাষা থেকে।

খ্রীষ্টীয় দশম হতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কালগত ধ্বনিপরিবর্তন ও স্থানগত রূপান্তর লাভ করে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নির্মোক ত্যাগ করে নব্যভারতীয় আর্যভাষা জন্মলাভ করে। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া মৈথিলী, কোসলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারহাট্টী, প্রভৃতি নব্যভারতীয় আর্যভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

নব্যভারতীয় আর্যভাষা
New Indo-Aryan Language

খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি কোন এক সময়ে বাংলা ভাষা অপভ্রংশের গর্ভকোষমুক্ত হয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়। বাংলা ভাষার এই নিতান্ত শৈশবাবস্থার রূপ-নিদর্শন একমাত্র বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থখানি খ্রীঃ দশম হতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলে অনুমান করা হয়। চর্যাপদগুলিই প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

প্রাচীন বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার মধ্যযুগের আয়ুষ্কাল খ্রীষ্টীয় ১৩শ হতে ১৮শ শতক

পর্যন্ত। এই ছ'শ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা মার্জিত, পরিস্কৃত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। অনুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য ও পদাবলী সাহিত্যই (বৈষ্ণব পদাবলী—শাক্তপদাবলী ') এযুগের উজ্জ্বল নিদর্শন।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা

আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার শুরু ১৯শ শতক থেকে। বিগত দেড়শ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা আশ্চর্য বিকাশশক্তি লাভ করেছে এবং আধুনিক চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে পৃথিবীর শক্তিশালী ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বসন্তের পত্রপুষ্পের মত অজস্র কাব্য-কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক-প্রবন্ধ এযুগের বাংলা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

আধুনিক যুগের বাংলা

প্রথম খণ্ড

গীতিকবিতার ধারা

প্রথম অধ্যায়

চর্যাগীতি

পূর্বাভাষ ॥

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন যা-কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তার সবই হল ধর্মভাবপুষ্ট পদ্য সাহিত্য। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার, এ যুগের সাহিত্য নিতান্ত ধর্মচেতনা ও গোষ্ঠীভাবসাধনাকে আশ্রয় করে সৃষ্ট হলেও উদ্দেশ্য প্রচারের প্রবণতাকে অপ্রত্যাশিতভাবে ছাপিয়ে উঠেছে স্রষ্টার মধুরসসিক্ত মননকল্পনা। একারণে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনকেও নিতান্ত প্রাচীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমনকি আধুনিক কাব্য-কবিতার যে একটি বিশেষ প্রকৃতি গীতিপ্রাণতা তা অতীব আশ্চর্যসুন্দরভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে এই প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদ থেকে শুরু করে পরবর্তিকালের বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী ও বাউল গানের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে গীতিকবিতার সঞ্জীবনী ধারা। চর্যাগীতি, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী ও বাউল গানকে তাই গীতিকবিতার প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে আলোচনা করা হল।

প্রাচীন গীতিকবিতা ও আধুনিক গীতিকবিতা ঠিক এক জিনিস নয়। উভয়কে সমশ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায় কিনা তা যথেষ্ট বিচারসাপেক্ষ। আধুনিক গীতিকবিতার চারটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:—(১) একক কল্পনা; (২) নিগূঢ় ব্যক্তিচেতনা (intense personal emotion); (৩) সার্বজনীনতা ও (৪) বিষয় বৈচিত্র্য। কবি যখন তাঁর অন্তরমানসের কোন বিশেষ অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন তখন সেখানে একক কল্পনা জয়ী হয়েছে এটি অনুমান করা যেতে পারে। এদিক থেকে আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে প্রাচীন গীতিকবিতার সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন গীতিকবিতার মধ্যে দেখা যাবে কোথাও ধর্মদর্শন, কোথাও সাধনতত্ত্ব কবির কল্পশক্তিকে গভীরভাবে আকর্ষণ

করেছে। গীতিকবিতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—নিগূঢ় ব্যক্তিচেতনা প্রাচীন গীতিকবিতাতে একেবারেই অনুপস্থিত। তার কারণ, প্রাচীন সাহিত্য মূলত ধর্মীয়; তাই ব্যক্তিচেতনার চেয়ে গোষ্ঠীচেতনা সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। গীতিকবিতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—সার্বজনীনতা, সকল শ্রেণীর সাহিত্যের যেটি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সেটি স্থানে স্থানে বিস্ময়কর ভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। চর্যাগীতিতে রূপকচিত্র, বৈষ্ণবপদাবলী-শাক্তপদাবলী-বাউলগানে সাধ্য-সাধকের আনন্দ-বিরহ সর্বকালের পাঠকহৃদয়কে বিমুগ্ধ করে। আধুনিক গীতিকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—বিষয়বৈচিত্র্য প্রাচীন গীতিকবিতার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। একই ভাবাদর্শ ও সাধনতত্ত্বকে অনুসরণ করে অসংখ্য কবি কাব্য রচনা করে গিয়েছেন। বিষয়বস্তুর এই গতানুগতিকতা প্রাচীন সাহিত্যের একটা গুরুতর ত্রুটি।

বাংলা সাহিত্যের আদিম নিদর্শন—চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ॥

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থখানিতে সংগৃহীত প্রায় পঞ্চাশটি পদই বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন। খ্রীষ্টীয় দশম শতব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই পদগুলি রচনা করা হয় বলে অনুমান করা হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ খ্রীঃ নেপালের রাজদরবার থেকে চর্যাপদের একখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই আবিষ্কারের প্রায় দশ বছর পরে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ঐ পদগুলি শাস্ত্রী মহাশয়েরই সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। চর্যাপদের পুঁথির সঙ্গে সরহপাদ এবং কাহ্নপাদ রচিত দুটি দোহাকোষ, ডাকার্ণব নামক দোহাবলী ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় সবকটি পুঁথিকেই বাংলা মনে করে নাম দেন—"হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা"। পরে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন, দোহাকোষ দুটি ও ডাকার্ণব পাশ্চমা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত এবং চর্যাপদই বাংলা ভাষার আদিরূপ। চর্যাপদের বাগ্‌বৈশিষ্ট্য, প্রবাদবাক্য, শব্দরূপ ও ধাতুরূপে ব্যবহৃত বিভক্তির সম্পূর্ণ বাংলা।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ। ইহাতে বিভিন্ন পদকর্তার রচিত চব্বিশটি পৃথক ভণিতাযুক্ত পঞ্চাশটি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে একটি পদ খণ্ডিত, দুটি পদের পাঠ পাওয়া যায়নি এবং একটি পদ অনাবিষ্কৃত রয়েছে। অবশিষ্ট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের পাঠ পাওয়া গিয়েছে। পদকর্তাগণ

সকলেই সিদ্ধাচার্য। প্রত্যেকটি পদ গীতের আকারে লেখা এবং সূচনায় রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে।

‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে’র নামকরণের সার্থকতা ॥

যে পুঁথি হতে চর্যাপদগুলি সংগৃহীত হয়েছে তার নাম ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’। চর্যাচর্য পদটি বিচ্ছিন্ন করলে আমরা পাই দুটি শব্দ—চর্য ও অচর্য। “চর্য অর্থে আচরণীয় এবং অচর্য অর্থে অনাচরণীয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ লইয়া ঐ পদগুলি রচিত হইয়াছিল। এই উভয়বিধ বিষয়ের নির্দেশ যে গ্রন্থে নিশ্চিতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। চর্যাগুলি পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পদেই বিবিধ বিধির উল্লেখ রহিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে নিষেধের নির্দেশও প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

(১) সঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।

(২) কুলেঁ কূল মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।

(৩) উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক।
নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।

(৪) অনুভব সহজ মা ভোলরে জোঈ।

(৫) অকট জোই আরে মা কর হাথ লোহা।

ইহা হইতে ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ নামের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে।”—(মণীন্দ্রমোহন বসু)। তবে কোন কোন পণ্ডিত এরূপ ধারণাও পোষণ করেন যে গ্রন্থটির নাম ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ না হয়ে ‘আশ্চর্যচর্যাচয়’ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ শাস্ত্রীমহাশয় মূল গ্রন্থটির প্রত্যেকটি পদের সহিত মুনিদত্তের যে টীকা মুদ্রিত করেছেন তাতে ‘আশ্চর্যচর্যাচয়’ কথাটির বারবার প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, প্রথম বন্দনার শ্লোকে টীকাকার লিখেছেন—‘শ্রীলুয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেপ্যাশ্চর্য্যাচয়ে।’ কিন্তু ইহা প্রমাণিত হয়েছে যে টীকাকার ‘আশ্চর্য’ কথাটি চর্যাপদে বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছেন, গ্রন্থের নামের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নেই। অতএব গ্রন্থটির নাম ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ পাঠই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

চর্যার বিষয়বস্তু ও কবিপরিচিতি ॥

চর্যার বিষয়বস্তু হল সহজিয়া দর্শন ও সাধনতত্ত্ব। পদকর্তাগণ সকলেই ছিলেন

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ মানুষ যাতে সাধনার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হতে না পারে সেজন্য সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের গুহ্য-সাধনতত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে দুরূহ দুর্বোধ্য রূপক-সংকেত, প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার করেছেন। অন্যূন তেইশজন পদকর্তার রচিত পদ পাওয়া গিয়েছে এবং পদকর্তাগণের রচনাভঙ্গী ও ধর্মতত্ত্বের অনুভূতির মধ্যে নিবিড় ঐক্য নিহিত রয়েছে।

পদকর্তাগণের নাম—লুইপাদ, কাহ্নুপাদ, সরহপাদ, ভুসুকপাদ, কুক্কুরীপাদ, শান্তিপাদ, শবরপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ, চাটিলপাদ, আর্যদেবপাদ, কঙ্কণপাদ, কম্বলাম্বরপাদ, গুণ্ডরী বা গুড্ডরীপাদ, জয়নন্দীপাদ, ডোম্বীপাদ, তন্ত্রীপাদ, তাড়কপাদ, দারিকপাদ ধামপাদ বা গুঞ্জরীপাদ, বিরুবাপাদ, বীণাপাদ, ভদ্রপাদ ও মহীধরপাদ।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে লুইপাদই আদি সিদ্ধাচার্য। তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার নামের তালিকায় লুইপাদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' তাঁর পদই সর্বাগ্রে সংগৃহীত হয়েছে।

লুইপাদ

লুইপাদ বাঙালী ছিলেন। মহামনীষী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহিত তাঁর পরিচয় ছিল। শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হতে তিব্বত যাত্রা করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে অথবা একাদশ শতকের প্রথম ভাগে লুইপাদের সহজতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল। চৌত্রিশ সংখ্যক পদে দারিকপাদ লুইপাদকে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন—'লুইপাঅপসএঁ দারিক দ্বাদশভুঅণে লাধা' (সিদ্ধ লুইপাদপ্রসাদে দারিক দ্বাদশভুবনলব্ধ)। চর্যাপদে লুই প্রণীত দুটি পদ (১,২৯) সঙ্কলিত হয়েছে।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপাদের তেরটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে বারটি পদ শাস্ত্রী মহাশয়-সম্পাদিত গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে এবং অপরটি প্রবোধ বাগ্‌চি সম্পাদিত তিব্বতীয় অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে। পদরচনায় কাহ্নুপাদ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে কাহ্নুপাদ সবশুদ্ধ ৫৭ খানি গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। কোন জায়গায় কৃষ্ণকে মহাচার্য, কোন জায়গায় উপাধ্যায়, আবার কোন জায়গায় মণ্ডলাচার্য বলা হয়েছে। অনেক স্থলে তাঁকে কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নুপাদও বলা হয়েছে। তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার নাম-তালিকায় কানুহপাদ বা কনপ সপ্তদশস্থানীয়। ছত্রিশ সংখ্যক

কহ্নুপাদ

চর্যাপদে কাহ্নপাদ নিজেকে জালন্ধরীপাদের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন— 'শাখি করিব জালন্ধরি-পাএ' (সাক্ষী করিব আমি গুরু জালন্ধরে)। শূন্যপুরাণে এই জালন্ধরীর অপর নাম হাড়িপা। গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর হাড়িপার শিষ্য হয়েছিলেন। খুব সম্ভব গোপীচন্দ্র দশম-একাদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। অতএব কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদও যে ঐ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না। তাছাড়া কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় কৃষ্ণাচার্য প্রণীত "হেবজ্র পঞ্জিকা যোগরত্নমালা" নামে যে পুঁথি রক্ষিত আছে, তার তারিখও ১১৯৯ খ্রীঃ। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতকের মধ্যে চর্যাগুলি লিখিত হয়েছিল।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' শান্তিপাদের ভণিতায় দুটি পদ (১৫,২৬) পাওয়া যায়। তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া যায়নি। এসিয়াটিক সোসাইটির ৯৯৯০ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রকাশ—শান্তিদেব রাজার ছেলে ছিলেন। সংসার ছেড়ে তিনি প্রথমে মঞ্জুবজ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; পরে গুরুর উপদেশে মগধরাজের রাউত বা সেনাপতি হন। শেষজীবনে তিনি বৌদ্ধভিক্ষু রূপে নালন্দায় বসবাস করেন। সেখানে তিনি সর্বদা শান্ত থাকতেন বলে তাঁকে শান্তিদেব বলা হত; আবার ভোজনে-শয়নে-কুটিতে তাঁর মূর্তি উজ্জ্বল থাকত বলে তিনি ভুসুকু নামেও অভিহিত হয়েছিলেন। এই বিবরণে আরো বলা হয়েছে, শান্তিদেব, ভুসুকু ও রাউত একই ব্যক্তির বিভিন্ন সংজ্ঞা মাত্র। তিনি বোধিচর্যাবতার প্রভৃতি মহাযানগ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং ৬৪৮—৮১৬ খ্রীঃ মধ্যে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু পুঁথির এ সমুদয় বৃত্তান্ত নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। কারণ বিবরণীতে শান্তিদেবের আবির্ভাব কাল আদি সিদ্ধাচার্য লুইপাদেরও পূর্ববর্তী হয়ে পড়ছে এবং শান্তিদেব, ভুসুকু ও রাউত যে অভিন্ন ব্যক্তি, চর্যাপদের ভণিতায় এরূপ সম্পর্কের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' ভুসুকুর রচিত আটটি পদে 'ভুসুকু' এবং 'ভুসুকু ও রাউত' ভণিতা এবং শান্তিপাদ প্রণীত দুটি পদেই 'শান্তি বুলথেউ' ও 'বোলথি শান্তি' ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। শান্তি, ভুসুকু ও রাউত একই ব্যক্তি হলে এরূপ ভিন্ন উক্তির কোন প্রয়োজন থাকত না।

শান্তিপাদ

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' ভুসুকু প্রণীত আটটি পদ (৬,২১,২৩,২৭,৩০,৩৯,৪১,৪৩) সঙ্কলিত হয়েছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুটি পদে (৪১ ও ৪৩)—'রাউত ভণই কট ভুসুকু ভণই কট' এই ভণিতা পাওয়া গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল,

—এই ভুসুকু বা রাউত কে? ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে? ভুসুকুর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে ডাঃ সহিদুল্লাহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় লিখেছেন—"তারানাথ দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে এক ভুসুকুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার সময় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে। খুব সম্ভব ইনিই চর্যাপদের ভুসুকু। তাহা হইলে শান্তিদেব ভুসুকু এবং চর্যা-রচয়িতা ভুসুকু, উভয়ে পৃথক ব্যক্তি। সম্ভবত দ্বিতীয় ভুসুকুর নামকরণ প্রথম ভুসুকুর নাম হইতেই হইয়াছে।......কাজেই ভুসুকু এই বঙ্গাল দেশেরই এক প্রাচীন কবি, যেমন তাঁহার গুরু দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য"। রাউতুর পরিচয় প্রদানকল্পে মণীন্দ্রমোহন বসু চর্যাপদের ভূমিকাতে বলেছেন,—"রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ৪৮০২ নং পুঁথিতে চতুরাভরণের এক অনুলিপি রক্ষিত আছে। এই সংস্কৃত গ্রন্থে কয়েকটি বাঙ্গালা পদও দৃষ্ট হয়। তাহার একটি পদে 'রাউতু' ভণিতা পাওয়া যায়। এই পুঁথির লিপিকাল ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব ইহার পূর্বেই রাউতু বর্তমান ছিলেন। আমাদের মনে হয় ৪১ ও ৪৩ সংখ্যক চর্যাদ্বয়ের ভুসুকু এই রাউতুর শিষ্য।"

ভুসুকু

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' সরহপাদের ৪টি পদ সঙ্কলিত হয়েছে। সরহপাদের সঠিক পরিচয় জানা যায়নি। মহাশবর সরহ, আচার্য-মহাশেনী সরহ, সরোরুহ বজ্র ইত্যাদি বহু গ্রন্থকর্তার নাম পাওয়া গিয়েছে। তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার তালিকায় সরহের অপর নাম রাহুল ভদ্র। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র সরহ ভণিতার পদগুলি এক বা একাধিক সরহের রচনা।

সরহ

চর্যাকার শবরপাদের দুটি পদ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর নামে নানা স্থানে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে শবরপাদ বাংলা দেশের কোনও পাহাড়ী জাতি বিশেষ (শবর)। তাঁর দুই পত্নী—লোকি ও গুণি। নাগার্জুনপাদ তাঁকে বজ্রযান ধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে শবরপাদ সরহের শিষ্য এবং লুইপাদের গুরু। শবরপাদ বজ্রযান বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বজ্রযোগিনী সাধনা'; 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি'; 'চিত্তগুহ্য গম্ভীরার্থগীতি' প্রভৃতি উল্লেখ্য।

শবরপাদ

অন্যান্য চর্যা-রচয়িতাগণের পরিচয় (কুক্কুরীপাদ-ঢেণ্ঢণপাদ-চাটিলপাদ-আর্যদেবপাদ-কঙ্কণপাদ-কম্বলাম্বরপাদ-গুণ্ডরী বা গুড্ডরীপাদ-জয়নন্দীপাদ-ডোম্বী-পাদ-তন্ত্রীপাদ-তাড়কপাদ-দারিকপাদ-ধামপাদ বা গুঞ্জরীপাদ-বিরুরাপাদ-বীণাপাদ-ভদ্রপাদ-মহীধরপাদ) তিব্বতীয় ৮৪ জন মহাসিদ্ধার নামের তালিকায় পাওয়া যায়। বর্তমান গ্রন্থের ক্ষুদ্র অবয়বে ইঁহাদের বিশেষ পরিচয় প্রদান সম্ভব হল না।

অন্যান্য চর্যা-রচয়িতা

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ॥

বৌদ্ধধর্ম মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত—হীনযান বৌদ্ধধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম। বুদ্ধদেব নিজে কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উপদেশাবলী সংগ্রহ করার জন্য প্রথমত রাজগৃহে একটি সভা আহূত হয়েছিল। ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হয়। ইহার পর মহারাজ অশোকের আমলে পাটলিপুত্রে তৃতীয় সভা এবং মহারাজ কনিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়েছিল। এই সকল ধর্মসভায় বুদ্ধদেবের উপদেশ অবলম্বন করে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ইহার মধ্যে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক তিন পিটক বা পেটিকা নামক সংগ্রহগ্রন্থই প্রধান। এই সকল গ্রন্থ পালিভাষায় রচিত। গ্রন্থগুলির সন্ধান সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ও দর্শনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাই প্রাচীন মত এবং এই প্রাচীন মতই হল হীনযান। ইহার পর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের দিকে মহাযান-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতির আচার্যগণ প্রাচীন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের মতামত প্রচার করেন। ইহাই হল মহাযান মত। তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই মত বিস্তৃতি লাভ করে।

হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ চরম আদর্শ, উপদেশ, উপদেশের প্রয়োগ, সাধনার আলম্বন ও সাধনকালের পরিমাণ নিয়ে। এসকল বিষয়ে প্রাচীনেরা হীন ছিলেন বলেই তাঁরা হীনযানী। প্রাচীন স্থবিরবাদী বা থেরবাদীদের চরম আদর্শ ছিল—শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্বাণ অবলম্বন করে অর্হত্ত্ব[১] লাভ

হীনযান ও মহাযান

১। অর্হৎ-বুদ্ধ : অর্হৎ-ত্ব বা অর্হত্ত্ব অর্থে বোঝায় বুদ্ধ-নির্দেশিত পথে নির্বাণ-সিদ্ধি।

করা। কিন্তু মহাযানীদের উদ্দেশ্য আরো উদার। তাঁরা বলবেন,—নির্বাণ লাভ করে 'অর্হৎ' হলে চলবে না; দুঃখ প্রপীড়িত বিশ্বজীবের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আত্মমুক্তির প্রলোভন ত্যাগ করতে হবে, নির্বাণ লাভের উপযুক্ত হলেও নির্বাণ ত্যাগ করে শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত থেকেই মহাকরুণা অবলম্বনে বিশ্বজীবের মুক্তির জন্য অনন্ত কাল ধরে কুশলধর্ম করে যেতে হবে—ইহাই হল মহাযানীর পথ।

বজ্রযান ও সহজযান

বিভিন্নধরনের ধর্মবিশ্বাস ও প্রচলিত সাধনপদ্ধতি ক্রম-প্রবেশের ফলে মহাযান মত পরিবর্তিত ও বিশ্লিষ্ট হয়ে দেখা দিল দুটি মত—'পারমিতানয়' ও 'মন্ত্রনয়'। 'পারমিতানয়' পরিকল্পিত মহাযানের বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব আশ্রয় করে। আর 'পারমিতানয়ে'র অনুশীলনের উপরে গুরুত্ব না দিয়ে বিভিন্নপ্রকারের মন্ত্রের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে সৃষ্ট হলো 'মন্ত্রনয়'। আবার এই 'মন্ত্রনয়ে'র সঙ্গে নানাপ্রকার দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা, তান্ত্রিক ক্রিয়া-বিধি, গুহ্য যোগ-সাধনা ইত্যাদি প্রযুক্ত হয়ে 'বজ্রযান' উদ্ভূত হল। 'বজ্র' শব্দের বৌদ্ধতান্ত্রিক অর্থ শূন্যতা, বজ্রযান তাই শূন্যতা-যান।

বজ্রযান-পন্থী একদল সাধকের কতকগুলি বিশিষ্ট মত ও সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করে পরবর্তিকালে 'সহজযান' নামক এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। ইঁহাদের 'সাধ্য'ও সহজ, 'সাধন'ও সহজ; তাই ইঁহারা সহজিয়া সাধকরূপে খ্যাত। সহজ শব্দের অর্থ সহ-জাত। যে ধর্ম প্রত্যেক জীব বা বস্তুর জন্ম থেকেই উৎপন্ন তাহাই তার সহজ রূপ। ইহা সকল পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও অপরিবর্তিত রূপে বিরাজ করে। সহজিয়াগণের মূল আদর্শ এই সহজ-রূপকে উপলব্ধি করে মহাসুখে মগ্ন হওয়া। ইহা ছাড়া সহাজিয়াগণ কখনও সাধনার জন্য বক্রপথ অবলম্বন করতেন না—সহজ সরল পথই তাঁদের সাধনজীবনের একমাত্র অবলম্বন।

চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্ব॥

চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে তা মোটামুটিভাবে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতাবলী দ্বারাই গঠিত। চর্যার কতকগুলি পদে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বর্তী দুটি বিশিষ্ট মত—

নাগার্জুন প্রবর্তিত শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ ও মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধুপ্রবর্তিত বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ পরিলক্ষিত হয়। "নাগার্জুনের শূন্যবাদ মুখ্যত নেতিবাচক—সত্য ইহা নয়, উহা নয়—তাহা নয়, পরমার্থতত্ত্বকে সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, তদুভয়ও বলা যায় না—অনুভয়ও বলা যায় না; তাহা আছে বলিতে পারি না—নাই-ও বলিতে পারি না—আছেও বটে নাইও বটেও বলিতে পারি না, আছে এবং নাই তাহার কোনটাই সত্য নয় তাহাও বলিতে পারি না; পরমার্থ সত্য এইভাবে চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত—এবং যে-তত্ত্ব এই চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত তাহাই হইল শূন্য। পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে অস্ত্যর্থকভাবে কোনও কথা বলা যায় না বলিয়াই নাগার্জুন তাহাকে শূন্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।" (—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। বিজ্ঞানবাদিগণ কিন্তু এতটা নাস্তিক নন। তাঁরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই (বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা) শূন্যতা বলে অভিহিত করেছেন। তবে এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অভূতপরিকল্প (অর্থাৎ যাহার কোনরূপ পরিকল্প হয় নাই)।

শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ

বিখ্যাত পদকর্তা কাহ্নুপাদের একটি পদে (সপ্তম চর্যায়) শূন্যবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে,—

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্নু ভবপরিচ্ছিন্না॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবনাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥

"তারা তিন, তারা তিন,—তিন হয় ভিন্ন। কাহ্নু বলে সকলই ভব-পরিচ্ছিন্ন। যারা যারা এসেছিল, তারা তারা গিয়েছে—এই আসা-যাওয়ায় কাহ্নু বিমন হলো। অর্থাৎ আমরা তিন তিন (বহু বহু) বলে যাকিছু পৃথক পৃথক ভাবে দেখছি তা সত্য নয়। একটা ভাববোধ বা অস্তিত্ববোধের দ্বারা আমরা সকল কিছু পৃথক পৃথক করে পরিচ্ছিন্ন করে দেখছি। জগতে যে যে বস্তু এসেছে (উৎপন্ন হয়েছে) সেই সেই বস্তুই ক্ষণেকেই আবার চলে গিয়েছে (বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে)। সংসারে এই আসা-যাওয়ার মধ্যে আসাটাও সত্য নয়, যাওয়াটিও সত্য নয়—ইহাই কাহ্নুপাদকে বিমন করে তুলছে।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-রূপ সত্যের একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় লুইপাদের একটি পদে (২৯ সংখ্যক চর্যায়)। সেখানে বলা হচ্ছে,—

ভাব ণ হোই অভাব ণ জাই।
অইস সংবোহেঁ কো পতি আই॥
লুই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগে ণা॥
জাহের বাণচিহ্নরূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম—বেএঁ বখাণী॥
কাহেরে কিস ভণি মই দিবি পিরিচ্ছা।
উদক-চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা॥

"ভাবও হয় না, অভাবও যায় না—এরূপ সংবোধের দ্বারা কে প্রতীতি লাভ করে? লুই বলেন,—দুর্লক্ষ্য এই বিজ্ঞান। তা তিন ধাতুতেই বিলাস করে, কিন্তু তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। যার বর্ণচিহ্নরূপ কিছুই জানা যায় না, তা কিরূপে আগম-বেদে ব্যাখ্যাত হবে। কাকে কি বলে আমি জিজ্ঞাসার সমাধান করব—যেমন জলে প্রতিভাত চন্দ্র সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়।" অর্থাৎ এখানে কবি বলতে চাচ্ছেন,—ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব ইহার কিছুই সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। সত্য শুধু এক দুর্লক্ষ্য অদ্ভুত-পরিকল্প অবাঙ্মনস্গোচর বিজ্ঞান-স্বরূপ—যাহা সমস্ত অস্তিত্বপ্রবাহের মধ্যে বিলাস করছে।

শূন্যতা ও করুণা

চর্যার অনেকগুলি পদে শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা নানাভাবে ছড়ান আছে। মহাযানমতে করুণার তাৎপর্য হল—সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখা। অনন্তপুণ্য ভগবান বুদ্ধ ছিলেন করুণাঘন মূর্তি। তাঁর করুণা সমগ্র বিশ্বমানব তথা নিখিল জীব-কোটির মধ্যে নিঃসীমভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে এই নিবিড় অদ্বয়বোধের দ্বারা মানবচিত্ত ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি লাভ করে অসীম প্রসারতা লাভ করে। এই করুণাই তাই মহাযান বৌদ্ধধর্মের একরূপ মূলমন্ত্র। করুণার আবার বিশুদ্ধতার জন্য চাই শূন্যতা। মহাযান বৌদ্ধধর্মে তথা সহজিয়া বৌদ্ধধর্মে তাই শূন্যতা ও করুণার মিলনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চম চর্যায় বলা হয়েছে—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী॥

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

"ভবনদী গহন গম্ভীরবেগে প্রবাহিত হচ্ছে। দুধারে পাঁক, মাঝখানে থই নেই। ধর্মার্থে চাটিল (তার উপর) সাঁকো গড়ে দিচ্ছেন, পারগামী লোক যেন তার উপর নির্ভর (করে উত্তীর্ণ হতে পারে)।" অর্থাৎ গম্ভীরবেগে প্রবাহিত ভবনদীর একদিকে শূন্যতা, অপরদিকে করুণা। ইহার একটিকে ছাড়লে সত্যভ্রষ্ট হয়ে অঠাই জলে পড়তে হবে। চাটিলপাদ তাই অদ্বয়-সাঁকো গড়ে দিচ্ছেন। এই অদ্বয়-সাঁকোর তাৎপর্য হল শূন্যতা ও করুণাকে মিলিয়ে নেওয়া।

অষ্টম চর্যায় কম্বলাম্বরপাদ বলেছেন,—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥

"আমার করুণা নৌকা সোনায় ভর্তি আছে; সেখানে রূপা রাখার স্থান নেই।" অর্থাৎ পদকর্তা এখানে বলতে চান যে, তাঁর করুণা-নৌকা সোনা অর্থাৎ শূন্যতাদ্বারা ভরা হয়েছে; সেখানে রূপা অর্থাৎ অবিদ্যাচিত্তজাত যে রূপ-জগৎ তার স্থান নেই।

বৌদ্ধদের মতে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্বস্তুর সবটাই হলো অবিদ্যাক্ষুব্ধ চিত্ত-চৈতসিকের সৃষ্টি। চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই কাল-জ্ঞান দেশ-জ্ঞান সৃষ্টি করে বিবিধ বস্তুজ্ঞান সম্ভব করে তোলে। লুইপাদ তাই একটি পদে বলেছেন,—'চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।' চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে কালজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় এবং শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়। বৌদ্ধ দর্শনের এই চিত্ত-প্রাধান্যবাদের দ্বারা চর্যাকারগণ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কয়েকটি পদে নানান রূপকের সাহায্যে তাঁরা চিত্তের খেলা এবং চিত্ত-নিরোধের কথা পরিব্যক্ত করেছেন। চর্যার বাইশ সংখ্যক পদে সরহপাদ বলছেন,—

চিত্ত-প্রাধান্যবাদ

অপনে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ণ জাণহুঁ আচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥

জইসে জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো॥

"আপন মনে ভব-নির্বাণ রচনা করে বৃথা লোকে আপনাকে বন্ধনে জড়ায়। জন্ম, মরণ ও ভব (অস্তিত্ব) কি করে হয় আমরা অচিন্ত্যযোগী তা জানি না। জন্ম যেরূপ, মরণও সেরূপ; জনমে ও মরণে কোনও বিশেষ (পার্থক্য) নাই।"

সহজিয়াদের মতে—চিত্তের দুটি রূপ আছে। একটি দোষগ্রস্ত অপরিশুদ্ধ রূপ ও অপরটি প্রকৃতি-প্রভাস্বর[১] বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ। চিত্তের প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপই মহাসুখদায়িনী শূন্যতা। ভুসুকপাদ তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পদে (৬ নং) একটি সুন্দর রূপকচিত্রের সাহায্যে এই দুটি রূপ পরিস্ফুট করেছেন। পদকর্তা নিজের চিত্তকে অবোধ হরিণের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন,—

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুক অহেরি॥
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো॥
তরংগতে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুক ভণই মূঢ়—হিঅহি ন পইসই॥

"কাকে ঘিরে কিসে (মুক্ত) আছি; চৌদিক বেড়ি হাঁক পড়ল। আপনার মাংসের জন্য হরিণ নিজের শত্রু। ভুসুক অহেরি (শিকারী) ক্ষণমাত্র (তাহাকে অর্থাৎ চিত্তহরিণকে) ছাড়ে নাই। মৃগ (তখন) ছোঁয় না আর তৃণ—পান করে না জল (—মনে পড়ে যায় আপনজন হরিণীকে)। (কিন্তু) হরিণ হরিণীর আলয় জানে না। হরিণী বলছে—

১। প্রকৃতি-প্রভাস্বর—অবিদ্যা-চিত্তকে বিনাশ করার অর্থ তাকে প্রকৃতি-প্রভাস্বর করে তোলা।

"ওরে, হরিণ তুই শোন! এই বন ছেড়ে তুই অন্য বনে চল।' (তারপর) ত্বরাগামী হরিণের খুর আর দেখা যায় না। ভুসুক বলছেন—(এসব) মূর্খের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।" অর্থাৎ এখানে পদকর্তার মূল বক্তব্য হল—অবিদ্যা-বিমোহিত চিত্ত-হরিণ যখন মদমোহমাৎসর্যাদি দোষ বুঝতে পারে তখন সমুদয় জাগতিক ভোগ পরিত্যাগ করে সুপরিশুদ্ধা প্রকৃতি-প্রভাস্বরা মহাসুখরূপা শূন্যতারূপিণীকে লাভ করার জন্য অন্ধবেগে ধেয়ে চলে।

চর্যার কতকগুলি পদে চতুঃশূন্য মতবাদ নানাভাবে গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই চতুঃশূন্য মতবাদ নাগার্জুনপাদের নামে প্রচলিত 'পঞ্চক্রম' নামক তান্ত্রিকগ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই চতুঃশূন্য হল শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত চিত্তের চারটি স্তর।

চতুঃশূন্য মতবাদ

শূন্যতার প্রথম স্তরে চিত্তে অবিশুদ্ধির কারণ স্বরূপ শোক, বেদনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় প্রভৃতি প্রকৃতি দোষ জড়িত থাকে। দ্বিতীয় স্তর অতিশূন্যতায় চিত্তে কাম, সন্তোষ, সুখ, বিস্ময়, গর্ব প্রভৃতি প্রকৃতি দোষ যুক্ত থাকে। তৃতীয় স্তর মহাশূন্যতা অধিকতর বিশুদ্ধ হলেও ইহাতে আলস্য, ভ্রান্তি, বিস্মৃতি প্রভৃতি প্রকৃতি দোষ যুক্ত থাকে। চতুর্থ স্তর হল সর্বশূন্য—ইহা প্রকৃতি দোষরহিত, ইহা প্রকৃতি-প্রভাস্বর পরম সত্য, পরম বিজ্ঞান। ইহা অস্তি, নাস্তি, পাপ পুণ্য প্রভৃতি সকলের উর্ধ্বে। ঢেণ্টণপাদের একটি পদে এই মতবাদ পরিগৃহীত হয়েছে। সেখানে পদকর্তা বলছেন,—

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

* * *

বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥

"টিলাতে আমার ঘর, কোন প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্যই প্রবেশি (অর্থাৎ সতত প্রভাস্বর শূন্যতায় প্রবেশ করছি)।······বলদ বিয়াইল, গাভী বন্ধ্যা; এই তিন সন্ধ্যা (আমি) পীঠকে দোহন করি।" মুনিদত্ত কৃত টীকা অনুসরণ করে বলা যেতে পারে এই হাঁড়ির ভাত হল পূর্বোক্ত প্রকৃতিদোষসমূহ। প্রকৃতিদোষ রহিত হলে সাধকের বাস হয় মহাসুখচক্রে (উঁচু টিলাতে)। তখন চন্দ্র-সূর্যরূপ প্রতিবেশী (অর্থাৎ গ্রাহ্য-

গ্রাহকস্বরূপ দ্বৈতস্ব) আর থাকে না। ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষযুক্ত চিত্তই হল 'বলদ'। ইহা বিয়ায় অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের কল্পনা করে। প্রকৃতি-প্রভাস্বরূপ সর্বশূন্য হল গাভী—তা বন্ধ্যা অর্থাৎ সেখানে কোন ভব-বিকল্পের সম্ভাবনা নেই। যোগী তাই তিনসন্ধ্যা 'পীঠকে' (ত্রিবিধ প্রকৃতিদোষকে) দোহন করেন।

চর্যাপদে বর্ণিত সাধনতত্ত্ব

বৌদ্ধসহজিয়াগণের সাধনা মূলত তান্ত্রিক সাধনা। তন্ত্রসাধনা হল দেহ-সাধনা—দেহকে যন্ত্র করে তার ভিতরেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনা। তান্ত্রিকদের মতে দেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্ররূপ—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু সত্য নিহিত রয়েছে তা এই দেহভাণ্ডের মধ্যেও রয়েছে। সহজিয়াগণ বলেন, দেহের মধ্যে অবস্থান করছে যে সহজ স্বরূপ তাই হল বুদ্ধ-স্বরূপ। চর্যাপদগুলির মধ্যে এই তন্ত্রসাধনা তথা দেহ-সাধনার কথা বহুস্থলে উল্লিখিত হয়েছে। পদকর্তাগণ বার বার বলেছেন—নিঅড়ি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক অর্থাৎ এই দেহেই আছে বোধি তাকে লাভ করার জন্য লঙ্কায় (দূরে) যাবার প্রয়োজন নেই।

সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে চারটি চক্র বা পদ্ম কল্পনা করেছেন। প্রথম চক্র অবস্থিত নাভিতে (নাম—'নির্মাণ-চক্র'); দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে (নাম—'ধর্মচক্র'); তৃতীয় চক্র কণ্ঠে (নাম—'সম্ভোগ চক্র') এবং চতুর্থ চক্র মস্তকস্থিত (নাম—'সহজচক্র' বা 'মহাসুখচক্র')। বোধি চিত্তের অবস্থান হল এই 'সহজ-চক্রে' বা 'মহাসুখ-চক্রে'।

যোগসাধনার দিক থেকে দেখা যায় এই দেহের মধ্যে তিনটি প্রধান নাড়ী আছে। একটি 'বামগা', প্রাণবাহী বা শ্বাসবাহী নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র মতে—'ইড়া'); অপরটি 'দক্ষিণগা', প্রশ্বাসবাহী নাড়ী (হিন্দুতন্ত্র মতে—'পিঙ্গলা') এবং আর একটি নাড়ী আছে তার নাম হল 'মধ্যগা', বৌদ্ধতন্ত্রে তাকে বলা হয় 'অবধূতি' বা 'অবধূতিকা' (হিন্দুতন্ত্রে বলা হয়— 'সুষুম্না')।

সাধনার ক্ষেত্রে বামগা-দক্ষিণগা এই নাড়ীদ্বয়কে শূন্যতা-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায়, বিন্দু-নাদ, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি, গ্রাহক-গ্রাহ্য; আলি-কালি ('আলি' অর্থাৎ অ-কারাদিক্রমে বর্ণমালা এবং 'কালি' অর্থাৎ ক-কারাদিক্রমে বর্ণমালা), গঙ্গা-যমুনা,

চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিবা, চমন-ধমন, ভব-নির্বাণ[১] ললনা-রসনা, ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নাড়ীদ্বয় দ্বৈতত্ত্বের প্রতীক। তৃতীয় নাড়ীটি (অবধূতি বা অবধূতিকা) অদ্বয় বোধিচিত্ত বা সহজানন্দ[২] লাভের জন্য মধ্য মার্গের প্রতীক। চর্যার বহুস্থানে নানাভাবে এই মধ্যপথের কথা বলা হয়েছে। কারণ বৌদ্ধসহজিয়াগণের আসল সাধনা হল—সর্বপ্রকারের দ্বৈতবিবর্জিত হয়ে অদ্বয় মহাসুখে বা সহজরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তন্ত্রসাধনমতে প্রথমে বামা ও দক্ষিণা নাড়ীদ্বয়কে নিঃস্বভাবীকৃত করতে হবে। এদের "ক্রিয়াধারা স্বাভাবিক-ভাবে নিম্নগা ; এই নিম্নগা ধারাকে যোগের সাহায্যে প্রথমে বিশুদ্ধ করিয়া রুদ্ধ করিতে হইবে—তাহার পরে সমস্ত ধারাকে একীকরণের সাধনা ; যখন সব ধারা একীকৃত হইল মধ্যমার্গে—তখন সেই মধ্যমার্গে তাহাকে করিতে হইবে উর্ধ্বগা। সেই উর্ধ্বগা ধারাই আনন্দের ধারা, সেই আনন্দের মধ্যে অনুভূতির তারতম্য আছে ; প্রথমে যে উর্ধ্ব স্পন্দনাত্মক আনন্দানুভূতি তাহার নাম আনন্দ,—দ্বিতীয়া-নুভূতি হইল পরমানন্দ—তৃতীয়ানুভূতি বিরমানন্দ—চতুর্থানুভূতি হইল সহজানন্দ। এই চতুর্থানুভূতি সহজানন্দই হইল চতুর্থশূন্য —প্রকৃতি-প্রভাস্বর সর্বশূন্য। বোধিচিত্ত উষ্ণীষ কমলস্থিত চন্দ্র,—সহজানন্দেই ঘটে সেই চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণ।" (—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)।

১। 'ভব' অর্থে অস্তিত্ব এবং 'নির্বাণ' অর্থে অনস্তিত্ব। 'নির্বাণ' আরো ব্যাপক অর্থে পালি শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্বাণ কথাটি নির্ + বা ধাতু হতে নিষ্পন্ন বলে এর অর্থ হল নিভে যাওয়া—নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, যেমন দীপশিখা স্নেহক্ষয়ে নিভে নিঃশেষ হয়ে যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে সমগ্র জীবনপ্রবাহকে প্রজ্বলিত দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্নেহক্ষয়ে যেমন দীপের আলোকশিখা প্রবাহ নিভে শেষ হয়ে যায় সেরূপ হৃদয়ের উগ্র কামনা-বাসনা মদ-মোহ ক্ষয় হয়ে গেলে সুখ-দুঃখময় জীবনপ্রবাহ নিঃশেষে থেমে যায়—ইহাই নির্বাণ। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্যে এই নির্বাণ পরম 'নাস্তিত্ব' মাত্র নয়—নির্বাণই সুখ, নির্বাণ। শান্তি।

২। মানবদেহের মধ্যে এক অদেহী অরূপ সত্তা নিহিত আছে, সহজিয়াদের মতে উহাই 'সহজ' এই 'সহজ'কে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করাই সহজিয়া সাধকদের চরম লক্ষ্য। চর্যাপদকর্তাদের মতে,—'সহজ হল বাক্যমনের অতীত, তাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলার কোনো উপায় নেই, কেবল তার অনুভূতির একটা আভাস-ইঙ্গিত দেওয়া যায় মাত্র। বৌদ্ধ তন্ত্রে আরো বলা হয়েছে যে 'সহজ'ই হল সমস্ত জগতের মূল-স্বরূপ—'সহজ'ই হল নির্বাণ। এই সহজ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারলে নির্বিকল্প পরম আনন্দ লাভ হয়। আর এই নির্বিকল্প পরম আনন্দই হল সহজানন্দ।

চর্যার বহু পদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এই অদ্বয় বোধিচিত্তের সাধনা তথা সহজানন্দের সাধনার কথা। প্রথম পদের ভণিতাতে লুইপাদ বলেছেন—

আমহে ঝানে (সানে) দিঠা।
ধমন চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা॥

"আমি ধ্যানে দেখলাম,—ধমন-চমন দুয়ের উপর বসে আছি।" অর্থাৎ তিনি দুইকে এক করে অদ্বয় মহাসুখে মগ্ন আছেন।

পঞ্চম পদে চাটিলপাদ নদীর দু'পার মিলিয়ে দেওয়ার জন্য সাঁকো গড়ে দিয়েছেন। তারপর এই সাঁকোতে চড়ার পূর্বে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,—'দাহিণ বাম মা হোহী।' ইহার অর্থ আর কিছু নয়, এখানেও পদকর্তা সেই অদ্বয় মহাসুখের মধ্যপথ অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

অষ্টম পদে কম্বলাম্বরপাদ বলেছেন,—

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥

অর্থাৎ বামে-ডাহিনে চেপে পথ মিলিয়ে মিলিয়ে পথেতেই (অবধূতিকা বা মধ্য মার্গে) মিলে গেল মহাসুখের সঙ্গ।

চর্যাপদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য॥

চর্যাপদাবলী উদ্দেশ্যমূলক রচনা। সহজিয়া সাধকগণ তাঁদের ধ্যানলব্ধ দর্শন ও সাধনপ্রণালীকে নিজ নিজ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য পুঁথিবদ্ধ করেন। আপাতদৃষ্টিতে তাই ইহা অধ্যাত্মপিপাসু মুমুক্ষু সাধকের নিকট বিশেষ কৌতূহলেরই সামগ্রী। কিন্তু পদকর্তাগণ নিগূঢ় তত্ত্বকথাকে এমন বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে পরিব্যক্ত করেছেন—রূপকচিত্র, প্রতীক-দ্যোতনা, শব্দচয়ন কৌশল, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও হৃদয়াবেগের এমন মর্মস্পর্শী সঙ্গত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন যা চকিতে সর্বকালের সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। চর্যাপদাবলী তাই ধর্মশ্রয়ী রচনা হলেও রসসমৃদ্ধ সাহিত্যিক রচনারূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

রচনাশৈলীর উৎকর্ষতা ছাড়া সাহিত্যস্রষ্টাদের সঙ্গে চর্যাপদকর্তাদের একটা নিবিড় আত্মীয়তার যোগ রয়েছে। সাহিত্যস্রষ্টার চরম লক্ষ্য যেমন অলৌকিক রসানন্দ আস্বাদান, চর্যাকারেরও চরম লক্ষ্য তেমন নির্বিকল্প সহজানন্দ উপলব্ধি। মূলে এই উভয় শ্রেণীর সাধকের লক্ষ্য এক হওয়ায় তাঁদের রচনাও স্বতন্ত্র সাধনপ্রভাবে একই বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে অনবদ্য প্রকাশগরিমা লাভ করেছে।

চর্যার প্রধান উপজীব্য হল গুহ্য সাধনতত্ত্ব। তত্ত্ব-দর্শন অনুভূতির বিষয়। অন্তরের অন্তস্তলে অনুভূত বস্তুকে মূর্ত করে তুলতে হলে রূপকের প্রয়োজন। চর্যাকারগণ অসংখ্য সুন্দর সুন্দর রূপকচিত্রের সাহায্যে তাঁদের ধ্যানলব্ধ বিষয়কে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন। রচনারসসম্ভোগের দিক থেকে এই রূপকচিত্রগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম সংখ্যক চর্যায় চাটিলপাদ ভবনদী পারাপারের নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। চিত্রটি এরূপ—ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। তার দুধারে পাঁক, মাঝখানে অথই জল। ধর্মার্থে চাটিল তাই নদীর উপর সাঁকো গড়ে দিচ্ছেন, যাতে পারগামী লোক তার উপর ভর করে সহজেই পারাপার হতে পারে। অদ্বয়-টাঙ্গি দিয়ে মোহতরু ফেড়ে তার পাটগুলি জুড়লেন (সাঁকো বাঁধার কাজে লাগানোর জন্য)। সাঁকোতে চড়ার পূর্বে নির্বাণকে দৃঢ় করার নির্দেশ দিলেন; তারপর সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন,—'সাঁকোতে চড়িলে বাম-ডাহিন না হও'। বোধি নিকটেই রয়েছে, দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

চর্যার তেত্রিশ সংখ্যক পদে এক গৃহস্থবধূর দারিদ্র্যক্লিষ্ট বিড়ম্বিত জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গৃহস্থবধূ উঁচু টিলার উপরে বাস করে, কোন পাড়াপড়শী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই, তায় নিত্যই অতিথি এসে ভিড় করে। বেঙ্গের সংসার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

উনপঞ্চাশ সংখ্যক পদে জলদস্যু আক্রমণের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে,—

বাজ-নাও পাড়ি দিয়ে পদ্ম-খালে যাওয়া হল। নির্দয় ডাঙ্গালিয়া দেশ লুটে নিল। ভুসুক বাঙালী হল, তাঁর গৃহিণীকে চাঁড়ালে নিল। সোনা রূপা কিছু থাকল না। চার কোটি ভাঁড়ার লুট হয়ে গেল। (ভুসুকের) জীবনে-মরণে আর পার্থক্য রইল না।

চর্যাকারগণ কতকগুলি বাস্তবপ্রতীকের সাহায্যে মহাসুখতত্ত্ব ও শূন্যবাদের

ইঙ্গিতে করেছেন। এই প্রতীক ব্যবহারের দ্বারা চর্যাকারগণ তাঁদের সাধ্য-সাধন বিষয়কে যতই সাধারণ মানুষের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করুন না কেন, প্রতীকগুলি ব্যবহারের ফলে পদগুলি সহজেই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই প্রতীকগুলির গভীর অর্থ সাহিত্যরসিকের মনকে ব্যাকুল করে দিয়েছে। প্রতীকগুলি এভাবে অতিসাধারণ হয়েও অনন্ত-সাধারণ। ইহা যে চর্যাকারগণের রচনা-নৈপুণ্যের সার্থক নিদর্শন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শাশুড়ী—বহুড়ী; গুণ্ডিণী; যোগিনী; হরিণ-হরিণী; ডোম্বী-কপালী; চঞ্চল মূষিক; দাবাখেলা; তুলাধোনা ইত্যাদি অতি নগণ্য বস্তু যে গভীর অর্থদ্যোতক তত্ত্ব-দর্শনের বাহন হতে পারে তা যেন সাধারণের কাছে অনেকটা অনমুমেয়।

শব্দচয়নকৌশল মহাকবির সবচেয়ে বড় গুণ। গভীরতর ভাবকে প্রকাশ করার জন্য শব্দের সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজন। একারণে 'বাঁশবন' কাব্যে 'বেণুবন' হয়ে যায়; শাপলা ফুল 'কুমুদিনী', তেলাকুচা ফল 'বিম্বে' পরিণত হয়। চর্যার যে কোন পদে পাদকর্তাদের এই শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম পদের কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হল,—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।

* * *

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ-দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥

চর্যার কতকগুলি পদে গীতিকবির স্বপ্ন-কল্পনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির সার্থক রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। আঠাশ সংখ্যক পদে শবর-শবরীদের পার্বত্য জীবনের অতি চমৎকার বর্ণনা—কামনাজর্জর মদমত্ত জীবনের রঙীন চিত্র রোমান্টিক কবির মাধুকরী কল্পনায় অভিষিক্ত। উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। শবরীর পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জা-ফলের মালা। শবর মদমত্ত হয়ে নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারে না। শবরী তখন শবরকে করুণ মিনতি জানায়,—'ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, গোলে পড়ে ভুল করো না, দোহাই তোমার—আমি তোমারই

গৃহিণী, নামে সহজসুন্দরী।' পত্রপুষ্পে গাছগুলি ভরে উঠেছে। তিনধাতুর খাট পেড়ে শবর মহাসুখে শয্যা বিছাল। কর্পূরযুক্ত তাম্বুল সেবন করে উভয়ে রাগরক্তিম হয়ে উঠল। নিবিড় আসঙ্গরভসে সারারাত কেটে গেল।

উনিশ সংখ্যক চর্যায় কাহ্নুপাদ দুন্দুভিনাদে জয়ধ্বনি দিতে দিতে ডোম্বীকে বিয়ে করতে চললেন। বিবাহান্তে যৌতুক লাভ হলো—'অনুত্তর ধর্ম'। সারা-রাত্রি অনঙ্গরসে কেটে গেল। ইহার মধ্যে গূঢ়ার্থ যাই থাক না কেন, আপাত দৃষ্টিতে ইহা মধুর দাম্পত্যপ্রণয়েরই সজীব চিত্র। চর্যার সর্বশেষ পদের লিপিচিত্রটি আরো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে! আকাশচুম্বী পাহাড়ের উপরে শবর-শবরীর বাস। বাড়ীর চারপাশে সুন্দর সুন্দর কার্পাস ফুল ফুটেছে। আকাশে জ্যোৎস্না নেমেছে। কঙ্গুচিনা ফল পেকেছে এবং তার রসপানে শবর-শবরী আনন্দে মেতে উঠেছে। অনুদিন শবর আর কোন কিছুতেই জাগ্রত হয় না, সে মহাসুখে বিভোর হয়ে গেল।

চর্যাপদে বাংলা ও বাঙালী ॥

চর্যার অধিকাংশ পদ বাঙালী-রচিত এবং বৃহত্তর বাংলাই ইহার পটভূমি খ্রীঃ ১০ম—১২শ শতকে পালরাজাদের আমলে বাংলাদেশের পরিসীমা মগধ হতে কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে বৃহত্তর বাংলা বলতে এই পাল-শাসনাধীন বাংলা দেশকে (উত্তর-বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা ও কামরূপ) বোঝান হয়েছে। বৃহত্তর বাংলার মৃত্তিকারসে চর্যা জন্ম পরিগ্রহ করায় ইহার উপর বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা, আসাম—এই কয়েকটি দেশের দাবি উপস্থিত হয়েছে। ইহার মধ্যে দু'একটি মৈথিলী ও উড়িয়া শব্দ থাকায় মিথিলা ও উড়িষ্যাবাসীরা ইহাকে তাঁদের দেশের সাহিত্য বলে দাবি করেছেন। কিছু কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ থাকায় কেহ কেহ চর্যাকে হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। নৌবাহনের নানা দৃষ্টান্ত ও প্রবাদ-প্রবচন দেখে চর্যাকে বাংলারই সামগ্রী বলে মনে হয়। আবার চর্যাপদে বর্ণিত পর্বত্য প্রদেশের বর্ণনা এবং দু'চারটি প্রক্ষিপ্ত অসমীয়া শব্দ আসামের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে বর্তমান পশ্চিম বাংলা ও পূর্বপাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে চর্যাকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে গেলেই হতাশ হতে হবে; চর্যার বাংলাদেশ বলতে পূর্বকথিত বৃহত্তর বাংলার স্মৃতিই সদা জাগরূক রাখতে হবে

চর্যার মধ্যে তৎকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশ অনার্যপ্রধান। গুপ্তযুগ থেকে (খ্রীঃ ৪র্থ শতক) আর্য ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে শুরু হলেও বাংলা কোনদিন আপন স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়নি। বাঙালী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তাকে একটা নূতন রূপ দিয়ে নিয়েছে। বাংলায় আর্য-আগমনের পূর্বে এদেশে শবর, পুলিন্দ, ডোম, নিষাধ, চণ্ডাল প্রভৃতি আদিম অধিবাসীর প্রভাব সমাজে যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল এবং তৎকালীন বাঙালী জাতির একটা বড় অংশ তারা অধিকার করে নিয়েছিল। চর্যার ভিতরে তাই তাদের চরিত্র, বাসস্থান ও জীবনযাত্রার কথা এত প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই আদিম জাতিগুলি সমাজের উচ্চস্তরে স্থান পায়নি, সমাজের নিম্ন-অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে সভ্য নাগরিক জীবন থেকে অনেক দূরে তাদের সরে যেতে হয়েছিল। চর্যার কয়েকটি পদে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আঠাশ সংখ্যক পদে বলা হয়েছে,—

সমাজ ব্যবস্থা

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥

"উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে শবরী বালিকা বাস করে। শবরীর পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জাফলের মালা।"

উল্লিখিত পদটিতে শবরজাতির জীবিকানির্বাহের পরিচয় নিহিত রয়েছে। শবর-শবরী মহাসুখে কর্পূরযুক্ত তাম্বূল সেবন করত; জীবিকানির্বাহের জন্য শরধনু নিয়ে শিকারে বেরিয়ে যেত।

সভ্য নাগরিক জীবন থেকে দূরে উচ্চভূমিতে বাসের কথা আরো দুয়েকটি পদে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী;' 'গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী' (গগনে গগনে সংলগ্ন বাড়ী)।

নিষাধদের বৃত্তি ছিল মৃগশিকার। চর্যার কয়েকটি পদে তার নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। ভুসুকপাদের একটি পদে বলা হয়েছে,—

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুক অহেরী॥

"কাকে কিভাবে ঘিরে রয়েছ? (তোমার) চারদিক বেড়ে হাঁক পড়ল। আপন মাংসের জন্য হরিণ সকলের বৈরী। (ব্যাধেরা) ক্ষণেকের জন্যও ভুসুকুকে (ভুসুকুরূপ হরিণকে) ছাড়ে না।" ব্যাধ-সন্ত্রস্ত হরিণ তখন "তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবণ না পাণী" (তৃণ না ছুঁয়ে, জল পান না করে) বন ছেড়ে অন্য বনে দ্রুত পলায়ন করল।

চর্যার অনেকগুলি পদের মধ্যে নিম্নজাতীয়া ডোম্বীর উল্লেখ পাওয়া যায়। নেড়া ব্রাহ্মণের নিকট অস্পৃশ্যা এই ডোম্বীর বাড়ী ছিল নগরের বাইরে।

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাই সো বাহ্ম নাড়িআ॥

দেশে দেশে বাঁশের তাঁত, চুপড়ি ও চেড়াঙি বিক্রয় ছিল তাদের পেশা (তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চাং গেড়া)। ইহা ছাড়া অন্যত্র এই ডোম্বীকে পাটনীরূপে ভাঙ্গা নৌকায় নদী পারাপার করার উল্লেখও পরিদৃষ্ট হয়। চতুর্দশ সংখ্যক পদে বলা হচ্ছে,—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরেঁ বহই নাই।
তহি বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ নীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদগুরু পাঅপএ জাইব পুনু জিণউরা॥

"গঙ্গা-যমুনার মাঝে বহে নাও, তাতে মাতঙ্গ কন্যা ডোম্বী জলে ডুবে ডুবে যোগীকে লীলায় পার করে। ডোম্বী তুমি বাহ, বেয়ে চল ডোম্বী, পথে দেরী হল। সদগুরুপাদপদ্মে যাব, পুনরায় জিনপুর (যাব)।

ডোমজাতীয় নিম্নশ্রেণীর নারীসমাজের নৃত্যগীতের প্রথা প্রচলিত ছিল। একটি পদ্মের চৌষট্টিটি পাপড়ির উপর ডোম্বীর অসাধারণ নৃত্যকুশলতার চমৎকার বর্ণনা কাহ্নুপাদের একটি পদে (দশম সংখ্যক) পাওয়া যায়।

এক সো পদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥

চর্যার মধ্যে তৎকালীন সমাজের জেলে, তাঁতী, ধুনুরী ছুতার প্রভৃতি বহুশ্রেণীর কর্মজীবীর পরিচয় নিহিত রয়েছে। ত্রয়োদশ সংখ্যক পদে কাহ্নুপাদ নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন,—

পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়ুআল।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল॥

অর্থাৎ হে কাহ্নু, বিশুদ্ধ পঞ্চতথাগতাত্মক কায়া-নৌকা মায়াজালবৎ স্পর্শ-খাদ্যাদিবিষয়সমুদ্রে বেয়ে চল। ইহাতে বোঝা যাচ্ছে তখনও তরঙ্গসংকুল মাঝনদীতে 'মায়াজাল' পেতে মাছ ধরা হত।

শান্তিপাদের একটি পদে (ছাব্বিশ সংখ্যকে) ধুনুরীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। চর্যাকার সেখানে বলছেন,—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু॥

"তুলা (চিত্ত) ধুনে ধুনে আঁশ আঁশ করলাম। আবার আঁশ ধুনে অবয়বহীন করলাম।"

দু-একটি পদে ছুতারদেরও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, (কাহ্নপাদের) একটি পদে (পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক) বলা হয়েছে,—

জো তরু ছেব ভেবউ ন জানই।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ় তা ভব মাণই॥
সুণ তরুবর গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল॥

"যারা (চিত্ত) তরু ছেদন-ভেদন জানে না, তারা মূর্খ, (তারা) সরে পড়ে ভবকে মানে। (অবিদ্যারূপ) শূন্য-তরুবরকে গগন-কুঠার অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রভাস্বর কুঠার (দ্বারা ছেদন কর)। ডাল নহে, সেই তরুমূলই ছেদন কর। এখানে তরুর ছেদন-ভেদনের কৌশল থেকে ছুতারদের ক্রিয়াকর্মের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

গার্হস্থ্য জীবন-চিত্র

চর্যাপদগুলির ভিতরে বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য চিত্রের—চুরি-ডাকাতি, বিবাহ-যাত্রা, দাবাখেলা, মদ্যপান ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। কুক্কুরীপাদের একটি পদে (দ্বিতীয় সংখ্যক) কর্ণভূষণ চুরির চমকপ্রদ বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। পদকর্তা বলছেন,—

আঙ্গণ ঘরপণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥

"ওহে অবধুতি, তুমি শোন—অজন ঘরের কাছেই। অর্ধরাতে চোরে কানেট (কর্ণভূষণ) নিল। শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল, (কিন্তু ভয়ে ভয়ে) বধূ জেগে আছে। (অসাবধানে) কানেট চোরে নিল; (এখন আবার) কোথায় গিয়ে চাইবে।" কাহ্নুপাদের একটি পদে (ছত্রিশ সংখ্যক) ডাকাতির উল্লেখ রয়েছে,—

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ-ভাণ্ডার লই সঅলা অহারী॥

"শূন্যবাহুতে তথতা (নির্বাণরূপ খড়্গ) দ্বারা প্রহার করে মোহভাণ্ডার সকলই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

পটহ-মাদল, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যসহ প্রচুর আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে বিবাহ-যাত্রার সুন্দর চিত্র চর্যাপদে পাওয়া যায়। উনিশ সংখ্যক পদে কাহ্নুপাদ জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করে ডোম্বীকে বিয়ে করতে চলেছেন,—

জঅ জঅ দুন্দুভি সাদ উছলি আঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলি আ॥

বিয়ে করে বেশ যৌতুকও পাওয়া যেত। যৌতুকের লোভে অনেকে নীচকুলে বিয়ে করত। কাহ্নপাদের উক্তি থেকে তা অনুমান করা যায়। কাহ্নুপাদ বলছেন,—

ডোম্বী বিবাহি আ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥

"ডোম্বীকে বিবাহ করে জন্ম নাশ করলাম, কিন্তু যৌতুকে লাভ হল অনুত্তর ধাম।"

কাহ্নুপাদের একটি পদে (দ্বাদশ সংখ্যক) দাবাখেলার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়,—

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদ্‌গুরু-বোহেঁ জিতেল ভববল॥

* * *

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।

মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিতা।
অবশ পরিআ ভববল জিতা॥
ভণই কাহ্নু আম্হে ভাল দান দেহুঁ।
চউষট্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ॥

"করুণা-পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি। সদ্‌গুরুর উপদেশে (রূপাদি-বিষয়সমূহরূপ) ভববল জিতলাম। প্রথমেই তেড়ে গিয়ে বড়েকে মারলাম, তারপর গজবর তুলে পাঁচজনকে ঘায়েল করলাম। (প্রজ্ঞারূপ) মন্ত্রীকে দিয়ে (চিত্তরূপ) ঠাকুরকে (দাবাখেলার রাজা) পরিনিবৃত্ত করলাম, অবশ করে ভববল হল জিত। কাহ্নু বলে,—আমি ভাল দান দিই, চৌষট্টি কোঠা গুনিয়া লই।"

চর্যার তৃতীয় সংখ্যক পদে শুঁড়ীগৃহে মদ্যপানের একটি সজীব চিত্র নিপুণ তুলিতে অঙ্কিত হয়েছে,—

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥

* * *

দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিআ।
আইল গরাহক অপনে বহিআ॥
চউশঠি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥

"এক শুঁড়িনী দুই ঘরে প্রবেশ করে, সে চিকন বাকলের দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। দশম দ্বারে (নবদ্বারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ বৈরোচন-দ্বার) চিহ্ন দেখে (মদের) গ্রাহক আপনি চলে এসেছে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে; গ্রাহক একবার ঢুকল, (তারপর আর কোন) সাড়াশব্দ নেই।"

চর্যার কয়েকটি পদে নদীমাতৃক বাংলা দেশের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চর্যার নিগূঢ় তত্ত্বকথাগুলি বিবৃত করা হয়েছে এই সমস্ত সাগর-নদী-খাল-বিখালের রূপকচিত্রের সাহায্যে। কম্বলাম্বরপাদ অতীব দক্ষতার সহিত নৌ-বাহনের খাঁটি বাস্তব চিত্র (অষ্টম চর্যায়) অঙ্কন করেছেন,—

নদী-মাতৃক বাংলার চিত্র

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
বাহতু কামলি গঅন উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ॥
খুন্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি॥
মাঙ্গত চড়্হিলে চউদিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ॥
বামদাহিন চাপী মিলি মিলি মাঙ্গা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সাঙ্গা॥

"আমার করুণা-নৌকা সোনায় (সর্বশূন্যতায়) ভর্তি, সেখানে রূপা (অর্থাৎ রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধগঠিত বস্তুজগৎ) রাখার স্থান নেই। কম্বলি, তুমি গগন (নির্বাণ) উদ্দেশে বেয়ে চল, দেখি কেমন করে গত জন্ম পুনরায় ফিরে আসে। হে কম্বলি, তুমি সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা করে খুঁটি উপড়ে কাছি মেলে বেয়ে যাও। মার্গেতে চড়ে তুমি চারদিকে চাও, দাঁড় না থাকলে কে বাইতে পারে? বামে-ডাইনে চেপে মার্গসাথে চললে বাটেতেই মিলে যাবে তোমার মহাসুখের সঙ্গ।"

চর্যার ভাষা ও ছন্দ॥

"চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" প্রকাশের পর (১৯১৬) ইহার ভাষা সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ সৃষ্টি হয়। সম্পাদক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসংশয়ে ইহার ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে দাবি জানান। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জনরায় মহাশয়ও শাস্ত্রী মহাশয়ের মতেরই প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু ইহার কয়েক বছর পরে ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর "The History of Bengali Language" (১৯২০) নামক বক্তৃতামালার ত্রয়োদশ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত নহে।

চর্যার ভাষা

ইহার ছ-বচর পরে ১৯২৬ সালে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "The Origin and

Development of Bengali Language" গ্রন্থে চর্যার ভাষাতত্ত্ব নিপুণভাবে আলোচনা করে বলেন যে "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" নামক সঙ্কলন গ্রন্থখানি আদিমতম বাংলা ভাষায় রচিত। অবশ্য ইহাতে কিছু কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ এবং দু'চারটি ওড়িয়া—মৈথিলী শব্দও রয়েছে। পরবর্তিকালের ভাষাতাত্ত্বিকগণ সুনীতি বাবুর সিদ্ধান্তকেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন। ১৯২৭ সালে প্যারিস হতে প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে (Les chants Mystique de saraha et de kanha—1927) ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবও সুনীতিবাবুর ভাষাতাত্ত্বিক মত স্বীকার করে নেন। অবাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ (রাহুল সাংকৃত্যায়ন—কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল) চর্যাকে বিহারী ভাষায় রচিত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ডাঃ জয়কান্ত মিশ্র তাঁর "History of Maithili Literature" গ্রন্থে চর্যার ভাষাকে "a sample of Old Maithili" বলে দাবি জানিয়েছেন। প্রখ্যাত অসমীয়া পণ্ডিত ডাঃ বাণীকান্ত কাকতি চর্যাপদের সঙ্গে অসমীয়া ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে বলেছেন,—চর্যার ভাষা বাংলা ও অসমীয়া এই দুই ভাষার অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে পৃথক পৃথক রূপ নেওয়ার পূর্বেকার নিদর্শন। ডাঃ কাকতির এই অভিমতকে স্বীকৃতি জানিয়ে অসমীয়া সাহিত্যের হালি ইতিবৃত্তকার[১] আরো অনেকখানি অগ্রসর হয়ে বলেছেন—চর্যার ভাষা যে অধিকতম অসমীয়া সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্তম পুরুষে 'মো', আত্মবোধক সর্বনাম 'অপনে', ধাতু √থাক, √আছ, কর্মবাচ্যাত্মক 'ইয়' প্রত্যয়, অতীত 'ইল', ভবিষ্যত 'ইব', অনুজ্ঞার দ্বিতীয় পুরুষে 'হ', চতুর্থীর 'লৈ', সপ্তমীর 'ত', ষষ্ঠীর 'র' ইত্যাদি অসমীয়ার ভালোরকম লক্ষণ চর্যার ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু শব্দ সাদৃশ্যও বিশেষভাবে স্মরণীয়। যেমন—সামায় (সোমায়), বেণ্ট (বাঁট), তেন্তেলী (তেন্ডেলী), চকা (চকা), ঘিনি (ঘৈণী), কুঠার, আপোন, মিঅলি (মিহলি) ইত্যাদি বহু। এখানে ইতিবৃত্তকার অসমীয়া শব্দ ক্রিয়াবিভক্তির যে প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন তা পরিমাণে যথেষ্ট নয়। কাজেই অসমীয়া ভাষার সঙ্গে চর্যার ভাষার এই যৎসামান্য সাদৃশ্যের খাতিরে চর্যার ভাষাকে অসমীয়া ভাষার নিদর্শন বলে মেনে নেওয়া যায় না।

পরিতাপের বিষয় অবাঙালী পণ্ডিতগণ এভাবে তাঁদের স্বকপোল

১। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা

কল্পিত সিদ্ধান্তের মূলে কোন অকাট্য যুক্তি বা যথোচিত কারণ না দেখিয়ে চর্যার উপর অযথা দাবি জানিয়েছেন। এজন্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে চর্যাকে বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন রূপে গণ্য করাই বিধেয় বলে মনে করি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে,—শাস্ত্রীমহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বৌদ্ধগান ও দোহা' গ্রন্থে একই কবির প্রণীত দোহার ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং চর্যার ভাষা বাংলা হল কেন? খ্রীঃ দশম শতকের দিকে বাংলা ভাষা যখন মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, সে সময় পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে শৌরসেনী অপভ্রংশ শিষ্ট ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। সেজন্য সরহ, তিল্লো, কাহ্নু একই সঙ্গে বাংলা ও শৌরসেনী অপভ্রংশে যথাক্রমে পদ ও দোহা রচনা করেন।

চর্যার ভাষা যে বাংলা তা বিভক্তি-প্রয়োগ, ক্রিয়াপদ-গঠন ও প্রবাদ-প্রবচনগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। বাংলায় কর্তৃকারকে সাধারণত শূন্য বিভক্তি হয়; কখনও কখনও সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহারও দেখা যায়। চর্যাকারগণও কর্তৃকারক-গঠনে কখনও শূন্য বিভক্তি (কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল), কখনও সপ্তমী বিভক্তি (কুম্ভীরে খা এ) প্রয়োগ করেছেন। ইহা ছাড়া কর্মে শূন্য বিভক্তি (বান্ধন তাড়িউ)—এ-বিভক্তি (সাখী করিব জালন্ধরি পাএ); করণে শূন্য বিভক্তি (বাঢ়ই সো তরু সুভাসুভ পানী)—এ-বিভক্তি (জোইণিজালে রঅণি পোহা অ,; নিমিত্তার্থে চতুর্থী—কে (বাহবকে পার অ), রে (তোহোরে বিরুআ বোলই); সম্বন্ধে—এর (রুখের তেন্তলি, পাটের আস, হরিণীর নিলঅ), র (হরিণার খুর); অধিকরণে—এ (নেউর চরণে) ব্যবহৃত হয়েছে। অতীতকালে ক্রিয়া বিভক্তি 'ল'-'ইল' (সুসুরা নিদ গেল, কানেট চোরে নিল, বাটত মিলিল) এবং ভবিষ্যৎকালে—ইব (কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস, তোএ সম করিব ম সাঙ্গ) ইত্যাদির প্রয়োগ বাংলার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলা সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার যুগ্ম প্রয়োগও চর্যাপদে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমন,—গুণিয়া লেহুঁ, সড়ি পড়িআঁ, দিল ভণিআ, উঠি গেল। বাংলার বিশেষ বাগ্-ভঙ্গিমাও চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়—ধরণ ন জাঅ, কহন ন জাই ইত্যাদি। বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদে—অপণা মাংসে হরিণা বৈরী (আপন মাংসের জন্ত হরিণ নিজের বৈরী); দুহিল

দুধু কি বেণ্টে ষামায় (দোহা দুধ কি আর বাঁটে আসে ?) ; বর সুণ গোহালী কি মো দুটুঠঁ বলন্দে (দুষ্ট বলদ হতে বরং শূন্য গোয়াল ভাল) ; দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তেণ দেখই (দুধ মাঝে আছে সর চোখে নাহি পড়ে)।

অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ মানুষের নিকট চর্যার গুহ্য তত্ত্ব-কথা ও সাধনপদ্ধতি প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য চর্যাকারগণ প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার করেছেন। চর্যার ভাষাকে এজন্য সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়ে থাকে। পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা শব্দটির নানান অর্থ নির্ণয় করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যা ভাষার অর্থ করেছেন,—'আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না'। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন যে,—ভাষাটি মূলে সন্ধ্যাভাষা নয়, ইহা 'সন্ধা ভাষা' (সম্-ধা) অর্থাৎ একটা বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় নিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে যে ভাষা। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র ও তার উপর সমুদয় টীকা-টিপ্পনীতে 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সন্ধ্যা দেশের (বীরভূম ও সাঁওতালপরগণার পশ্চিমাংশ) ভাষা বলে নাম হয়েছে 'সন্ধ্যাভাষা'। ম্যাক্সমূলার 'সন্ধ্যা' শব্দটির অর্থ করেছেন—প্রচ্ছন্ন। অর্থ-প্রয়োগের তারতম্য থাকলেও 'সন্ধার' পরিবর্তে 'সন্ধ্যা' শব্দটি গ্রহণ করাই সঙ্গত বলে মনে হয়।

সন্ধ্যা ভাষা

চর্যার ছন্দবিচার করলে দেখা যাবে বাংলা ছন্দের সঙ্গে (পয়ার-ত্রিপদী) ইহার ছন্দের আত্মিক যোগ নিহিত রয়েছে। মাত্রা-সমকতা নিয়ে কিছু কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হলেও চর্যাতে প্রধানত পয়ার, ত্রিপদী ও পাদাকুলক ছন্দের সুরই ধ্বনিত হয়েছে। নিম্নে পর্ব ও মাত্রা বিভাগ করে প্রতিটি ছন্দের প্রয়োগ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হল :—

চর্যার ছন্দ

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১

(ক) ধ ম ণ চ ম ণ বে ণি | পি ণ্ডি ব ই ঠা

২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

(খ) চী অ থি র ক রি | ধ র হ রে না ই

২ ২ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১

আ ন উ পা য়ে | পা র ণ জা ই

(২) ত্রিপদী—(৬ + ৬ + ১০), (৮+৮+১০), (১০+১০ + ১০)।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১
(ক) এ ড়ি এ উ ছা ন্দ ক বান্ধ
১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ক র ণ ক পা টে র আ স।
২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১
(খ) মো র ঙ্গি পীচ্ ছ প র হি ণ স ব রী
২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
গি ব ত গু ঞ্জ রী মা লী।
২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
(গ) রা উ তু ভ ণ ই ক ট ভু সু ক ভ ণ ই ক ট
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১
স অ লা অ ই স স হা ব।
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
জ ই তো মু ঢ়া অচ্ ছ সি ভা ন্তী
২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
পুচ্ ছ তু সদ্ গু রু—পা ব॥

(৩) পাদাকুলক—(৮+৮)।

২ ১ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ২
(ক) দু আ ন্তে চি খি ল | মা ঝে ন থা হী।
২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ২ ১ ২ ১
(খ) ফা ড়ি অ মো হ ত রু | পা টী জো ড়ি অ।
২ ২ ১ ১ ২ | ২ ১ ১ ২ ২
(গ) রা তি ভ ই লে | কা ম রু জা অ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশ-গুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি নেপালে চর্যাগীতিকার সমধর্মী প্রায় আড়াইশ শব্দের সন্ধান পান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental and African Studies বিভাগের সংস্কৃতশাখার রীডার ...র নবাবিষ্কৃত তথ্য ...ঃ আরনল্ড বাকে ডাঃ দাশগুপ্তকে এই তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করেন। ...ধ্যাপক বাকে প্রাচ্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। ১৯৫৫ খ্রীঃ নেপাল পরি-...মণের সময় তিনি বৌদ্ধ বজ্রযানী শাখাভুক্ত এক নেপালী সন্ন্যাসীর নিকট ...য়েকটি বিচিত্র সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে সেগুলির 'টেপরেকর্ড' করে নেন। ...৯৬৩ খ্রীঃ ডাঃ দাশগুপ্ত রবীন্দ্র বক্তৃতা উপলক্ষে লণ্ডনে উপস্থিত হলে অধ্যাপক ...কে তাঁহাকে ঐ 'টেপরেকর্ডের' সঙ্গীতগুলি শুনান এবং তিনি বুঝতে পারেন যে

দুধু কি বেণ্টে ষামায় (দোহা দুধ কি আর বাঁটে আসে ?) ; বর সুণ গোহালী কি মো দুট্‌ঠঁ বলন্দে (দুষ্ট বলদ হতে বরং শূন্য গোয়াল ভাল); দুধ মাঝেঁ লড় অচ্ছন্তেণ দেখই (দুধ মাঝে আছে সর চোখে নাহি পড়ে)।

অশ্রদ্ধাশীল সাধারণ মানুষের নিকট চর্যার গুহ্য তত্ত্ব-কথা ও সাধনপদ্ধতি প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য চর্যাকারগণ প্রহেলিকাময় ভাষার ব্যবহার করেছেন। চর্যার ভাষাকে এজন্য সন্ধ্যা ভাষা বলা হয়ে থাকে। পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা শব্দটির নানান অর্থ নির্ণয় করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যা ভাষার অর্থ করেছেন,—'আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না'। মহামহোপাধ্যায় বিষ্ণুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন যে,—ভাষাটি মূলে সন্ধ্যাভাষা নয়, ইহা 'সন্ধা ভাষা' (সম্-ধা) অর্থাৎ একটা বিশেষ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায় নিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে যে ভাষা। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্র ও তার উপর সমুদয় টীকা-টিপ্পনীতে 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে সন্ধ্যা দেশের (বীরভূম ও সাঁওতালপরগণার পশ্চিমাংশ) ভাষা বলে নাম হয়েছে 'সন্ধ্যাভাষা'। ম্যাক্‌স্‌মূলার 'সন্ধ্যা' শব্দটির অর্থ করেছেন—প্রচ্ছন্ন। অর্থ-প্রয়োগের তারতম্য থাকলেও 'সন্ধার' পরিবর্তে 'সন্ধ্যা' শব্দটি গ্রহণ করাই সঙ্গত বলে মনে হয়।

সন্ধ্যা ভাষা

চর্যার ছন্দবিচার করলে দেখা যাবে বাংলা ছন্দের সঙ্গে (পয়ার-ত্রিপদী) ইহার ছন্দের আত্মিক যোগ নিহিত রয়েছে। মাত্রা-সমকতা নিয়ে কিছু কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হলেও চর্যাতে প্রধানত পয়ার, ত্রিপদী ও পাদাকুলক ছন্দের সুরই ধ্বনিত হয়েছে। নিম্নে পর্ব ও মাত্রা বিভাগ করে প্রতিটি ছন্দের প্রয়োগ ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হল :—

চর্যার ছন্দ

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১
(ক) ধ ম ণ চ ম ণ বে ণি | পি ণ্ডি ব ই ঠা
২ ২ ১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
(খ) চী অ থি র ক রি | ধ র হু রে না ই
২ ২ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ১ ১
আ ন উ পা য়ে | পা র ণ জা ই

(২) ত্রিপদী—(৬ + ৬ + ১০), (৮+৮+১০), (১০+১০ + ১০)।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১
(ক) এ ড়ি এ উ ছা ন্দ ক বান্ধ
১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
ক র ণ ক পা টে র আ স।
২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১
(খ) মো র ঙ্গি পীচ্ ছ প র হি ণ স ব রী
২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
গি ব ত গু ঞ্জ রী মা লী।
২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
(গ) রা উ তু ভ ণ ই ক ট ভু সু ক ভ ণ ই ক ট
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১
স অ লা অ ই স স হা ব।
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
জ ই তো মূ ঢ়া অচ্ ছ সি ভা ন্তী
২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১
পুচ্ ছ তু সদ্ গু রু—পা ব॥

(৩) পাদাকুলক—(৮+৮)।

২ ১ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ২
(ক) দু আ ন্তে চি খি ল | মা ঝে ন থা হী।
২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ২ ১ ২ ১
(খ) ফা ড়ি অ মো হ ত রু | পা টী জো ড়ি অ।
২ ২ ১ ১ ২ | ২ ১ ১ ২ ২
(গ) রা তি ভ ই লে | কা ম রু জা অ।

চর্যার নবাবিষ্কৃত তথ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সম্প্রতি নেপালে চর্যাগীতিকার সমধর্মী প্রায় আড়াইশ শব্দের সন্ধান পান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental and African Studies বিভাগের সংস্কৃতশাখার রীডার মিঃ আরনল্ড বাকে ডাঃ দাশগুপ্তকে এই তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করেন। অধ্যাপক বাকে প্রাচ্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। ১৯৫৫ খ্রীঃ নেপাল পরিভ্রমণের সময় তিনি বৌদ্ধ বজ্রযানী শাখাভুক্ত এক নেপালী সন্ন্যাসীর নিকট কয়েকটি বিচিত্র সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে সেগুলির 'টেপরেকর্ড' করে নেন। ১৯৬৩ খ্রীঃ ডাঃ দাশগুপ্ত রবীন্দ্র বক্তৃতা উপলক্ষে লণ্ডনে উপস্থিত হলে অধ্যাপক বাকে তাঁহাকে ঐ 'টেপরেকর্ডের' সঙ্গীতগুলি শুনান এবং তিনি বুঝতে পারেন যে

চর্যাপদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে উহাদের বেশ মিল রয়েছে। অধ্যাপক বাকের নিকট হতে দাশগুপ্ত মহাশয় তখন ২০টি সঙ্গীত 'টেপরেকর্ড' করে নেন।

অতঃপর ডাঃ দাশগুপ্ত চর্যার নতুন তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নেপালে যান। নেপালে তিনি প্রায় আড়াইশ পদের সন্ধান পান এবং তার মধ্যে বজ্রাচার্যগণ তাঁদের ধর্মসংক্রান্ত যে সব পুঁথি হতে গান করেন, সেরকম প্রায় কুড়িটি পুঁথি হতে বেছে একশ চর্যাপদ সংগ্রহ করে আনেন। পুঁথিগুলির অধিকাংশ বিকৃত এবং বহু পাঠান্তর মিলিয়ে পাঠ নির্ণয় করতে হয়েছে। নেপালে এই সঙ্গীতগুলি 'চচা' সঙ্গীত নামে প্রচলিত।

এই 'চচা' সঙ্গীতগুলি বজ্রাচার্যগণ (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুরোহিত) নৃত্যসহযোগে গান করে থাকেন। গীতানুষ্ঠানের সময় পুঁথির ব্যবহার করা হয়; পুঁথি জীর্ণ হয়ে গেলে পুনরায় নকল করা হয়। পুঁথিগুলি তুলট কাগজে নেওয়ারী (নেপালী) অক্ষরে লিখিত। তবে লিপির ঢংটি অনেকক্ষেত্রে দেবনাগরী হরফের মতো। আশ্চর্যের বিষয়, বজ্রাচার্যগণ পুরুষানুক্রমে মন্ত্র হিসেবে এই পদগুলি গান করে আসছেন, অথচ তাঁহাদের কেহই গানের মর্ম বোঝেন না। গানগুলির অর্থ না বোঝার জন্যই জীর্ণ পুঁথি নকল করার সময় পাঠ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন,—

কৈ রে মনসা বাজেরে বীণা
অনহত শবদে ত্রিভুবন লীনা।

পাঠান্তরে দেখা গিয়েছে—'শবদে' কোথাও 'সবদেহে' এবং কোথাও বা 'সর্বদেবে' রূপান্তরিত হয়েছে।

ডাঃ দাশগুপ্তের বাছাইকরা একশ গানের মধ্যে ১৮-১৯টি প্রাচীন ও চর্যাপদের সমগোত্রীয়। এই গানগুলি ৯ম—১২শ শতাব্দীতে লিখিত বলে অনুমিত হয়। আরও ৪৫টি গান ১৩শ—১৫শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা বলে মনেহয়।

কোন্ অঞ্চলে বসে এ গানগুলি লেখা হয়েছিল তা জানা যায়নি। অবশিষ্ট পদগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন এবং এগুলি নেপাল অঞ্চলেই লিখিত। এগুলির মধ্যে দেবদেবীর বর্ণনা এবং বহু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছে।

মোট একশটি পদের মধ্যে কয়েকটিতে চর্যার ভাব-ভাষা রূপক-প্রতীক ও প্রকাশরীতির নিবিড় সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যায়। এই শ্রেণীর একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

এ মহিমণ্ডল মেরুসমুদ্রা
জনধন জউবন উদকবিন্দু চন্দ্রা।
পেখুরে অনুদিন লোঅনে গঅনে
ফুল্ল পরিহাসই জিণগুণ বঅনে।
স্কন্ধে ধারী:ইন্দি বিষয় সর্ব একা
সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা।
পবন দুই ভেদিআ ডিঢ় থিরে চিআ
জলই বজ্রানল দহদিহ ডাহিআ।
সুগত ভেদ ভাবইআ নহোইরে শোধা
সুগত ভণই অচিন্তালয় বোধা।

কয়েকটি পদের মধ্যে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। পদকর্তাগণ লৌকিক রূপকের মধ্য দিয়ে তা সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দর্শনের গভীর তত্ত্বকে সহজবোধ্য করার জন্য তাঁরা দেব-দেবী বা যোগী-যোগিণীর বাহ্যিক মিলনদৃশ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। ইহাতে অনুমান করা যায়, পরবর্তিকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবসাহিত্যে ও শাক্তসাহিত্যে যে লৌকিক রূপক প্রযুক্ত হয়েছে তা এই প্রাচীন চর্যাসঙ্গীতের প্রভাবের ফল।

ডাঃ দাশগুপ্ত বলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে কয়েকটি চর্যা-গীতিকা সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে 'তিঅড্ডাচাপী' গানটিও তিনি নেপালে গীত হতে শুনেছেন। এইসব দেখে-শুনে তাঁহার মনে হয়েছে বিপুল প্রক্ষেপ, অবোধ্য শব্দ এবং পাঠান্তরের কাঁটা মাড়িয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ মহাযান ধর্মা-বলম্বী সহজ সাধনায় প্রাচীন ধারাটি এখনও নেপালী বজ্রাচার্যদের নিত্যকৃত্যের মধ্যে বজায় রয়েছে।

কয়েকটি চর্যার মধ্যে পরবর্তিকালের ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। কারো কারো ধারণা, চর্যাগীতিকার এবং অন্যান্য অনুরূপ ধরনের গানগুলির ভাষা ব্রজবুলির মতোই 'সৃষ্ট' ভাষা, যা সমগ্র পূর্বভারতে ব্যবহৃত হত। গবেষণার দ্বারা যদি ইহা প্রমাণিত হয় যে বিদ্যাপতির পূর্বেও ব্রজবুলির ব্যবহার ছিল তাহলে এক্ষেত্রে মিথিলার দাবি নস্যাৎ হয়ে যাবে। তাছাড়া সংগৃহীত গানগুলি তৎকালে পূর্বভারতীয় ভাষাগুলির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে

গভীর ইঙ্গিত বহন করতে পারে। ফলে ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন হতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতার মধ্যে প্রায়ই বাসলী দেবীর নামোল্লেখ করেছেন। যেমন,—বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে। কারো মতে এই 'বাসলী' শব্দটি 'বিশালাক্ষী শব্দ হতে এসেছে; আবার কারো কারো মতে ইহা 'বজ্রেশ্বরী' শব্দ হতে এসেছে,—

বজ্রেশ্বরী 7 বাজসলী 7 বাঅসলী 7 বাউসলী 7 বাসলী।

ডাঃ দাশগুপ্ত-প্রাপ্ত এই চচা বা চর্যা সঙ্গীতের কোনো কোনো পদে 'বাচ্ছলী' শব্দটির প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। ডাঃ দাশগুপ্ত অনুমান করেন, 'বাসলী' শব্দটি হয়ত 'বাচ্ছলী' হতে এসেছে; আর বাচ্ছলী শব্দটি 'বৎসল্য' শব্দের রূপভেদ। ভক্তবৎসলা কোনো প্রাচীন দেবীই হলেন এই বাচ্ছলী।

ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্য এবং সর্বোপরি চর্যাগীতিকার ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনায় চর্যার এই নবাবিষ্কৃত পুঁথি যে বিশেষ কার্যকরী হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ ঐতিহাসিক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাংলা সাহিত্যের আদিযুগকে 'হিন্দু-বৌদ্ধযুগ' আখ্যা দান করে শূন্য-পুরাণ,মানিকচাঁদের গান, নাথ-গীতিকা, কথা-সাহিত্য এবং ডাক ও খনার বচনকে উক্ত যুগের নিদর্শন রূপে পরিগ্রহণ করেছেন (সেন মহাশয় চর্যাপদের কোন উল্লেখ করেননি)। কিন্তু সেন মহাশয় কর্তৃক গৃহীত নিদর্শনাদির সাহিত্যিকরূপ লক্ষ্য করলে কিছুতেই ঐগুলিকে প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে (অর্থাৎ খ্রীঃ ১০ম—১২শ শতকে রচিত বলে) গ্রহণ করা যায় না। কারণ ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা নিতান্ত অর্বাচীন কালের বলে মনে হয়। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের মতে চর্যাপদই বাংলা সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন। চর্যা ছাড়া খ্রীঃ ১০ম—১২শ শতকের মধ্যে রচিত বাংলা সাহিত্যের আর কোন নজির পাওয়া যায়নি। এই সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ সংক্রান্ত সমন্বয়ধারা স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু চর্যাপদে আর কোন উল্লেখ নেই। উপরন্তু ইহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নস্যাৎ করে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা ও ব্রাহ্মণদের নিন্দা-কুৎসাই বেশী করে রটান হয়েছে। সুতরাং চর্যাকে একমাত্র নিদর্শনরূপে গণ্য করে এই যুগকে হিন্দুবৌদ্ধযুগ না বলে আদিযুগ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

হিন্দু বৌদ্ধযুগ অভিধার সমীচীনতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী

পদাবলী সাহিত্যের পটভূমি

বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ॥

বৈষ্ণব ধর্ম বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দেখা দেয় এবং বেদ-উপনিষদ-পুরাণাদির মধ্যে বিষ্ণু-কৃষ্ণ-বাসুদেবের কথা-কাহিনীকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে ইহা বিকাশলাভ করে। বৈষ্ণব বলতে বোঝায় বিষ্ণুর উপাসক। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ ও আরণ্যক-ব্রাহ্মণের বহুস্থানে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের মধ্যে বিষ্ণু ইন্দ্রের বন্ধু, সৌর-দেবতা, যুদ্ধের নেতা এবং কোথাও বা মহান দেবতারূপে পূজিত হয়েছেন। তাঁকে ঋগ্বেদে 'বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে' বা 'ত্বং বিষ্ণো সুমতিং' ইত্যাদি নানাভাবে আরাধনা করা হয়েছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষ্ণু প্রধান দেবতাতে পরিণত হন। কঠোপনিষদের মধ্যে বিষ্ণুর স্থান সকলের শীর্ষে।

বিষ্ণু

পরবর্তিকালে এই বিষ্ণুই আবার সাত্বতসকলের বাসুদেব, পাঞ্চরাত্র সকলের নারায়ণ, ঘোর অঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে যান। কেমন করে ইহা সম্ভব হল তা জানা যায় না; পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে বাসুদেবের ভক্তসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান হয় পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ) পূর্বেই বাসুদেবকে কেন্দ্র করে ভাগবতধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল। পতঞ্জলি পাণিনিসূত্র ব্যাখ্যায় বাসুদেবের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য সেখানে তিনি দেবকীনন্দন বাসুদেব ও বৃষ্ণি-বংশোদ্ভূত বাসুদেব উভয়কে পৃথক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও বাসুদেবের নাম পাওয়া যায়। সেখানে বিষ্ণু ও বাসুদেব একই।

বাসুদেব

মহাভারতের মধ্যে দেখা যায়, কৃষ্ণ ও বাসুদেব একই ব্যক্তি। তিনি

বিষ্ণুর অবতার। যদুবংশের সাত্বতকুলে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি বাসুদেব-দেবকী-নন্দন, তিনি যোদ্ধা, নীতিপ্রবক্তা ও ধর্মপ্রচারক। ক্রমে এই কৃষ্ণ-বাসুদেব বিষ্ণুর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে প্রেমের দেবতাতে পরিণত হন এবং ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলার সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা যুক্ত হলে ভাগবতধর্ম বৈষ্ণবধর্মের আকারে ব্যাপক প্রসারলাভ করে।

কৃষ্ণ

বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীন। ঠিক কোন্ সময় হতে ইহা চলে আসছে তা বলা মুশকিল। কারণ, এই ধর্মের ক্রমবিকাশের কোন সুস্পষ্ট পদাঙ্ক আবিষ্কৃত হয়নি। তবে জানা যায় খ্রীঃ পূঃ ৭০০—৬০০ অব্দেও বৈষ্ণবধর্মের অস্তিত্ব ছিল। তখন লোকে ত্রি-বিক্রম বিষ্ণুর উপাসনা করত। গয়ায় বুদ্ধের পদচিহ্ন পূজার পূর্বে বিষ্ণুপদের পূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন শিলালিপিতেও বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীনত্বের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। নানাঘাট ও ঘোষণ্ডির শিলালিপি খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক পর্যন্ত ভগবতধর্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। ঘোষণ্ডির শিলালিপিতে উল্লিখিত রয়েছে যে ভগবান সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার জন্য 'শিলাপ্রাকার' নির্মিত হয়েছিল। নানাঘাটের শিলালিপি থেকেও ভগবান সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার কথা জানা যায়। ইহার পর মথুরা অঞ্চলে ভাগবতধর্মের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ ও পরবর্তিকালের পুরাণাদিই ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ

পুরাণাদিতে কৃষ্ণলীলার কেন্দ্ররূপে মথুরা-বৃন্দাবনের কথা উল্লিখিত দেখে অনুমান করা যায় মথুরা অঞ্চলেই ভাগবতধর্মের বিশেষ প্রভাব ও প্রাধান্য বর্তমান ছিল। মাঝখানে আবার ভারতে শক-কুষাণ যুগে (খ্রীঃ পূঃ ১০৯—খ্রীঃ ৩৩০ অব্দ) ভাগবতধর্ম মথুরা অঞ্চলে ক্ষীণ হয়ে পড়ে; তার কারণ শক-কুষাণগণ ভাগবতধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। গুপ্তরাজগণের আমলে আবার ইহা প্রবল হয়ে ওঠে এবং পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মগধের গুপ্তরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ 'পরম-ভাগবত' আখ্যা গ্রহণ করে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন। এই সময় থেকে ভাগবতধর্ম সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করে। গুপ্তযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার উত্তর ভারতে ভাগবতধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ দক্ষিণ ভারতে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে। বৈষ্ণব ধর্ম মূলত ভক্তিধর্ম। ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে

ইহার বিকাশ। আর এই-ভক্তিবাদের আচার্যগণ সকলেই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী। আচার্যগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে (আলোয়ার সম্প্রদায়—শ্রী সম্প্রদায়—ব্রহ্ম সম্প্রদায়—রুদ্র সম্প্রদায়—সনক সম্প্রদায়) বিভক্ত ছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ ভারতে একশ্রেণীর কৃষ্ণপ্রেমিক ভক্ত-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহারা আলোয়ার সম্প্রদায় নামে কথিত। আলোয়ার শব্দের অর্থ—ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা। আলোয়ারগণ বৈষ্ণবকবিদের মতো তামিল ভাষায় কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক আদি রসের কবিতা-গান রচনা করেন। তামিল সাহিত্যে এগুলি 'দিব্যপ্রবন্ধম্' বা 'নালায়ির প্রবন্ধম্' নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। আলোয়ারগণের নাম—পোয়গৈ, তিরুমলিসৈ, তিরুমঙ্গৈ, তিরুপ্পান, তোণ্ডরদিপ্পদি, অণ্ডাল, মধুর কবি, কুলশেখর, পিরিয়, নর্ম, ভূতত্তার, পেয় আলোয়ার। ইঁহাদের সাধন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হল—প্রেমভক্তিনিবেদনের মধ্য দিয়ে সর্বেশ্বর কৃষ্ণকে লাভ করা। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরকে প্রেমিক বা নায়করূপে, আবার কেহ কেহ তাঁকে পতি বা প্রাণেশরূপে ভজনা করতেন। আলোয়ারগণের রচিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্রাবিড়াম্নায়ে'। ইহাতে সখীসাধনা ব্রজযুবতী, বিষ্ণুলক্ষীর উল্লেখ আছে এবং ইহার কোন কোন পদ অবিকল বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবের অনুরূপ। গ্রন্থটি সেকারণে ভক্তিধর্ম তথা বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানাধিকারী।

আলোয়ার সম্প্রদায়

কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলাদেশে গোপীভাবের সাধনা আনেন। বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে আলোয়ারদের 'প্রবন্ধম্'-এর নিকট সাদৃশ্য দেখে মনে হয় যে এই প্রবাদ একেবারে অবাস্তব নহে।

শ্রী সম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায়, সনক সম্প্রদায়—এই চারি সম্প্রদায়ের ভক্তদার্শনিকগণ সাধারণত দ্বৈতবাদী ভক্তদার্শনিক নামে পরিচিত। ইঁহারা সকলে বেদান্তসূত্রে বিশ্বাসী; কিন্তু তাঁরা শঙ্করাচার্যের বেদান্ত ভাষ্যকে স্বীকার করেন না। শঙ্করের যে "শারীরক ভাষ্য" ভারতীয় চিন্তাধারাকে একটা নতুন পথে পরিচালিত করে সেই ভাষ্যকে এই ভক্তদার্শনিকগণ একেবারে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বাস্তবজগতে যা

প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলে মনে হচ্ছে তা ভ্রান্তিমাত্র—রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করার মতো বিভ্রান্তি। কারণ, বাস্তবজগৎ মায়াকল্পিত, আসলে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। মায়া ছুটে গেলে দেখা যাবে জগৎ বলে কোনো বস্তু নেই, আছে কেবল ব্রহ্ম। যেমন বাস্তব জগৎ তেমনি জীব। জীবভ্রান্তিও মায়াপ্রভাবজনিত। মায়ার প্রভাব কাটিয়ে উঠলেই প্রত্যেক জীবই উপলব্ধি করতে পারবে যে সে জীব নয়, সে ব্রহ্ম। স্বরূপত জীব বলে কোনো বস্তু নেই, আছে কেবল ব্রহ্ম—নির্বিশেষ ব্রহ্ম।

শঙ্করাচার্য

শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তদার্শনিক রামানুজ খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের উপর একটি ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। তাঁর প্রচারিত মতকে বলা হয় 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। তাঁর প্রধান বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, তিনি সগুণ। জীব-জগতই ব্রহ্মের গুণ। যেমন সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্পর্ক, তেমনই ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্পর্ক। সূর্য ও সূর্যকিরণ এক নহে। আবার ভিন্নও নহে। কিরণমালা সূর্যেরই গুণরূপে প্রতিভাত হয়। সেইরূপ জীব-জগৎ ও ব্রহ্ম এক নহে, আবার ভিন্নও নহে। জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই গুণস্বরূপ। আমাদের যেমন শরীরের সমস্ত কার্যের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, ঈশ্বরেরও তেমনি আমাদের আত্মা বা জীবস্বরূপের সমস্ত কার্যের উপর, জগতের সমস্ত ঘটনার উপর প্রভুত্ব আছে। জীব ও জগৎ এই উভয়েই যেন ঈশ্বরের শরীর বা অংশ। ব্রহ্ম যে একান্ত নির্বিশেষ, জ্ঞান-আনন্দ প্রভৃতি যে ব্রহ্মের কোন গুণ নয়—শঙ্করের এই মতটিকে রামানুজ অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বরকে কোন প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করা যায় না। শাস্ত্রবাক্য দ্বারা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে হয়। বেদোক্ত নানাবিধ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মদ্বারা প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে, তারপরে সেই শুদ্ধচিত্তে ভগবানের উপর একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে মুক্তি দান করেন। নিরন্তর প্রীতিপূর্বক তাঁর ধ্যান করার নাম ভক্তি। এই ভক্তি ও শরণাগতিই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়।

রামানুজ

সনকসম্প্রদায়ভুক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য দক্ষিণভারতের তেলেগু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২৩৬ খ্রীঃ দেহরক্ষা করেন। নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের উপর একটি ভাষ্য লেখেন, তার নাম 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ'। নিম্বার্কের মতে জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্পর্ক অংশ-অংশী। স্বরূপে জীব জগৎ ও ব্রহ্ম একও বটে

নিম্বার্ক

(অদ্বৈত), আবার ভিন্নও বটে (দ্বৈত)। তাঁর মতকে তাই বলা হয়-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ। মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য হতে জাল সৃ করে তার মধ্যস্থলে উদাসীনভাবে বসে থাকে, ব্রহ্মও তেমনি নিজের মধ্য থে জগৎ সৃষ্টি করে নিজে স্বতন্ত্র ও উদাসীনভাবে তার কর্তারূপে অবস্থান করছে নিম্বার্ক শঙ্করের অদ্বৈত মতের একান্ত বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ নহে তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আশ্রয়; ব্রহ্ম যদি জ্ঞানস্বরূপ হন তবে তিনি ক অজ্ঞানের আশ্রয় নিতে পারেন না। এজন্য অজ্ঞানকে জগৎসৃষ্টির কারণ বলে মেনে নেওয়া যায় না, জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যাও বলা যায় না। এভা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের লোকেরা শঙ্করের মায়াবাদের তীব্র সমালোচনা ক গিয়েছেন।

নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত মত ভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জীব যদিও ভগবা সহিত অভিন্ন তথাপি সে ভগবান হতে ভিন্ন। কিন্তু জীব যদি ভগবান থে নিজেকে ভিন্ন ভাবে তবে তখনই ঘটে তার বন্ধন। জীব যখন সকল কর্ম ত্যাগ করে গভীর ভক্তিতে স্বীকার করে যে ভগবানই তার সমস্ত কা একমাত্র কর্তা তখন সে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু মুক্তির আনন্দে সে যখন তখনও সে ভগবানের সঙ্গে একান্তভাবে এক হয়ে যায় না।

ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তদার্শনিক মধ্বাচার্য দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হ তাঁর জীবৎকাল ১২শ শতকের শেষভাগ হতে ১৩শ শতকের চতুর্থভাগ (১১৯ ১২৭৮) পর্যন্ত। তিনি সর্বপ্রথম ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদকে দ্বৈতমতের দ্বারা ব্য করেন। মধ্বাচার্যের মতে জীবজগৎ ও ব্রহ্ম দুটি প বস্তু। জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য এবং উভয়ের ভেদ রয়েছে। মধ্বাচার্যের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে মতবাদকে বলা হয়—দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ। জাগতিক পদার্থগুলিকে অনেকটা ন্যায় বৈশেষিকের মতানুসারে বিভাগ করেছেন। দ্রব্য, গুণ, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য এবং অভাব এগুলি ছিল ম মূল পদার্থ। জগৎকে তিনি পরিবর্তনশীল বলে মানতেন। অবিদ্যা ও অজ্ঞ দ্বারা একই ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চরূপে ভ্রান্তভাবে প্রতিভাত হচ্ছে একথা মধ্ব মা না। তাঁর মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তিলাভের এক উপায়।

মধ্বাচার্য

রুদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তদার্শনিক বল্লভাচার্যের আবির্ভাব ঘটে ১৫শ শতকের শেষভাগে (১৪৮১—১৫৩৩)। তিনি ছিলেন একজন তেলেগু ব্রাহ্মণ। তিনি প্রায় ৮৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বল্লভাচার্য অদ্বৈতবাদী হলেও শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য আছে। শঙ্করাচার্যের মতে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—মায়াকল্পিত; মায়ার প্রভাব কেটে গেলেই জীব ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বল্লভাচার্যের মতে—ব্রহ্ম সত্য, জীবজগৎও সত্য। জীবজগৎ মায়াকল্পিত নহে, পরন্তু উহা ব্রহ্মময়। একারণে বল্লভাচার্যের মতকে বলা হয় শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। তিনি বলেন—সর্প যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সর্প, বিস্তৃত হয়ে থাকলেও সর্প, তেমনি এই জগদাকারে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। তিনি সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। তিনি এক, তিনি বহু। তিনি নির্গুণ নন, সর্বগুণের আধার! তিনি একদিকে অপরিবর্তনীয়, অন্যদিকে পরিবর্তনশীল। তিনি কর্মফলের বিধাতা, তাই কর্মের নিয়মের দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর কৃপায় জীব কর্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে। বল্লভের গ্রন্থাদিতে এজন্য ভক্তিবাদের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে।

বল্লভাচার্য

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম ॥

প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম আলোচনা করার পূর্বে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের কোন প্রাচীন নজির ছিল কিনা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস, লিপিলেখন ও প্রত্নতত্ত্বের কিছু কিছু নিদর্শন বৈষ্ণবধর্মের অস্তিত্বকে প্রমাণিত করে। ৪র্থ শতকে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) সেবক পুষ্কর্ণার অধিপতি চন্দ্রবর্মার উল্লেখ বাংলাদেশে বিষ্ণুর আদিমতম নিদর্শন। এরপর ৫ম শতকের বগুড়া জেলায় গোবিন্দস্বামীর মন্দির, ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমে ত্রিপুরায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির এবং ৭ম শতকে বাংলার পূর্ব সীমান্তে ভগবান অনন্তনারায়ণের উপাসনার উল্লেখ ইত্যাদি বিষ্ণুপূজার স্মারকচিহ্ন নির্দেশিত করে। পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে বৈষ্ণবধর্মের অনেক মূল্যবান তথ্যের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার অনেক মূর্তি এখানে পাওয়া গিয়েছে। ইহাদের একটিতে কৃষ্ণ ও একটি রমণীর মূর্তি রয়েছে। কেহ

কেহ, এই রমণী মূর্তিটিকে সত্যভামা বা রুক্মিণীর বলে মনে করেন। তবে ইহা রাধারও হতে পারে। কারণ বহুপূর্বে 'গাথাসপ্তশতী'তে রাধাকৃষ্ণের মিলন-জনিত আদিরসের শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে।

পূর্বোক্ত সমুদয় প্রাচীন নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক থেকে কি তারও কিছু পূর্ব থেকে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এইবার যে কয়খানি গ্রন্থ ও যে কয়জন মহাজনের দ্বারা প্রাক্-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণবধর্মমত প্রচার-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে উদ্ধৃত করা হল।

বাংলার বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ হলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর পূর্বে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের আদিগঙ্গার যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত ছিল তা মূলত কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থে প্রকাশিত ভাবাদর্শ ও মতবাদকে অশ্রয় করে গড়ে ওঠে। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর মহাপ্রভু সপার্ষদ রাত্রিদিনে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' কাব্য, লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' আস্বাদান করতেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী অনুসরণ করে জয়দেবের পূর্বে কেহই কাব্য রচনা করেননি। কবি জয়দেবই সর্বপ্রথম কৃষ্ণ-কথাকে বিস্তারিত করে লিখে গেছেন 'গীতগোবিন্দে।' বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে তাই তিনি মহাজন, গুরুস্থানীয়। জয়দেবের পর বিদ্যাপতি ঠাকুর ও বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিবৃত করেছেন তাঁদের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর মধ্যে। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা দিব্যোন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণভক্তিসঞ্চারে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে চৈতন্য মহাপ্রভু 'ব্রহ্মসংহিতা' ও বিল্বমঙ্গলের (লীলাশুক) 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' সঙ্গে করে আনেন। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', গ্রন্থখানি তাঁর অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। সেকারণে তিনি শেষ জীবনে রাত্রিদিনে সপারিষদ এই গ্রন্থখানি আস্বাদন করতেন।

প্রখ্যাত বৈয়াকরণ বোপদেব (১৩শ শতক) প্রণীত 'মুক্তাফল' নামক ভাগবতের শ্লোকসঙ্কলন ও তার সংস্কৃত টীকা, মিথিলার বিষ্ণুপুরীর ভাগবতের শ্লোকসংগ্রহ ও টীকা, লক্ষ্মীধর স্বামীর 'শ্রীভগবন্নামকৌমুদী, গ্রন্থ প্রাক্-চৈতন্যযুগে ভক্তসমাজের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করে এবং এই সকল গ্রন্থ হতে পরবর্তিকালের বৈষ্ণব সাহিত্যে অল্পবিস্তর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

চৈতন্যমহাপ্রভুর গুরুস্থানীয় ঈশ্বরপুরীর 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' ও শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ইহাদের পরোক্ষপ্রভাব শ্রীচৈতন্যের সাধনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। ঈশ্বরপুরী গয়াধামে বিদ্যামদোদ্ধত চৈতন্যকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দেন। ফলে, চৈতন্যের জীবনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং ধীরে ধীরে তিনি দিব্যোন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসজীবনে উত্তীর্ণ হন। ঈশ্বরপুরী 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করেন এবং তিনি অবাঙালী হয়েও বাংলার বৈষ্ণবভক্তসমাজে কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করেন। ঈশ্বরপুরীর উক্ত গ্রন্থের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি।

শ্রীধর স্বামীর ভাগবতের টীকা 'ভাবার্থদীপিকা' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই গ্রন্থটির খুবই মান্য করতেন। জীব গোস্বামীও তাঁর 'ভগবত-সন্দর্ভ', 'পরমাত্মসন্দর্ভ' ও 'ভক্তিসন্দর্ভে'র মধ্যে শ্রীধরের টীকার উল্লেখ করেছেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা বৈষ্ণব সমাজে অদ্বৈত প্রভু ও মাধবেন্দ্রপুরী বিশেষ সমাদর লাভ করেছিলেন। অদ্বৈতপ্রভু প্রথম জীবনে অদ্বৈতপন্থী মায়াবাদী বৈষ্ণব ছিলেন। পরে চৈতন্যদেবের প্রভাবে তিনি ভক্তিবাদী হন। বৈষ্ণবকুলে তিনি আচার্যসদৃশ ছিলেন। ভক্তসমক্ষে তিনি গীতা-ভাগবত পাঠ করতেন। কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা ও নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটত। যত বৈষ্ণবগণ সব অদ্বৈতগৃহে আনাগোনা করত।

চৈতন্যের মন্ত্র-দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর গুরু, বাংলাদেশে ভক্তিধর্মের উদ্গাতা ও ভাগবতের প্রচারক, নিষ্ঠাবান ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আদি প্রবক্তা বলা হয়েছে। চৈতন্যভক্ত সনাতন গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণব তোষণীতে মাধবেন্দ্র পুরীকে কৃষ্ণভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ বলেছেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে পুরীকে ভক্তিরসের আদি সূত্রধার এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে তাঁকে ভক্তিকল্পতরুর অঙ্কুর বলেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভাবোন্মত্ত হয়ে পুরীধামে মাধবেন্দ্রপুরীর পদ্যাবলী হতে 'অয়িদীনদয়ার্দ্রনাথ' কবিতাটি আবৃত্তি করতেন। এই সমুদয় তথ্যাদি নিরীক্ষণ করে মনে হয় মাধবেন্দ্রপুরী ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন

এবং প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেছিলেন।

বৈষ্ণবধর্ম ভক্তি আশ্রয়ী। প্রাক্-চৈতন্যযুগে এই ভক্তিধর্মের যথার্থ উন্মেষ ঘটল এবং ধীরে ধীরে ইহা সকলের অলক্ষ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করল।

প্রাক-চৈতন্যযুগের পদাবলী সাহিত্য

পদাবলী সাহিত্যের আদিকবি জয়দেব ॥

বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের (১২শ শতক) সভাতলের সারস্বত পঞ্চরত্নের (উমাপতিধর-শরণ-ধোয়ী-গোবর্ধন আচার্য-জয়দেব) অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন কবি জয়দেব। সংস্কৃত সাহিত্যের চরম অবক্ষয়ের যুগে আবির্ভূত হয়েও তিনি ভূভারতে অসাধারণ কবিখ্যাতি অর্জন করেন। মধুরকোমলকান্ত পদাবলী-কীর্তন ও অধ্যাত্মরসসিক্ত কৃষ্ণকথাবর্ণন জয়দেবের কবিপ্রসিদ্ধির মূলীভূত কারণ। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের পর যদি আর কোন গ্রন্থ ভারত-বাসীর হৃদয়মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে তবে তা জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ'। গোবিন্দের প্রেমবিলাসকলা দেহকামনাজর্জর ভোগপঙ্কিলময় ভাষায় বিবৃত হলেও সেযুগে ইহা ভক্তিশাখার উপনিষদরূপে সমাদৃত হয়েছিল। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, গীতগোবিন্দরচনার আটশত বৎসর পূর্ব হতে ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা চলতে থাকে অথচ সেযুগের কোন গ্রন্থই সংস্কৃতসাহিত্যের বৃহৎ কথাসরিৎ-সাগরে আদৌ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি! বাঙালী কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কেবল ইহার ব্যতিক্রম। 'গীতগোবিন্দ' রচনার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের কাঞ্চনকোকনদ যেন মধুরসনির্যাসে পূর্ণ হয়ে উঠল —আঁধারময় জগতের বুকে যেন উজ্জ্বলমণি ঝলমলিয়ে উঠল। অচিরকালে মধ্যে তাই ইহা ভারতবাসীর প্রাণমন হরণ করে নেয়। ১৬শ শতকের হিন্দী কবি নাভাজী দাস তাঁর 'ভক্তমাল' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, 'জয়দেব কবি নৃপচক্কৈব', কবি জয়দেব হলেন রাজচক্রবর্তী এবং 'প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর', গীতগোবিন্দ তিনলোকে প্রচুরভাবে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হল কৃষ্ণকথা। কবি জয়দেব সর্বপ্রথম এই কৃষ্ণকথা বিস্তৃত করে বর্ণনা করেন 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে। চৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং এই গ্রন্থখানি সপার্ষদ রাত্রিদিনে আস্বাদন করতেন এবং জয়দেব-

পরবর্তী সকল বৈষ্ণব কবিই জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদরচনা করেন। বৈষ্ণব ভক্তেরাও জয়দেবকে গোস্বামীর পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। এসকল কারণে জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হলেও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আদি কবিরূপে পরিগৃহীত হয়েছেন।

জয়দেবের জীবনকথা

কবি জয়দেবের জীবন সম্পর্কে কোন নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে জয়দেব বিপুল জনখ্যাতি অর্জন করার জন্য তাঁর জীবন সম্পর্কে বহু লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। সংস্কৃত কবি চন্দ্রদত্তের ভক্তমাল, হিন্দী কবি নাভাজীর ভক্তমাল ও বীরভূমের বনমালী দাসের জয়দেব চরিত্রে এধরনের বহু গল্প-কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে।

জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নসভার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে কবির জন্ম। বর্তমানে কিন্তু এই গ্রামের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে প্রতিবছর পৌষসংক্রান্তিতে অজয়-নদের বালুভূমিতে 'কেঁদুলির মেলা' নামে একটি মেলা বসে। বীরভূম ছাড়া বগুড়া জেলায় কেন্দুল নামে একটি গ্রামও রয়েছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে জানা যায় জয়দেব নাকি এই গ্রামে কিছুদিন বাস করেছিলেন। এখানে জয়দেবের নামে একটি মেলা বসত এবং আজও স্থানীয় লোকেরা কেন্দুল গ্রামের কোন একটি স্থানকে জয়দেবের ভিটা বলে মনে করে থাকে।

বিপুল জনখ্যাতি লাভ করার জন্য জয়দেবের উপর অবাঙালীদেরও দাবি উপস্থিত হয়েছে। মিথিলাবাসী ও উড়িষ্যাবাসীরাও জয়দেবকে তাঁদের নিজ নিজ দেশের কবি বলে গণ্য করেছেন। তীরহুত জেলার জেঞ্জারপুর শহরের কাছে কেন্দোলি নামে একটি গ্রাম আছে। মিথিলাবাসীরা ঐ গ্রামকে জয়দেবের জন্মভূমি বলে মনে করেন। উড়িষ্যাবাসীরাও, পুরীর নিকটবর্তী বিন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব জন্মগ্রহণ করেন একথা বলতে চান। তাছাড়া তাঁদের ধারণা যেহেতু উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে অশ্লীল যৌনসংক্রান্ত চিত্র দেখা যায়, সেইহেতু আদিরসের কবি জয়দেব ওড়িয়া ছিলেন। তবে, শেষপর্যন্ত নানাবিধ প্রামাণিক তথ্যনিদর্শনাদি লক্ষ্য করে ইহাই স্থিরীকৃত হয়েছে যে জয়দেব বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

'গীতগোবিন্দে'র শেষের একটি শ্লোক থেকে জানা যায়, জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী (মতান্তরে রাধাদেবী

বা রামাদেবী)। পদ্মাবতী ছিলেন কবির পত্নী। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গের মধ্যে কবি নিজেকে 'পদ্মাবতী চরণচারণ-চক্রবর্তী' এবং দশম সর্গে নিজেকে 'পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবিভারতী' বলেছেন। পদ্মাবতী নর্তকী ছিলেন ও জয়দেব ছিলেন তাঁর সঙ্গতকারী। শুনা যায়, পদ্মাবতী পুরী-ধামে জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য করতেন। জয়দেব তাঁর নৃত্যের তালরক্ষা করতেন বলে কাব্যমধ্যে সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী' বলে। কারো কারো মতে আবার, পদ্মাবতী জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী ছিলেন। প্রাচীন বাংলায়ও জয়দেবদম্পতীর নৃত্যগীত-নৈপুণ্যের প্রসিদ্ধির কথা জানা যায়। ১৬শ শতকে কোচবিহারে সভাকবি অনিরুদ্ধ রামসরস্বতীর 'জয়দেব' কাব্যে গীতকার জয়দেবের ও গীতের নৃত্যরূপদায়িকা পদ্মাবতীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫শ শতকে রচিত 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে জয়দেব-পদ্মাবতীর বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে এই দম্পতী নৃত্যগীতের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

জয়দেবের কবিকৃতি

জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' ছাড়া রাজস্তুতি, যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ক কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করেছিলেন। প্রখ্যাত সঙ্কলন গ্রন্থ 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' এধরনের ২৬টি পদ সংগৃহীত হয়েছে। ইহাদের ভাব-প্রকাশরীতি প্রশংসনীয় হলেও, এগুলিকে 'গীতগোবিন্দে'র কোমলকান্ত পদাবলীর পাশে স্থান দেওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয়-কাহিনী অনুসরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করেন এবং তা থেকে বীররসাত্মক কিছু কিছু পদ 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই অনুমানের মূলে কোন যুক্তি নেই। জয়দেবের সমকালে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণাবেগ অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে এবং তারও কিছু পূর্ব থেকে প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে বিচ্ছিন্ন কবিতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কাজেই জয়দেব হয়ত যুগপ্রয়োজনের তাগিদে পড়ে বিচ্ছিন্ন পদগুলি সৃষ্টি করে থাকবেন।

১৬ শতকে শিখগুরু অর্জুন তাঁর 'গ্রন্থসাহেবে' বাঙালী কবি জয়দেবের দুটি পদ গ্রহণ করেছেন। এই পদগুলির মধ্যে কিছু কিছু বিকৃত সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষাভঙ্গিমার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এজন্য পদদুটি জয়দেবের রচনা কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মনে হয়, জয়দেবের

অপরিসীম কবিখ্যাতির জন্য অনেক কবি তাঁদের রচিত পদাবলীকে জয়দেবের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

গীতগোবিন্দ—বিষয়বস্তু ও তথ্যনির্দেশ

দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রধান উপজীব্য হল চন্দন-চর্চিত নীলকলেবর পীতবসনবনমালী কৃষ্ণের বিলাসকলাবর্ণন। কোমল মলয়পবন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হলে, অলি-গুঞ্জনমিশ্রিত কোকিলকূজনে কুঞ্জকুটীর মুখরিত হলে, বিরহিগণের পক্ষে দুঃখদায়ক সেই সরসবসন্তে কৃষ্ণ বিলাসমত্তা মুগ্ধা ব্রজবধূগণকে নিয়ে বৃন্দাবনে কেলিবিলাসে রত হলেন। বৃন্দাবনবিপিনে কেশবের এই অদ্ভুত কেলিরহস্যের জন্য রাধা ঈর্ষাভরে মানিনী হলেন। কৃষ্ণ তখন রাধাবিরহে কাতর হয়ে পড়লেন। রাধার কাছে পূর্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন—'দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি', সুন্দরি আমায় দর্শন দাও, আমি মদনতাপে কাতর হয়ে পড়েছি। সখীরা তারপর কৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য রাধাকে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন—"সখি! তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, মনোহর বাসভবন ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন, ধীরসমীর-সেচিত যমুনাতীরবর্তী বনে অবস্থান করছেন, তুমি আসছ মনে করে তিনি শয্যারচনা করছেন। সখি! নীল নিচোল পরিধান করে সেই তিমিরাবৃত কুঞ্জে গমন কর। মেঘের কোলে বলাকাপংক্তিসদৃশ মুক্তাহারশোভিত মুরারিবক্ষে রতিকালে তুমি মেঘবক্ষে তড়িতের ন্যায় শোভা পাবে।" কৃষ্ণও আসঙ্গলিপ্সায় কাতর হয়ে রাধাকে বহুত মিনতি করলেন—"চারুশীলে! তুমি যদি একটি কথাও বল, তাহলেই তোমার দশনপংক্তির জ্যোৎস্নাচ্ছটায় আমার অন্তরের ভীতিরূপ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তোমার বদন-চন্দ্রে উচ্ছলিত অধরসুধা পানের জন্য আমার নয়নচকোর অত্যন্ত পিপাসিত হয়েছে। প্রসন্নবদনে! তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসারসাগরের রত্নস্বরূপ।" ইহার পর সখীরাও অনুরোধ জানালেন, —"বিবিধ চাটুবচনে ও পাদবন্দনে আনুগত্যপ্রদর্শনপূর্বক মধুসূদন সম্প্রতি মনোহর বেতস-লতাকুঞ্জে শয্যা রচনা করেছেন। অতএব হে মুগ্ধে রাধিকে! রতিবলিত ললিতসঙ্গীতে মেতে মলয়ান্দোলিত সুরভি-শীতলকুঞ্জে মাধবের নিকট গমন কর।" পরিশেষে রাধা বাম্যভাব ত্যাগ করলেন এবং রতি-কেলি-কলার চিন্তায় অধীর, মণিময় ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল সুন্দর সুপ্রীত সেই পীতাম্বরের

সহিত মিলিত হলেন। এভাবে গীতগোবিন্দের কাহিনী সখী, রাধা ও কৃষ্ণের নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি ও চব্বিশটি গানের মধ্য দিয়ে দ্বাদশ সর্গে বিবৃত হয়ে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের তথ্যসার হল রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা। জয়দেবের পূর্বে রাধাকে নায়িকা করে কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচিত না হলেও রাধা নামটির উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে পাওয়া যায় এবং খুব সম্ভব রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক নানা লৌকিক গল্পগাথা ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের মধ্যে রাধা নামক এক গোপরমণীর উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রাধা শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রবিশেষ। মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, দেবীভাগবতেও রাধার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের ভক্তদার্শনিক নিম্বার্ক (১২শ-১৩শ শতক) রাধাকৃষ্ণের উপাসনার সূত্রপাত করেন। প্রাকৃত-অপভ্রংশের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু কিছু শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। হালের 'গাথাসপ্তশতী'তেই রাধাকৃষ্ণলীলার বর্ণনা 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলাকথা উল্লিখিত হয়েছে। আনন্দবর্ধন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ অলংকার শাস্ত্র 'ধ্বন্যালোকে'র মধ্যেও রাধার কথা বলেছেন। প্রাকৃত-অপভ্রংশ এবং সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক যে লীলাকাহিনী বিবৃত হয়েছে, অনুমান হয়, জয়দেব এগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'গীতগোবিন্দ' রচনা করে থাকবেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট উপনিষদগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সামান্য প্রভাব হয়ত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে পড়ে থাকবে। ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই, তবে একজন প্রধানা গোপী রয়েছে। ভাগবতকার রাসলীলার অনুষ্ঠান করেছেন শারদোৎফুল্ল যামিনীতে, আর জয়দেব গোস্বামী সরসবসন্তে রাস-লীলা বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক আর একখানি গ্রন্থ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 'গীতগোবিন্দে'র বেশ কিছু পূর্বে রচিত হয়েছিল। জয়দেবের কাব্য রচনার প্রেরণার মূলে ইহারও কিছু প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। কেহ কেহ গীতগোবিন্দে দক্ষিণভারতের ভক্তকবি বিল্বমঙ্গলের (লীলাশুক) 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র প্রভাবও কল্পনা করে থাকেন।

গীতগোবিন্দ জয়দেবের একখানি বিচিত্র সৃষ্টি। ইহা সঙ্গীতমুখরিত নাট্যরসসিক্ত আখ্যানমূলক রচনা। এজন্য কেহ কেহ গীতগোবিন্দকে গীতিনাট্য (Lyrical Drama) বলেছেন; আবার কেহ বা ইহাকে উন্নতধরনের

যাত্রা বলে গ্রহণ করতে চাহেন। গীতগোবিন্দে যাত্রা-নাটক-গীতের বৈশিষ্ট্য-গুলি অল্পবিস্তর প্রাধান্যলাভ করার জন্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কাব্য-নাট্য-গীতের কোন একটা বিশেষ প্রকৃতি বা ঢঙ্ যে গীতগোবিন্দের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি, তার কারণ জয়দেবের সমকালে সংস্কৃত সাহিত্যের শিল্পরীতি শিথিল হয়ে পড়েছিল, অপরদিকে আবার অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। কাজেই গীতগোবিন্দের শিল্পরীতি প্রাচীন নাটগীতির প্রভাবে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় তবে সেজন্য জয়দেবকে দোষী করা যায় না।

গীতগোবিন্দের স্বরূপ

গীতগোবিন্দে আখ্যান, নাটকীয়তা ও সঙ্গীত—এই তিনেরই বৈশিষ্ট্য প্রাধান্যলাভ করলেও কাব্যবিচারের মানদণ্ডে তৌল করে দেখলে দেখা যাবে যে ইহাতে কাহিনী বা আখ্যানভাগের গুরুত্ব কিছু বেশী। কাজেই বলতে হয়, গীতগোবিন্দ আখ্যানমূলক রচনা। কৃষ্ণের বিলাসকলা কবি রাধাকৃষ্ণ ও সখীদের সংলাপ এবং গীতের সাহায্যে বিবৃত করেছেন। মাঝে মাঝে কবি কাব্যমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর সংযোগ রক্ষাও করেছেন।

গীতগোবিন্দের মধ্যে আধুনিক গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশলাভ করেছে। গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যসৃষ্টি কেলিরহস্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মেঘলোকে ক্রিড়ারত বিদ্যুতের মত ঝিক্‌মিকিয়ে উঠেছে। যেমন, মধুকরগুঞ্জিত ফুল্লকুসুমিত সরসবসন্তের বর্ণনা—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥
উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসংকুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে॥

অনু: "সখি, কোমল মলয় পবন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হইয়াছে। অলিগুঞ্জনমিশ্রিত কোকিলকূজনে কুঞ্জকুটীর মুখরিত হইতেছে। বিরহিগণের পক্ষে দুঃখদায়ক এই সরস বসন্তে শ্রীহরি ব্রজবধূগণের সঙ্গে বিহার ও নৃত্য করিতেছেন।

এই বসন্ত (একদিকে যেমন) মদনসন্তাপিতা পথিকবধূগণের (পতি যাহাদের

বিদেশে) বিলাপে মুখরিত, (অন্যদিকে তেমনি) অলিকুলপরিব্যাপ্ত কুসুমসমূহে নিরাকুল বকুলকলাপে সুশোভিত।" (হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন কৃত অনুবাদ)।

গীতগোবিন্দ কাব্যের রসবিচারের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ মতবাদ প্রকাশ পেয়েছে। কেহ কেহ বলেন, গীতগোবিন্দ দেহকামনাজর্জর ভোগপঙ্কিল আদিরসের কাব্য। আবার কেহ ইহাকে ভক্তিরসের আকর বলে গ্রহণ করতে চান। এখন ইহাদের মধ্যে কোনটি বিবেচ্য তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। জয়দেবের কাব্যকে যাঁরা আদিরসাত্মক বলে গ্রহণ করতে চান তাঁদের অভিমতকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। কেবল জয়দেবের রচনাতে নহে, সেযুগে প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যেও উত্তপ্ত দেহকামনামুখর কবিতা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তার প্রমাণ, 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। তারপর জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন, তাঁর সভাতলে যে আদিরসের উল্লাসমাদকতা প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ রয়েছে গোবর্ধন আচার্য ও ধোয়ীর রচনার মধ্যে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের আদিরসের উজ্জ্বল নিদর্শন বর্ণনা রয়েছে। রাজার নর্মবিলাসের সহচর হিসেবে তিনিও রাজার ও রাজসভাসদদের মনোরঞ্জনের জন্য সরসবসন্তে রাধাকৃষ্ণের কেলিরহস্য কৌশলে বর্ণনা করেছেন :

গীতগোবিন্দের রসবিচার

কথিতসময়েপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্॥
যামি হে কমিহ শরনম্ সখীজনবচন বঞ্চিতা॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী॥

*　　*　　*

স্মরসমরেচিত বিরচিতবেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা॥

কাপি মধুরিপুণা।
বিলসতি যুবতিরধিকগুণা॥
হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।
কুচকলসোপরি তরলিতহারা॥
বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।
তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা॥
চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা।
মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা॥
দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা॥

"কথিত সময় রহিয়া গেল, হরি ত আসিলেন না, আমার এই অমল রূপযৌবন বিফল হইল। সখীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে; হায়! আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিব? যাঁহার জন্য রাত্রে আমি এই গহন বনে আসিলাম তিনিই আমার হৃদয় মদনশরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এখন আমার মরণই মঙ্গল, কৃষ্ণবিরহানলে চেতনাশূন্য হইতেছি। এই বিফল দেহ ধারণ করিয়া কি ফল? এই মধুর বসন্তরজনী আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু না জানি কোন পুণ্যবতী (এই মধু যামিনীতে) শ্রীহরির মিলনসুখ অনুভব করিতেছে। * * রতি-রণোচিত বেশে সজ্জিতা আমা হইতে অধিক গুণশালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাসে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিথিল হইয়াছে, তাহা হইতে ফুলদল খসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীহরির আলিঙ্গনে পুলক-চাঞ্চল্যে তাহার কুচকলসের উপর হার লীলায়িত হইতেছে। তাহার ললিত মুখচন্দ্রে অলকদাম বিচলিত হইয়াছে এবং শ্রীহরির চুম্বন-রভসে তন্দ্রাতুর নয়ন দুটি মুদিয়া আসিতেছে। তাহার ললিত কপোলে কুণ্ডল দুলিতেছে এবং জঘন-চাঞ্চল্যে মেখলা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয় দয়িতকে দেখিয়া সে কখনও লজ্জিতা হইতেছে, কখনও হাসিতেছে, কখনও বা রতিরসে মাতিয়া বহুবিধ অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে।"

(হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন কৃত অনুবাদ।)

তথাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দকে আদিরসাত্মক রচনা বললে ভুল হবে। কাব্যরচনার প্রারম্ভেই কবি পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীম্ শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

ভক্ত-রসিক পাঠককে উদ্দেশ্য করে কবি ভণিতাতেও বার বার বলেছেন—হরিচরণেশরণাগত জয়দেব কবির গান যেন কোমলকলাবতী যুবতীর ন্যায় ভক্ত জনহৃদয়ে বিরাজ করে; জয়দেব-ভণিত শ্রীহরির বিহারলীলা যেন কামাদিকলি-কলুষের বিনাশসাধন করে; মধুরিপুর পদসেবক হরিগুণাত্মক রসগীতিরচয়িতা জয়দেবকে যেন কলিযুগোচিত পাপ স্পর্শ না করে; জয়দেব-ভণিত শ্রীরাধার বিলাপ-বচনের সঙ্গে শ্রীহরি যেন সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করে ইত্যাদি। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, কবির আসল উদ্দেশ্য ছিল হরিগুণ কীর্তন; জনমনমানসে কৌতূহল উদ্রেক করার জন্য তিনি শ্রীহরির বিলাসকলা বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত ভক্ত যিনি, অধ্যাত্মরসের রসিক যিনি, তিনি সহজেই রাজহংসের মত ইহার মধ্যকার ভক্তিরসটুকু পান করে নেবেন; আর ইতরজন বাইরে থেকে দেখে ইহাকে কেবল আদিরসের আস্পদ বলে উল্লাস বোধ করবে।

গীতগোবিন্দের মধ্যে ভক্তিরস নিহিত ছিল বলেই ভারতব্যাপী ইহার একটা খ্যাতি ছিল। কমপক্ষে ইহার চল্লিশখানি টীকা এবং ইহার অনুকরণে পনেরখানি কাব্য রচিত হয়েছিল। রাণা কুম্ভ ১৪শ-১৫শ শতকে গীতগোবিন্দের ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্যা করেন। ১৬শ শতকে শিখগুরু অর্জুন তাঁর সঙ্কলন গ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেবে' জয়দেবের নামাঙ্কিত দুটি পদ উদ্ধৃত করেন। চৈতন্যদেব সপার্ষদ রাত্রিদিনে গ্রন্থখানি আস্বাদন করতেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র (১৫শ শতক) জগন্নাথদেবের মন্দিরে 'গীতগোবিন্দ' ছাড়া অন্য গান নিষিদ্ধ করে দিয়ছিলেন। গ্রন্থখানি যদি কেবল আদিরসে পূর্ণ হত তাহলে ইহা এত সমাদর লাভ করত না।

জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে আবির্ভূত হয়েও বিষয় নির্বাচনে ও কবিত্বশক্তির গুণে অসামান্য কবিযশ অর্জন করেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা কৌশলে বর্ণনা করে এবং রাধাচরিত্রে পরকীয় রসতত্ত্ব আরোপ করে পরবর্তী পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবসহজিয়াদের কাছে আদিগুরু ও নবরসিকের শ্রেষ্ঠ রসিক রূপে পরিগৃহীত হয়েছেন। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি 'অভিনব জয়দেব' উপাধি ধারণ করে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর কাব্য সপার্ষদ আস্বাদন করতেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে মধুসূদন জয়দেবের সঙ্গে গোকুল মানসপরিক্রমা করেছেন; রবীন্দ্রনাথও মেঘমেদুর বর্ষার দিনে জয়দেবের কথা স্মরণ করেছেন। কাজেই জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হয়েও বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে জয়দেব

তাছাড়া জয়দেবের মধুরকোমলকান্ত পদাবলীর ভাষা অনেকটা বাংলারই মত। স্থানে স্থানে বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর পদধ্বনি শোনা যায়।
যেমন :

পয়ার— হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্॥

ত্রিপদী—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নম্ সচকিতনয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং
রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং
শীলয় নীলনিচোলম্॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন॥

বাংলা ভাষায় রচিত পদাবলী সাহিত্যের আদি কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। পুঁথিটি বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় ১৩১৬ সালে বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘর থেকে সংগ্রহ করেন। দেবেন্দ্রনাথ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত। পুঁথিমধ্যে গ্রন্থরচনার কাল, গ্রন্থের নাম ও কবিপরিচিতি কিছুই পাওয়া যায়নি। পুঁথিটি তুলোট কাগজে লেখা আগাগোড়া খণ্ডিত এবং ইহার প্রথম ও শেষের কয়েকটি পাতা নেই। বসন্তরঞ্জন বাবু কিংবদন্তী ও পূর্বঐতিহ্য অনুসরণ করে ইহার নাম দেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের (১৩২৩ সালে) সঙ্গে সঙ্গে মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতের মত পণ্ডিতমহলে ভয়ঙ্কর বাগবিতণ্ডা উপস্থিত হয়। মধুযুগ থেকে আরম্ভ করে উনিশ

শতক পর্যন্ত কেবল এক চণ্ডীদাসের নাম শুনা গিয়েছিল। তিনি শিশিরসিক্ত কুসুমকলির মত মধুর পদ রচনা করে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলের প্রাণমন হরণ করে নিয়েছিলেন। চণ্ডীদাস-রামীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে অনেক গল্প-কাহিনীও গড়ে উঠেছিল।

চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব

চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি রজকিনী রামীর প্রেমরসে মাতোয়ারা হয়ে রাধাকৃষ্ণলীলার দিব্য আনন্দ লাভ করেন। তারপর সেই আনন্দধারা থেকে তিল তিল করে প্রণয়-মধু আহরণ করে চণ্ডীদাস প্রেমময়ী রাধিকার রসমূর্তি রচনা করেন। বহিরঙ্গ জীবনসাধনায় চণ্ডীদাস বাসুলীর সেবক ছিলেন। নান্নুরে চণ্ডীদাস-রামী পূজিত বিশালাক্ষীর মূর্তি দেখা যায়। তবে এই বিশালাক্ষী ও বাসুলী এক দেবতা নহে। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বলেও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সেখানে একটি বাসুলীর মূর্তি ও মন্দির আছে। এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠল—(১) মধুর পদাবলীর চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস একই, না পৃথক ব্যক্তি? (২) একাধিক চণ্ডীদাস হলে আদি চণ্ডীদাস কে? (৩) চৈতন্যদেব কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন? (৪) চণ্ডীদাস কয়জন?

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস উভয়ে একই ব্যক্তি। তিনি বলেন, চণ্ডীদাস প্রথম যৌবনে অসংযত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সে-সময়কার রচনা। পরিণত বয়সে তিনি পদাবলী প্রেমসঙ্গীত রচনা করেন। কিন্তু সেন মহাশয়ের এ ধারণা সত্য নয়।

সমস্যার সমাধান

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রাচীন; ভাব অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ। চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলীর সঙ্গে ইহার সব অংশের তুলনাই চলে না। উভয়ে এক হলে ভণিতা সর্বত্র একই প্রকারের হত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীতে দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস দেখা যায়। তা ছাড়া শ্রীকীর্তনে সর্বত্র 'গাএ' বা 'গাইল' ব্যবহৃত হয়েছে, কোথাও পদাবলীর মত 'ভণে' বা 'কহে' ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়নি। তাছাড়া বড়ু চণ্ডীদাস পদাবলীর চণ্ডীদাসের মত কোথাও রাধার কোন সখী বা শাশুড়ী-ননদীর উল্লেখ করেননি। তিনি কোথাও শ্রীরাধার বিশেষণ রূপে 'বিনোদিনী' এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ রূপে 'শ্যাম' ব্যবহার করেননি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা-

গোয়ালিনী মাত্র, তিনি রাজকন্যা নহেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চন্দ্রাবলী রাধার এক নাম, প্রতিনায়িকা নহেন। কাজেই বড়ু চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস যে এক ব্যক্তি নন, পৃথক সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব, বড়ু চণ্ডীদাসই ছাতনার বাসুলী সেবক ছিলেন।

লিপি, ভাষা ও তথ্য বিচার করে দেখলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে চৈনন্যপূর্ব প্রাচীন কাব্য বলেই মনে হবে। ডাঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিখানি ১৩৫৮ খ্রীঃ-এর পূর্বে, সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছিল। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে, পুঁথিটির লিপিকাল ১৪৫০ হতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করে স্থির করেছেন, ইহা বাংলা ভাষার আদি-মধ্যযুগের (১২০০—১৫০০ খ্রীঃ) নিদর্শন। তথ্যের দিক থেকে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলী, তিনি লক্ষ্মীর অবতার ও তাঁর একমাত্র সহচরী বড়ায়ি। রাধা সম্পর্কে এ ধারণা চৈতন্য পরবর্তিকালে আদৌ সম্ভব নয়। চৈতন্য পরবর্তিকালে চন্দ্রাবলী রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী; রাধা-কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, লক্ষ্মী তাঁর অংশাবতার এবং বিশাখা ললিতা প্রভৃতি তাঁর গোপসখী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন অজ্ঞাতযৌবনমুগ্ধাবস্থা থেকে প্রগল্ভ অবস্থার পরিণাম পর্যন্ত রাধার চারিত্রিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় চৈতন্যপরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে তেমন লক্ষিত হয় না; রাধা সেখানে পূর্ব থেকেই কৃষ্ণগতপ্রাণা—কৃষ্ণ প্রেমিক-সর্বস্বা। তাছাড়া সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'তে কাব্য-শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ করেছেন। এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ দেখে মনে হয়, সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাস বলতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাসকে বুঝিয়েছেন। কারণ, দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরই দুটি অধ্যায়। অতএব বড়ু চণ্ডীদাস যে আদি কবি এবং তিনি যে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবি তা একরকম স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

এখন দেখা যাক, চৈতন্যদেব কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন। চৈতন্যজীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি থেকে বোঝা যায় দিব্যোন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের কাব্য রাত্রিদিনে সপার্ষদ আস্বাদন করতেন। গোঁড়া বৈষ্ণব এবং একদল সমালোচক মনে করেন, চৈতন্যমহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের কাব্য আস্বাদন করতেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি নহেন, তিনি মধুর পদাবলী রচয়িতা দ্বিজ চণ্ডীদাস। তাঁরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি অমার্জিত, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, ঘৃণ্য ভাবে পূর্ণ; ইহা মহাপ্রভুর আস্বাদনের যোগ্য নহে। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব পদ অশ্লীল নয়; ইহার মধ্যে এমন চল্লিশ-পঞ্চাশটি পদ আছে যেগুলি ভাববিন্যাস ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে চণ্ডীদাসের পদাবলীর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাছাড়া, সাধারণ মানুষের কাছে যা অশ্লীল-অমার্জিত শ্রীচৈতন্যের মত সন্ন্যাসীর কাছে তা পরম রমণীয় বলে মনে হতে পারে। ইহার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে। অদ্বৈত গৃহে মহাপ্রভু ভাবমুগ্ধচিত্তে নিম্নোক্ত গানটি গেয়েছিলেন :

হা-হা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রিদিনে পোড়ে প্রাণ সোয়াস্থ্য না পাঙ্।
যাঁহা গেলে কাহ্নু পাঙ্ তাঁহা উড়ি যাঙ্॥

গানটি যে আদিরসাত্মক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্ররুচিসম্পন্ন মানুষের কাছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অশ্লীল হলেও শ্রীচৈতন্যের কাছে হয়ত তা অশ্লীল মনে হত না। অধিকন্তু ইহার পদগুলির মধ্যে রাধিকার আত্মনিবেদনের সকরুণ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করার মত। ইহাই হয়ত চৈতন্যদেবকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তাতে এটুকু পরিস্ফুট হয়েছে, চৈতন্যদেবের পূর্বে যে একজন চণ্ডীদাস ছিলেন তিনি ছাতনার বাসুলী সেবক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপ্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস। পদাবলীর চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাস অপেক্ষা স্বতন্ত্র কবি; তিনি চৈতন্যদেবের পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন, পদাবলীর চণ্ডীদাস কয়জন?

অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিটি আগাগোড়া পালার আকারে লেখা, বিভিন্ন পালায় কবি বিভিন্ন রসের অবতারণা করেছেন। ইহাতে কবির যে ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, কোথাও শুধু 'চণ্ডীদাস' কোথাও 'দীনচণ্ডীদাস', কোথাও 'দীনক্ষীণ চণ্ডীদাস', আবার কোথাও বা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' রয়েছে। এই কাব্যের মধ্যে চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্ম ও রসশাস্ত্রগত পরিকল্পনার প্রভাব ও লক্ষণ সুস্পষ্ট। ভাষায় প্রচুর মুসলমানী শব্দের সঙ্গে পর্তুগীজজাত বাংলা শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়েছে। ইহাতে অনুমান হয়, দীন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কাল সপ্তদশ শতকের শেষভাগের আগে নয়। পুঁথিটিতে দীন-চণ্ডীদাসের যত পদ পাওয়া গিয়েছে, রসবিচারে সেগুলিকে দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণী, কি তারও চেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে মনে হয়। কাজেই সন্দেহ জাগে, এই দীন চণ্ডীদাস ও মধুর পদাবলীপ্রণেতা চণ্ডীদাস হয়ত একই ব্যক্তি নহেন।

বীরভূম জেলার বনপাশ গ্রামে প্রাপ্ত চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথিটি আসলে মনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক সম্পাদিত দীনচণ্ডীদাসের পদাবলীর বিস্তৃত-তর সংস্করণ। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছেন যে, চণ্ডীদাস বিভিন্ন পালায় বিভক্ত করে বিভিন্ন রসের অবতারণা করার জন্য সর্বত্র তিনি সমান দক্ষতা দেখাতে পারেননি। অতএব, যে কবি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় অপটু ও দ্বিধাকম্পিতহস্ত, তিনি আবার রাসলীলা মাথুর, বিরহ ও অক্ষেপানুরাগের পদরচনায় উন্নততর শিল্পবধের পরিচয় দিয়েছেন। পুঁথির সঙ্কেত থেকে তিনি আরো অনুমান করেছেন, চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ৬৫০টি পদ এখনও অনাবিষ্কৃত আছে; ঐগুলি আবিষ্কৃত হলে চণ্ডী-দাসের প্রথম শ্রেণীর পদগুলি হয়ত উহার মধ্যে পাওয়া যাবে। অধিকন্তু পুঁথির মধ্য থেকে এমন ৪০।৫০টি পদ খুজে বের করা যায় যেগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিত্বগুণ সম্পন্ন। কাজেই অনুমান হয় দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস উভয়ে এক ও অভিন্ন। কবি খুব সম্ভব, নান্নুরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস ছাড়া আর একজন সহজিয়া চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কেহ কেহ কল্পনা করেছেন। ইনি নিশ্চয়ই উত্তর চৈতন্যযুগের কবি হবেন; কারণ প্রাক্-চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব সহজিয়াদের পিরীতি সাধনার উৎপত্তি হয়নি। দীন চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলাগান রচনা করলেও তিনি বাশুলী বা রামীর কোন ইঙ্গিত দেননি। কাজেই তাঁর উপর সহজিয়া পদগুলিকে চাপান যায় না।

চণ্ডীদাস কয়জন ছিলেন সে সম্পর্কে দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু বলা না গেলেও বহুকবি তাঁদের ভালমন্দ সব পদ যে চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছেন তা সর্বজনস্বীকৃত। সহজিয়া চণ্ডীদাসের যে পদগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি আসলে চণ্ডীদাসের লেখা নয়, সেগুলি বৈষ্ণব সহজিয়া অন্যান্য কবিদের লেখা। সহজিয়ারা নিজনিজ উপসম্প্রদায়ের মতামত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বৈষ্ণব সমাজে শ্রদ্ধার্হ করার জন্য তাঁদের অপদার্থ পদগুলিকে চণ্ডীদাসের নামে (কখন রূপ গোস্বামী, স্বরূপ দামোদর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রখ্যাত কবির নামে) চালিয়ে দিয়েছেন। সহজিয়াদের পুঁথিপত্রের মধ্যে চণ্ডীদাস-রামী সংক্রান্ত গল্প-গুজব-গুলিও রয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে কোন প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত না হলে সহজিয়া চণ্ডীদাস নামে আর একজন স্বতন্ত্র চণ্ডীদাসের কল্পনা করা যায় না।

কেহ কেহ চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পূর্বরাগ-আক্ষেপানুরাগ-ভাবসম্মেলন বিষয়ক পদগুলি অবলম্বন করে আর একজন চণ্ডীদাসের কল্পনা করেছেন। তাঁদের ধারণা, এই চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব যুগের এবং চৈতন্যদেব ইঁহারই মধুর পদাবলী রাত্রিদিনে আস্বাদন করতেন। কিন্তু তাঁরা এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি। তাই এই চণ্ডীদাসের অস্তিত্বকে স্বীকার করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত চণ্ডীদাসের রচনার প্রামাণিক তথ্যাদি সংগৃহীত না হবে, ততদিন পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান কল্পে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। অনুমানের উপর নির্ভর করে যেটুকু যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় সেটুকু হল এই যে চণ্ডীদাস দুইজন ছিলেন। একজন চৈতন্যদেবের পূর্বে আবির্ভূত হন, বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন। অপরজন পদাবলীর বিখ্যাত চণ্ডীদাস। তাঁকে দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস বলা চলে। এই চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত সব পদ কোন একজন কবির রচনা নহে, তাতে নানা কবি নানাদিক হতে গান ঢেলেছেন। ছোট বড় নির্বিশেষে সব কবি তাঁদের রচনাকে এভাবে চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দেওয়ার জন্য কাব্যরসের তারতম্য দেখা দিয়েছে। ভাব-কল্পনা, সে-কারণে, কখন গিরির উদার শিখরে, কভু ক্লেদাক্ত তমোগহ্বরে গিয়ে পৌঁছেছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যমধ্যে কোথাও গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখা যায়নি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণের সার্থকতা

গ্রন্থটি সম্পাদনকালে বসন্তরঞ্জন রায় ইহার নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। নামকরণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,—"দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাসবিরচিত 'কৃষ্ণকীর্তনের' অস্তিত্বমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এতদিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুঁথিই 'কৃষ্ণকীর্তন' এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল।" বসন্তবাবুর এ নামকরণ এযাবৎকাল সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত একখানি রসিদ দেখে ইহার নামকরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। পুঁথিটি আড়াই-শ বছর আগে বনবিষ্ণুপুরের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন নামক এক ব্যক্তি পুঁথিটির ষোলখানি পত্র (৯৫—১১০ পত্র) গ্রন্থাগার থেকে ১০৮৯ সনের (১৬৮২ খ্রীঃ অঃ) ২৬ শে আশ্বিন নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আবার তা ২১শে অগ্রহায়ণ ফেরৎ দিয়ে যান। গ্রন্থাগারের জনৈক কর্মচারী এক টুকরা তুলোট কাগজে তা লিখে রাখেন। এই চিরকুটটিতে পুঁথির নাম—'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব' (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) উল্লিখিত আছে। কাজেই বসন্তবাবুর নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলে মনে হয় না। আমাদের ধারণা, গ্রন্থটির নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিবর্তে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' হলেই ঠিক হত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বাংলা ভাষার মূল্যবান নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে বা কিছু পরে বিদ্যাপতির পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখিত হলেও ইহাদের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়নি। ইহাদের ভাষাও নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনেক আধুনিক হয়ে গিয়েছে। সেকারণে, বাংলা ভাষার আদিরূপ চর্যার সঙ্গে ইহাদের তফাৎ অনেকখানি বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি এই দুয়ের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করেছে। পরবর্তিকালের বৈষ্ণব ভাবাদর্শের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মিল না থাকায় লোকসমাজে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল না। মোড়কে রক্ষিত ঔষধের মত ইহার ভাষা তাই অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির ভাষা আলোচনা করে ইহাকে ১৫শ শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে আহ্মি, তোহ্মি, মোক, তোঞ্ৰি, বাএ, কাহ্ন ইত্যাদি বহু প্রাচীন শব্দ আছে যেগুলি ইহার প্রাচীনতাকে প্রমাণিত করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির মত প্রাচীন ভাষা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা অনুসরণ করে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যখানি রচিত হয়। কৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে মথুরাগমন, মথুরা হতে ক্ষণিকের জন্য প্রত্যাবর্তন রাধাকৃষ্ণের মিলন, তার-পর কংসবধের জন্য কৃষ্ণের পুনরায় মথুরা গমন ও রাধার বিলাপ—ইহাই তেরটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। রাধাবিলাপের পর পুঁথিটি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ায় কাব্যটি শেষ পর্যন্ত বিরহে, না মিলনে শেষ হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। প্রচলিত রীতি ও অলংকার শাস্ত্রের বিধান অনুসারে রাধা-কৃষ্ণের মিলনের মধ্যে কাব্যটি শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্য মনে হয় গ্রন্থশেষে হয়ত রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন বর্ণিত হয়েছিল। তবে কবি সর্বত্র যে অলংকার শাস্ত্রের নীতি মেনে চলেছেন এমন কথা বলা যায় না। মাঝে মাঝে তিনি আদিরসের এমন উৎকট প্রকাশ ঘটিয়েছেন যে তাতে রসাভাস সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিষয়বস্তু

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যানভাগ জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড. নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ—এই তেরটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিবৃত হয়েছে। কাব্যের শেষাংশে 'খণ্ড' নামটি যুক্ত না হওয়ায় কেহ কেহ ঐ অংশটি চণ্ডীদাসের রচনা নয় বলে মনে করেছেন। অবশ্য এই অংশে কবির রচনারীতি ও রসসৃষ্টির অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। জন্মখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কংসনিধনের জন্য বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে দৈবকী-উদরে জন্ম নিলেন এবং তাঁর সম্ভোগের জন্য বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী সাগরের ঘরে পদুমা উদরে রাধারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাম্বূলখণ্ডে এসে রাধা-কৃষ্ণের পৌরাণিক বেশ খসে পড়ল। রাধাকৃষ্ণের আচরণ প্রাকৃতনরনারীর পর্যায়ে নেমে গেল। রাধা সব সখিজনের সঙ্গে মিলে বড়াইকে নিয়ে চলেছেন বৃন্দাবন থেকে মথুরার পথে। মাথায় দধিসরের পসরা। সখীদের সঙ্গে রস-পরিহাস করতে করতে বড়াইকে পিছনে ফলে রাধা অনেকদূর এগিয়ে গেলেন। বড়াই তাঁকে খুঁজতে খুজঁতে অন্য পথে গিয়ে হাজির হল। পথে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা। বড়াই তাঁর কাছে রাধার সন্ধান জিজ্ঞাসা করল। কৃষ্ণ ত রাধাকে চেনেন না। বড়াই তাই কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা করল। তা শুনে কৃষ্ণের মনে রতিভাব জাগল।

তিনি রাধাসঙ্গ লাভ করার জন্য অধীর হয়ে পড়লেন। রাধার সঙ্গে মিলনের জন্য কৃষ্ণ বড়াইকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। বড়াই তারপর ফুলতাম্বুল নিয়ে উপস্থিত হল রাধার কাছে। রাধা বড়াই-এর মুখে কৃষ্ণের কথা শুনে রুষ্ট হয়ে উঠলেন। তিনি ফুলতাম্বুল সব লাথি মেরে ফেলে দিলেন। বড়াইকে সরোষে বললেন,—'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা'। বড়াই তিন তিনবার রাধার কাছে গেলেন। কিন্তু রাধা বড়াই-এর কথায় আদৌ কান দিলেন না। তিনি ধিক্কার সহ কৃষ্ণের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন, বড়াইকে তিনি প্রহার করে বসলেন। তাম্বুলখণ্ড এখানেই শেষ হয়েছে।

দানখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে মথুরার পথে দানী সেজে বসলেন। বড়াই সখীপরিবৃতা রাধাকে ভুলিয়ে সেখানে উপস্থিত করল। কৃষ্ণ রাধার দধিদুগ্ধ সব বিনষ্ট করে বলপূর্বক রাধাকে সম্ভোগ করলেন। ক্ষোভে-অপমানে রাধা কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করলেন,—'এক ঠাই বাঢ়িলাহোঁ নান্দের ঘরে। চণ্ডাল কাহ্নাঞি এবে বল করে।' নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ আবার পারের কাণ্ডারী সেজে যমুনার ঘাটে অপেক্ষা করে রইলেন এবং পার করার ছলে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে রাধার সঙ্গে তিনি জলকেলি করলেন। রাধার প্রতিকূল বাম্যভাব দূর হল। ভারখণ্ডে রাধা কৃষ্ণসঙ্গসুখে আকৃষ্ট হলেন। তারই কথাতে কৃষ্ণ ভারী সেজে দধিদুগ্ধপসরা বহন করলেন। ছত্রখণ্ডে কৃষ্ণ তাপ জ্বালা নিবারণার্থে রাধার মাথায় ছত্রধারণ করলেন এবং রাধা তাঁকে রতিদানের আশ্বাস দিলেন। বৃন্দাবন খণ্ডে রাধাকৃষ্ণের মিলন হল। যমুনাখণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণের কালিয়দমন, গোপীগণের সঙ্গে জলবিহার, গোপীগণের বস্ত্রহরণ বিবৃত হয়েছে। হারখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করে নিলেন। ফলে রাধা যশোদাসমীপে কৃষ্ণের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণ প্রতিশোধগ্রহণ স্বরূপ রাধাকে মদনবাণ হানলেন বাণখণ্ডে। যৌবনোন্মাদিনী রাধা মূর্ছা গেলেন। কৃষ্ণ অনুতপ্ত হলেন। বড়াই ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে বন্ধন করলেন। কৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই আবার তাঁর বন্ধন মোচন করে দিল। রাধা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। রাধা কৃষ্ণের পুনরায় মিলন হল। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ যমুনাপুলিনে মধুর বংশী রব করে রাধার প্রাণমন হরণ করে নিলেন। বাঁশীর সুরে রাধার শরীর আকুল, মন ব্যাকুল হয়ে গেল। বড়াই-এর উপদেশে তিনি কৃষ্ণের বাঁশী

চুরি করে নিলেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর রাধা কৃষ্ণের বাঁশী ফিরিয়ে দিলেন। রাধাবিরহ অংশে রাধার নিদারুণ বিরহদশা উপস্থিত হল। বহু অন্বেষণের পর রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। ক্লান্তিভরে তিনি কৃষ্ণের ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এই সুযোগে কৃষ্ণও রাধাকে ছেড়ে মথুরাগমন করলেন।

যমুনাপুলিনে রাধাকৃষ্ণের বিজনকেলি কৌশলে বর্ণনা করে জয়দেবই প্রথম বাংলা দেশে বৈষ্ণবকবিতার রসস্রোত ভগীরথের মত শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে নিয়ে আনেন। তাঁর মধুরকোমলকান্ত পদাবলী সঙ্গীতমাধুর্যে, রসনিষেকে ও শব্দতরঙ্গে বাংলাসাহিত্য-ভূমিকে সজীব প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও গীতগোবিন্দের প্রভাব

বড়ু চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় সকল কবির কাব্যে জয়দেবের কাব্যবীণার সুমধুর ঝংকার শুনা যায়। বাংলা কাব্যের নিজস্ব সুরটি জয়দেবের কাব্যবীণার তারে বেজে ওঠায় জয়দেব সংস্কৃত কাব্য রচনা করেও বাংলা সাহিত্যে উচ্চ আসন লাভ করেছেন। জয়দেব পুরাণবর্ণিত রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী আশ্রয় করে রাধা-গোবিন্দের কেলিবিলাস বর্ণনা করায় পরবর্তীকালের সকল বৈষ্ণব কবি পুরাণ ও গীতগোবিন্দ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের উপরে ইহাদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জন্মখণ্ডে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। কংসের অত্যাচারে সৃষ্টি বিনাশ হয় দেখে দেবতারা ব্রহ্মার নিকটে গেলেন। ব্রহ্মা তারপর দেবতাদের নিয়ে ক্ষীরোদসাগরতীরে গিয়ে হরিস্তব করলেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি দেবতাদের 'ধল কাল দুই কেশ' দিয়ে বললেন—'এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের (বসুদেবের) ঘরে। হলী (বলরাম) বনমালী (কৃষ্ণ) নাম দৈবকী উদরে' এবং কৃষ্ণই কংসনিধন করে সৃষ্টি রক্ষা করবেন। এই অংশটি কবি ভাগবত[১], বিষ্ণুপুরাণ[২] ও মহাভারতীয় বৈবাহিক পর্বাধ্যায়[৩] হতে গ্রহণ করেছেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরাম ও অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ জন্ম নিলেন। কংসের ভয়ে বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দগোপের গৃহে রেখে এলেন। কৃষ্ণনিধনের জন্য কংস পূতনা, যমলার্জুন, কেশী প্রভৃতিকে পাঠালেন। কিন্তু কৃষ্ণ সকলকে বিনাশ করে

১। ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া·সিতকৃষ্ণ কেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ কর্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥

অনন্তর ভগবান নারায়ণ অসুরাবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমর্দিত পৃথিবীর ক্লেশ

গোকুলে বেড়ে উঠতে লাগলেন। বাঁশী হাতে নিয়ে বৃন্দাবনে গোরু চরানই হল তাঁর প্রাত্যহিক কার্য। এই অংশটিও ভাগবতপুরাণের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে। কেবল, কংস যে কৃষ্ণনিধনের জন্য যমলার্জুনকে পাঠিয়েছিলেন সেকথা কোন পুরাণে পাওয়া যায় না।

জন্মখণ্ডে কবি কৃষ্ণের জন্মকথা পুরাণ থেকে গ্রহণ করলেও রাধার জন্মকথা তিনি কোন পুরাণ অনুসরণ করে রচনা করেননি। রাধার কোন বিবরণ বিষ্ণু পুরাণ, হরিবংশ বা ভাগবতে নেই। পদ্মপুরাণে রাধা ভানুনন্দিনী, কীর্তিদা বা কীর্তিকার গর্ভে তাঁর জন্ম ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা সাগর গোপের কন্যা, পদুমা উদরে তাঁর জন্ম। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণের সখা রাধার সখীদের নাম ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার সখীদের উল্লেখ আছে, কিন্তু নাম নেই। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ

হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশস্বরূপে রাম-কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং মহিমাব্যঞ্জক নানা কার্য করিলেন। (বঙ্গবাসী সংস্করণ)।

২। এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥

হে মহামুনে! ভগবান পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া, আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে।

—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

৩। স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব কেশো যোসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥

নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন ; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব বলে।

—কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত অনুবাদ।

একবার বলভদ্রের[১] নাম করেছেন, কিন্তু তাঁর সখাদের কোন আভাস পাওয়া যায়নি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধা বৃষভানুর মহিষী কলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ দেওয়া হয়েছে। এই পুরাণমতে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা আই-হনের (অভিমন্যু) পত্নী, সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী এবং আইহন ক্লীব। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকে চন্দ্রাবলী বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই প্রভাবটুকু লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাও চন্দ্রাবলী নামে পরিচিতা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবন খণ্ডে, কালীয়দমন খণ্ডে ও যমুনা খণ্ডে ভাগবতের রাসলীলা, কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণ লীলার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। তবে ভাগবতে শারদোৎফুল্ল রজনীতে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বসন্তকালের দিবাভাগে গোপীগণ যখন বৃন্দাবনে তরুলতা শোভিত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর উদ্যান পরিদর্শন করতে গিয়েছে তখনই অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাসলীলাকালে সব গোপী নিজেকে রাধার চেয়ে কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়তমা বলে মনে করল; কৃষ্ণের কাছে সকলে আত্ম নিবেদন করল—'তোক্ষে দেব বনমালী নান্দের নন্দন। আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদয়-চন্দন॥' কিন্তু ষোড়শ সহস্র গোপীর সঙ্গলাভ করেও কৃষ্ণ 'রাধার নেহে বিকল' হয়ে পড়লেন। গোপীগণকে ছেড়ে তিনি রাধিকার নিকট গমন করলেন। কৃষ্ণের অন্তর্ধানে সব গোপী বিলাপ করল। ইহার মধ্যে ভাগবতের ছায়া সুস্পষ্টভাবে পড়েছে। ভাগবতেও কৃষ্ণ একজন 'আরাধিকা'কে নিয়ে কুঞ্জগৃহে গোপীগণকে পরিত্যাগ করে গেলে গোপীদের বিলাপ করতে দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালীয়দমন খণ্ডে কালিয়নাগ দমনের বৃত্তান্তটি পৌরাণিক। অবশ্য কবি এখানে পৌরাণিক কাহিনীকে নিজ পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। পুরাণে দেখা যায় কৃষ্ণের প্রধান উদ্দেশ্য কালিয়নাগ দমন, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণের আসল উদ্দেশ্য কালীদহের বিষাক্ত জল শোধন করে তাতে রাধার সঙ্গে কেলি করা। কৃষ্ণ কালিয়নাগ দমন করার জন্য এক গাছ থেকে কালীদহে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছুকাল আর উঠলেন না। সকলে তখন বিলাপ করতে লাগল।

১। শুনিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে ॥—৩৪ সংখ্যক পদ (বংশীখণ্ড)।

বলরাম মনে করলেন কৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন। তিনি তখন 'দশাবতার স্তব শুরু করে দিলেন। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ লীলা পুরাণাশ্রয়ী। আর এক বিষয়ে ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে গরমিল আছে তা হল এই, ভাগবতে কালিয়দমন ও বস্ত্রহরণের পর রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে', কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম রাসলীলা, তারপর কালিয়দমন ও বস্ত্রহরণ লীলা বর্ণিত হয়েছে।

কাহিনী পরিকল্পনার দিক থেকে বড়ু চণ্ডীদাস যেমন পুরাণের বহু অংশ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেছেন, কবিত্বশক্তির সম্যক্ স্ফুরণের জন্য তেমনি তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের অনেকগুলি পদের শরণ নিয়েছেন। বৃন্দাবন খণ্ডে বড়াই রাধাকে অভিসারিকাবেশে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যে কথা বলেছেন, তা গীতগোবিন্দের পঞ্চম সর্গে 'রতিসুখসারে গতমভিসারে, পদটির ভাব ও ভাষার অনুকরণ মাত্র বলা যেতে পারে।

যথা :

তোর রতি আশোআঁশে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে।
তোমার শঙ্কেতবেণু বাজা এ যতনে॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে॥

তুলনীয়— —বৃন্দাবনখণ্ড—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
—পঞ্চম সর্গ—গীতগোবিন্দ।

তারপর বৃন্দাবনখণ্ডে রাসলীলায় অভিমানিনী ক্রুদ্ধা রাধাকে কৃষ্ণ বিনয় করেছেন 'যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ' শীর্ষক যে পদটি, সেখানেও গীতগোবিন্দের দশম সর্গের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' পদটির নিবিড় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

যথা :

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ লোভে।
পরতেখ মোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥

—বৃন্দাবনখণ্ড—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তুলনীয়—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী হরতিদরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন-চন্দ্রমা রোচয়তি লোচন-চকোরম ॥

—দশম সর্গ—গীতগোবিন্দ।

রাধা বিরহ বর্ণনাতেও কবি জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। যথা :

তনের উপর হারে।
মানএ যেহেন ভারে।
আতি দুবরে খিনী রাধা চালতেঁ না পারে ॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥

—রাধাবিরহ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তুলনীয়—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।
সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্ ॥
রাধিকা তব বিরহে কেশব ॥
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে বাংলার সমাজে বৌদ্ধতন্ত্রের সাধনা ব্যাপক প্রসারলাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ খণ্ডে এই তান্ত্রিক-সাধনার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘবিরহের পর রাধাকৃষ্ণের যখন মিলন হল, তখন রাধা কৃষ্ণের অঙ্গ প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ জানান যে তিনি এখন অধ্যাত্মসাধনায় নিরত :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাব

অহোনিশি যোগ বেআই।
মন পবন গগনে রহাই ॥

* * *

ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মনপবন তাত কৈল বন্দী ॥

এখানে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমা ইত্যাদিতে তন্ত্রশাস্ত্রের ষটচক্রভেদক্রমের সুন্দর রূপ ফুটে উঠেছে। চণ্ডীপূজা, গায়েব মাংস কেটে মকরভোজ ইত্যাদির উল্লেখও এ গ্রন্থে দেখা যায়। বড়ায়ির উপদেশ এবং কৃষ্ণবিরহে চঞ্চলা রাধার বিলাপোক্তিতে এগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

চণ্ডীপূজা—কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ। চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ।
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥

মকরভোজ— সাগর সঙ্গম গিআঁ।
গাএর মাঁস কাটিআঁ।
আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে কেহ কেহ ইহাকে গীতি-নাট্য শ্রেণীর রচনা বলেছেন। এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক, ইহা কোন জাতীয় রচনা। গীতিনাট্য বলতে আমরা গান দিয়ে রচিত নাটককে বুঝি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গানের রূপ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলেও, ইহাতে নাট্যগুণের অভাব লক্ষিত হয়। গতিই হল নাটকের প্রাণ। বিভিন্নমুখী ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে এই গতি নাটকের মধ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্য নাটকীয় গতি ক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়েছে। যেমন, বাঁশী চুরির ঘটনাটি বংশীখণ্ডের ২১ ও ৩৩

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপ

সংখ্যক পদ দুটিতে কবিকে প্রায় একরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি সহযোগে উল্লেখ করতে দেখা যায় :

২৭ সংখ্যক পদ—

কৃষ্ণ— এথাঞি শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ
সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে
বাঁশী নিলেহে তুহ্মি ॥

রাধা— বড়ার ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরায়িল কাহ্নাঞিঁ
মুখে আন হেন বাণী ॥

কৃষ্ণ— আহ্মে সে তোহ্মারে সকল বেভার
রাধা জাণোঁ ভালমতেঁ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে ॥

রাধা— মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
সত্য কর পরমাণে।
আহ্মি যত বড় মন্দ লোক কাহ্ন
তাক সখিজন জানে ॥

কৃষ্ণ— না বোল না বোল নাগরী রাধা
মোরে হেন দুষ্ট বাণী।
এথাঞিঁ আহ্মার তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী
সকল লোকে ভালেঁ জাণী ॥

৩৩ সংখ্যক পদ—

কৃষ্ণ— গাই রাখিতেঁ নিন্দ গেলোঁ বাশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোন ভিতে ॥

রাধা— নন্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥

কৃষ্ণ— এথাঙ্ক্ষিঁ আছিল বাঁশী সন্ধার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে ॥

রাধা— বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥

কৃষ্ণ— না বোল না বোল রাধা হেন ছুঠবাণী ;
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥

তারপর কবি অনেকক্ষেত্রে কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত থেকে পাত্রপাত্রীর উক্তির সঙ্গে বর্ণনা যোগ করে দিয়েছেন, কাব্যের বিভিন্ন পালার মধ্যে সংযোগ-রক্ষার জন্য কয়েকটি করে সংস্কৃত শ্লোকও যোগ করে দিয়েছেন, যেগুলি নাটকের ক্ষেত্রে আশাই করা যায় না। কারণ, নাটক হল নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ ; নাটকের মধ্যে কোথাও আত্মপ্রকাশ করে ইহার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করার স্বাধীনতা তাঁর নেই। কাজেই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কোনমতে নাট্যধর্মী রচনা বলা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান আকর্ষণ হল ইহার কাহিনী বা আখ্যানভাগ। গীতিকাব্যের যেটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সার্বজনীনতা, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে রাধার চিত্ত যখন ব্যাকুল হয়ে পড়ে, মন যখন নিদারুণ বিরহ-অনলে কুম্ভকারের পণীর মত রয়ে রয়ে পুড়তে থাকে, অন্তর যখন কাহ্ন-অভিলাসে শুকিয়ে যায় তখন আমাদের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। রাধার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিরহের বেগে বাহির হয়ে পড়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠি। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কেবল আখ্যানকাব্য বললে ঠিক হয় না, ইহাকে বলা উচিত গীতিকাব্যধর্মী আখ্যানকাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সমাজচিত্র

প্রাচীনযুগের কবিদের দৃষ্টি স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ ছিল। মর্তের ধূলিভরা জীবন কচিৎ তাঁদের দৃষ্টিপথে অনাহুতের মত এসে গিয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনেকটা আঁচে-আন্দাজে, কল্পনায় অনুমানে ইহার চিত্রখানি উদ্ধার করতে হয়। এখন দেখা যাক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে সমাজচিত্রের কতটুকু পরিচয় লাভ করা যায়।

রাধাকৃষ্ণের সংলাপ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে তৎকালীন সমাজের একটা শিথিল যৌনজীবনের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ অবৈধভাবে

এগার বছরের বালিকা রাধার কাছে প্রণয়ভিক্ষা করেছেন, তাঁর শ্লীলতা হানি করেছেন। কৃষ্ণের এই অশুচি কর্মে সহায়তা করেছে আবার এক বর্ষীয়সী নারী বড়াই। সমাজজীবন যে সেসময় কতটা অধঃস্তরে নেমে গিয়েছিল তা এই রাধা কৃষ্ণের প্রণয়চিত্র থেকে বোঝা যায়। রাধাবিরহখণ্ডে উদ্ভিন্নযৌবনা রাধাকে ফেলে কৃষ্ণের নির্মমভাবে মথুরাগমনের মধ্যে কেহ কেহ সেযুগের নরনারীর বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে একটা উৎকট অসঙ্গতি আবিষ্কার করেছেন। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার পরিণয়ের ফলে বালিকার যৌবনকালে কিরূপ নিদারুণ বিড়ম্বনা ও দুর্গতি উপস্থিত হয় তা বিরহতুরা রাধার বিলাপ থেকে উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণ মথুরা গমন করলে রাধা বড়াই-এর কাছে এই বলে আক্ষেপ করেছেন—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঙ্গ অসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥

*   *   *

আনাথ করিয়া মোক কাহ্নাঞি পালাএ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে সেকালের লোকে যাত্রাকালে যেসব দৃশ্যকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করত তারও পরিচয় আছে। কৃষ্ণ রাধাকে বাঁশী চুরির দোষ দেওয়াতে রাধা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে ভাষাতে তার মধ্যে যাত্রাকালীন সেসমস্ত অশুভ লক্ষণ ধরা পড়েছে। যেমন, রাধা বলছেন—

কোন আসুভ খণে পাএ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝঁট না মানিলোঁ ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥

*   *   *

কথো দুর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥

গুরুর আসনে বসা, মাটিতে জলের অক্ষরে লেখা, গায়ে ভাঙা কুলোর বাতাস লাগান সেযুগের সমাজে দোষ বলে গণ্য হত। রাধার উক্তি থেকে এগুলি বোঝা যায়:

গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে সেকালের সমাজের অলংকরণ, কেশবিন্যাস ইত্যাদির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেযুগের মেয়েরা যে কানে কুণ্ডল, হাতে কাঁকন-চুড়ী পরত রাধিকার সাজসজ্জা থেকে অনুমান করা যায়:

(১) কন্নত কুণ্ডল হিরার ধার।

(২) বাহুতে কনক চুড়ী, মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমূলে।

রাধাকে ছেড়ে কৃষ্ণ মথুরা চলে যাওয়ায় রাধা দুঃখ করে বলছেন—

মাথে শম্ভু সম খোঁপা শিসতে সিন্দূর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর॥

উক্তিটির মধ্যে 'মাথে শম্ভু সম খোঁপা' দেখে মনে হয় ইহা সেযুগের এক বিশেষ ধরনের কেশবিন্যাস।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রসরুচি ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে সমালোচকমহলে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে। যাঁরা কাব্যটির বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা আধ্যাত্মিকতাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে ভক্তচিত্তে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীকে ভিত্তি করে যে আপার্থিব সৌন্দর্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়ে থাকে, যার নাম ভাববৃন্দাবন, বড়ু চণ্ডীদাস বাস্তব সত্যের রূঢ় আলোক সম্পাতে তাকে এক সৌন্দর্যহীন কদর্য প্রাকৃত জগতে পরিণত করেছেন। রাধাকৃষ্ণের কামকলা, স্থূল রসরুচি, গ্রাম্যভাব, গ্রাম্য গালিগালাজ ইত্যাদি এমনভাবে কবি ইহাতে আরোপ করেছেন যে ইহার ভিতরকার পৌরাণিক মহিমাটুকু একেবার খর্ব হয়ে গিয়েছে। ইহার রাধাকৃষ্ণকে দেখে অন্তরে আর দেবত্বের ভাব জাগে না। তাঁদের দেখে যাত্রাদলের রঙমাখা সঙ সাজা রাধাকেষ্টের কথা মনে পড়ে যায়। পুরাণের মধ্যে যে কৃষ্ণ কংসনিধন করে, কালীয়দমন করে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রসবিচার

অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, নিজেকে বহুগুণিত করে রাসলীলায় ষোলশ গোপীর সঙ্গে কেলিবিলাস করেছেন, তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকে গ্রাম্যভাষায় ছিনারী[১], শালী[২] বলে সম্বোধন করেছেন, তাঁকে প্রহার করে যমালয়ে পাঠাবার ভয় দেখিয়েছেন[৩], আবার ব্রজগোপীদের মাথা ঠোকাঠুকি করে হেলায় মারতে চেয়েছেন[৪]। রাধাও কৃষ্ণকে সহজে ছাড়েননি। তিনিও রীতিমত কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে বলেছেন—'মাগু কিলে কিলাইয়া মারিব তোহ্মা বাটে'। যিনি নারায়ণের অবতার তিনি আবার রাধাকে নৌকায় পেয়ে আনন্দরসে মত্ত হয়ে সোৎসাহে গান ধরেন—

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ
হেহে লহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ
হেহে লহে লহে।

রাধা-কৃষ্ণের এই সব আচরণ লক্ষ্য করে ইঁহাদের আর অপ্রাকৃত জগতের অধিবাসী বলে মনে হয় না। ভক্তিরস এখানে একেবারে স্থূল আদিরসে পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হল আদিরসাত্মক স্থূল মর্তজীবনের কাব্য।

আবার ভক্তরসিকের কাছে এই কাব্য বস্তুজগতের সকল ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার ঊর্ধ্বচারী বলে মনে হয়। তিনি[৫] বলেন, "কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে এই যে দ্বিবিধ মত প্রকাশ পেয়েছে ইহাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা তা একবার পরীক্ষা করে

১। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা দিকে পাতসি মায়া।
২। নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
৩। তবে আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর।
৪। মুণ্ডে মুণ্ডে ভুসায়া মারিব তোহ্মা হেলে।
৫। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

দেখতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রুচি ও আধ্যাত্মিকতা আলোচনা করতে গিয়ে যে অভিমত পোষণ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "কাব্যটি যে একাধারে প্রণয়মূলক (erotic) এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক (esoteric), তাহা না বলিলেও চলে।" বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এই দুই রূপ নিহিত আছে—বহিরঙ্গের বিচারে ইহা আদিরসাত্মক স্থূল মর্তজীবনের কাব্য এবং অন্তরঙ্গের বিচারে ইহা আধ্যাত্মিক-ভাবমণ্ডিত পবিত্র ভক্তিকাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে স্থূল আদিরসের কাব্য বলার যুক্তি এই যে, ইহাতে আদ্যন্ত দেহজ বাসনা-কামনার ভোগপঙ্কিল রূপ বিবৃত হয়েছে। তাম্বূল খণ্ডে কৃষ্ণ বড়াই-এর মুখে রাধার রূপের কথা শুনে রাধাসঙ্গ লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। বড়াইকে তিনি রাধাবিরহের অন্তরজ্বালা করুণভাবে নিবেদন করেছেন :

তোর মুখে শুণী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর ধীর নহে মনে।

* * *

না বোল না বোল নিরাস বড়ায়ি
আপনে চিন্ত উপাএ।
রাধার বচন না পাইলেঁ বড়ায়ি
কাহ্নাইর প্রাণ জাএ।

কৃষ্ণপ্রেমে মন মজিয়ে দেওয়ার জন্য বড়ায়ি কৃষ্ণের নির্দেশে ফুল-তাম্বূল নিয়ে চলল রাধার কাছে। কিন্তু এগার বছরের বালিকা, কামকলায় অনভিজ্ঞা রাধা ফুল-তাম্বূল সব পা দিয়ে ফেলে দিলেন। বললেন—

ঘরের সামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা।

দানখণ্ডে কৃষ্ণ দানী সেজে রাধার কাছে সরাসরি প্রেম নিবেদন করে

বললেন। কিন্তু রাধা কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তিনি পিরীতিপ্রসঙ্গকে এড়িয়ে গেলেন এই বলে—

না বোল না বোল কাহ্নাঞি হেন পাপবাণী।
তোহ্মে ভালে জাণো আহ্মে আইহনের রাণী।

কামান্ধ কৃষ্ণ কিন্তু সহজে ছাড়লেন না। তিনি বলপ্রয়োগের কথা বললেন :

এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন।
বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন॥

এতেও যখন রাধা রতিদান করলেন না, তখন কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে শালী সম্বন্ধ করে তাঁকে ধর্ষণ করলেন এবং ইহার পর রাধার বারংবার প্রতিবাদ ও আর্তনাদকে উপেক্ষা করে লম্পটের মত তিনি নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড ছত্রখণ্ড ও বৃন্দাবন খণ্ডে তাঁকে ধর্ষণ করেছেন। বাণখণ্ডে এসে কৃষ্ণ রাধাকে লক্ষ্য করে সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করলেন। এতদিন ধরে যে রাধা বড়ুয়ার বহুআরী, বড়ুআর ঝী, আইহনের পত্নী বলে নিজেকে কৃষ্ণাসক্তি থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছিলেন কৃষ্ণের মদনশরের আঘাতে সেসব যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কৃষ্ণের কাছে রাধার আত্মিক পরাজয় ঘটল। এরপর থেকে তিনি একেবারে কৃষ্ণগতপ্রাণা হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর জীবন-যৌবন সকলই অসার। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণকে মধুর সুরে বংশীরব করতে শুনে তিনি বললেন-'দাসীহআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা'। রাধাবিরহ-খণ্ডে রাধা অন্তরে মর্মান্তিক কৃষ্ণবিরহের জ্বালা অনুভব করে অস্থির হয়ে বড়ায়িকে বললেন—'

ঝাঁট করী কাহ্নাঞি আনাওঁ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ॥

কৃষ্ণের কাছেও তিনি নিঃসঙ্কোচে মনের কামনা প্রকাশ করলেন :

অনাথী নারীক কত থাকে অভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ॥

কিন্তু কৃষ্ণ উদাসীনভাবে রাধার অনুনয়-বিনয়কে এড়িয়ে চললেন। এখন তাঁর মনে রাধার কাছে পূর্ব-লাঞ্ছনা-অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণের ভাব জেগে উঠেছে। তিনি রাধাকে লক্ষ্য করে তাই নিদারুণ বাক্যবাণ ছুড়তে লাগলেন :

এবেঁসি জানিল ভৈল কলি অবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহাজার ॥
কমণ ঝগড়া রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো ॥

* * *

সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সমে কেলি।
মোর পাণে আল্ রাধা তেজহ ধামালী ॥
দূতী দিআঁ পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন ॥

এরপর ক্ষণিকের জন্য রাধাকৃষ্ণের মিলন হল বটে, কিন্তু কৃষ্ণ রাধার অন্তর বিরহানলে দগ্ধীভূত করে মথুরায় চলে গেলেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে তাম্বূল খণ্ড থেকে শুরু করে রাধাবিরহ খণ্ড পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের কামনা-বাসনার স্রোত সরব উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধ্যাত্মিকতায় যাঁরা আস্থাবান তাঁরা বলবেন বাহ্যত ইহা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হলেও ইহার অভ্যন্তরে পরম ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। রাধাকৃষ্ণের লীলা আসলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের। প্রাকৃত জগতে ইহার কল্পনা করা যায় না। স্বরূপে কৃষ্ণ হলেন নিগুর্ণ ব্রহ্ম। লীলাবশে তিনি ক্রিয়া ও গুণান্বিত হন। একদা তাঁর রমণেচ্ছা হলে, তিনি নিজেকে দুই রূপে প্রকটিত করেন—দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণমূর্তি ও বামাঙ্গে রাধামূর্তি। স্বরূপে রাধা এবং কৃষ্ণ এক বলে, একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য তাই রাধার ব্যাকুলতা এবং রাধার সঙ্গসুখ লাভ করার জন্য কৃষ্ণও তাই সদা উন্মুখ। পুরাণবর্ণিত রাধাকৃষ্ণের এই আলৌকিক লীলাকে অনুসরণ করে কবি ভক্ত-ভগবানের পারস্পরিক সম্পর্কের একটা রূপকচিত্র অঙ্কন করেছেন। সংসার-মায়ামুগ্ধ জীব হলেন রাধা এবং কৃষ্ণ হলেন ভগবান। জীব সংসার মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে নিজের মধ্যে একটি গর্বোদ্ধত ভাব নিয়ে ভগবানকে ভুলে থাকে। তখন তার ভাব তাম্বূল খণ্ডের রাধার মত,—'বড়ুআর বহুআরী আহ্মে বড়ুয়ার ঝী। মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী'। কিন্তু ভগবান ত ভক্তকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। তিনি তাই আঘাতে-সংঘাতে জর্জরিত করে ভক্তের

সংসারমায়া-বন্ধনকে ছিন্ন করতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডাদিতে ইহার অভিব্যক্তি। কৃষ্ণের কঠোর প্রয়াসেও যখন রাধা গৃহবাসনা ত্যাগ করতে পারলেন না, নিজেকে ও কৃষ্ণকে ভুলে জগৎপ্রপঞ্চে মুগ্ধ হয়ে রইলেন তখন বাণখণ্ডে এসে কৃষ্ণ চরম আঘাত হানলেন রাধার অন্তরে। রাধা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। ইহার তাৎপর্য, জীব যে নিজেকে এবং ভগবানকে ভুলে জগৎপ্রপঞ্চে মুগ্ধ হয়ে ছিল, এতদিনে তা লুপ্ত হল। রাধার মায়ামোচনের জন্য যে কৃষ্ণের সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ তা বড়ায়ির উক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাণখণ্ডের ২ সংখ্যক পদে বড়ায়ি কৃষ্ণকে অনুরোধ জানাচ্ছে—

আহ্মার বচন শুণ কাহ্নাঞি গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥

বংশী খণ্ডে এসে রাধা কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গৃহ-সংসার সব ছেড়ে কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য, কৃষ্ণের আসঙ্গলাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এতদিনে ভক্তের বুঝি চৈতন্য হল। তিনি তাই পাখী হয়ে তাঁর স্থানে উড়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। রাধা বিরহ খণ্ডে রাধার যাবতীয় সংসারজ্ঞান বিদূরিত হল। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি দেখা দিল। কৃষ্ণবিহনে তাঁর জীবন-যৌবন সকলই অসার বলে মনে হল। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—"যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে। হাথে তুলি আ মো খাইবোঁ গরলে ॥" ভগবানের কাছে ইহাই ভক্তের আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ।

রাধাচরিত্র সৃষ্টিতে বড়ু চণ্ডীদাস অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাম্বূল খণ্ডের এগার বছরের বালিকা রাধা রাধাবিরহ খণ্ডে পূর্ণ যুবতী নারীতে পরিণত হয়েছেন। রাধাচরিত্রের এই ক্রমবিকাশের চিত্রটি কবি সন্তর্পণে অঙ্কিত করেছেন। তাম্বূলখণ্ডে রাধা সংসার-অনভিজ্ঞা, বয়সে নিতান্ত বালিকা। কৃষ্ণের প্রণয়-প্রস্তাবকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দানখণ্ডের মধ্যে রাধার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে খানিকটা স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, কৃষ্ণের কামাচারের জন্য দায়ী তিনি নিজে। তাঁর রূপযৌবনই কৃষ্ণের লোভী চিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। আক্ষেপ করে তাই তিনি বলেছেন—

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা

কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে ॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল ॥

* * *

ছিণ্ডিআঁ পেলাইবো বড়ায়ি সাতেসরী হার।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞি নিবিড় শৃঙ্গার ॥

নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণের সঙ্গে জলকেলিতে রাধার মনে রতিভাব জেগেছে। প্রেম-ব্যাপারে তিনি অনেকটা উন্নতি লাভ করেছেন। বাম্যভাব ত্যাগ করে তিনি রতিদানের শর্তে কৃষ্ণকে দিয়ে দধিদুগ্ধের ভার বহন করিয়ে নিলেন ভারখণ্ডে, রৌদ্রতাপ নিবারণের জন্য কৃষ্ণকে ছত্রধারণে বাধ্য করালেন ছত্রখণ্ডে। বৃন্দাবন খণ্ডে রাধার আসঙ্গ-আসক্তি গভীর প্রেমে পরিণত হল। তিনি অন্য গোপীকে দেখে এখন ঈর্ষা করেন। এই ঈর্ষাই প্রেমের প্রমাণ। হার খণ্ডের মধ্যে কৃষ্ণ রাধার হার অপহরণ করলে তিনি কৃষ্ণের কু-চরিত্রের কথা যশোদাকে বলে দিলেন :

বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে ॥

কৃষ্ণ এতে রুষ্ট হয়ে রাধাকে মদনবাণ হানলেন বাণখণ্ডে। রাধা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। কৃষ্ণের অনুকম্পায় শেষে তিনি আবার আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন। বাণখণ্ডের মধ্যে রাধাচরিত্রের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এখানে রাধার দেহাশক্তি বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

বংশীখণ্ডে রাধা উদ্ভিন্নযৌবনা নারীতে পরিণত হয়েছেন। কৃষ্ণবিহনে তাঁর তখন সকলি অন্ধকার। যমুনা পুলিনে বংশীরব শুনে তিনি অন্তরের মধ্যে নিদারুণ কৃষ্ণবিরহের জ্বালা অনুভব করেছেন। বড়ায়িকে তাই দুঃখ করে তিনি বলছেন—

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥

রাধাবিরহ খণ্ডে রাধার কৃষ্ণবিরহ সন্তাপ আরো মর্মান্তিক। প্রাণ বড়ায়িকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন—

সোঞঁরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলোঁ সুখ আসেস দিনে দিনে তনু শেষ
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে॥

রাধার বর্ষাকালীন বিরহদশাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

ভাদর মাঁসে আহোনিশি অন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি জায়িবে বুক॥

পদাবলীর রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার বেশ কিছু পার্থক্য আছে। পদাবলীর রাধা ভাববৃন্দাবনের অধিবাসিনী। প্রথম থেকেই তিনি সেজন্য যোগিনী সেজে কৃষ্ণের উপাসনা শুরু করেছেন। তাঁর মধ্যে প্রেমের প্রথম বিস্ময়-চাঞ্চল্য নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা মানবী। বয়সে তিনি বালিকা। বাল্য-কৈশোরের ধাপ ভেঙ্গে তবে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন। বাল্যাবস্থা থেকে জীবনে বহু দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করে যৌবনে পৌঁছে তবে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। পদাবলীর রাধার মধ্যে কৃষ্ণের দেবত্ব সম্পর্কে কোথাও কোন সংশয় জাগেনি। কুল-মরিয়াদ কপাট উদ্ঘাটন করে তিনি কৃষ্ণের উদ্দেশে অভিসারে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ইহার বিপরীত। কৃষ্ণের দেবত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই। পরকীয়া প্রেমের মহত্ত্বে তিনি সন্দিগ্ধা। পরনারীর প্রতি কৃষ্ণের আসক্তি দেখে তিনি সেজন্য কথায় কথায় কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে মর্মান্তিক শ্লেষ নিক্ষেপ করেছেন। পদাবলীতে ভাবসম্মিলনের পর রাধা তিল-তুলসী দিয়ে কৃষ্ণে দেহ সমর্পণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা বহুবার কৃষ্ণের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েও দেহজ বাসনা-কামনাকে ভুলতে পারেননি। তাঁর বাসনার বুঝি আর শেষ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা যে মানবী, ইহাই তার বড় প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা ও পদাবলীর রাধা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা চরিত্র নিপুণভাবে ফুটে উঠলেও কৃষ্ণচরিত্রটি তেমন

সার্থক বিকাশলাভ করতে পারে'নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কে এজন্য কেহ কেহ বক্রোক্তি করে বলেছেন—ইহাতে কৃষ্ণ নেই, কীর্তনও নেই। বাস্তবিকই পুরাণের মধ্যে আমরা কৃষ্ণের যে ঐশ্বর্যের পরিচয় পাই, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখি তার একান্ত অভাব। এখানে কৃষ্ণের দৈবরূপ খসে পড়েছে। তিনি দুষ্ক্রিয়াসক্ত লম্পটের মত বালিকা রাধার উপর অযথা বলপ্রয়োগ করেছেন। ছলে-বলে-কৌশলে তাঁর যৌবনমধু তিনি লোলুপের মত পান করেছেন। অথচ রাধা যখন রতিসুখ আস্বাদে পরম প্রীত হয়ে তাঁকে দেহমন সমর্পণ করতে চেয়েছেন তখন তিনি তা নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করে মথুরায় চলে গিয়েছেন। রাধা চরিত্রে যেমন ক্রমবিকাশের ধারাটি সুস্পষ্ট, কৃষ্ণচরিত্রে তেমন নেই। কৃষ্ণ প্রথমে যেমন, পরেও তেমনই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণের মাঝখানে সংযোগ সেতুরূপে কেবল কবি তাকে সৃষ্টি করেননি, মাঝে মাঝে তাকে রাধাকৃষ্ণের পরম নির্ভর করেও তুলেছেন। তাম্বূল খণ্ডে বড়ায়ির মুখে রাধার কথা শুনে কৃষ্ণ যখন নিদারুণ রাধা বিরহতাপে জর্জরিত হয়ে পড়লেন তখন বড়াই হল তাঁর একমাত্র ভরসা। বড়ায়িকে উদ্দেশ করে কৃষ্ণ তাই বলেছেন—

বড়াই

আহ্মার বচন ধরল বড়ায়ি
মনে না করিহ হেলা।
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা।।

রাধাবিরহ খণ্ডে রাধা কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে বড়ায়িকে করুণভাবে মিনতি করেছেন :

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতন মুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আণিআঁ দিআর জগন্নাথে।।

কাহিনী-পরিকল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে বড় চণ্ডীদাস যে বেশ কিছুটা

অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে জয়দেব বিদ্যাপতির তুলনায় তিনি কম কিছু নন। এছাড়া কবি বর্ণনশক্তি ও উপমাপ্রয়োগের বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না, ভারতচন্দ্রের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে পালিশ করা সুন্দর ঝকঝকে রূপ গ্রহণ করেছে বড়ু চণ্ডীদাসেই তার সার্থক সূচনা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হয়ে উঠলেও কবির সৌন্দর্যসৃষ্টির নৈপুণ্যের দরুন আমাদের মনে কোন ক্লান্তি বা জড়তার ভাব জাগে না। কবির কল্পনাপক্ষে ভর দিয়ে আমরাও এক চিরসৌন্দর্যের অলকাপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হই। সত্যতা প্রমাণের জন্য নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হল :

বড়ু চণ্ডীদাসের বর্ণনশক্তি ও অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য

(১) শ্রীরাধার রূপ—

মাণিক জিঁণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।
কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী॥

(২) শ্রীরাধার বিরহ—

চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী কুয়েলী কুহলে
লাগে বিষবাণ ঘাএ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্নু বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ॥

(৩) শ্রীরাধার আক্ষেপ—

দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালি আর জল যেন তখনে পলাইল॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে॥

অলংকার সৃষ্টিতেও কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন :

(১) পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক যান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান॥

(২) বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে॥

(৩) ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী॥
যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট॥

বিদ্যাপতির পদাবলী॥

জয়দেব বাঙালী হয়ে ভারতের অবাঙালী সমাজে যেমন অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, বিদ্যাপতি অবাঙালী হয়ে তেমনি বাঙালী সমাজে অসামান্য সমাদর লাভ করেছেন। তিনি মিথিলার (উত্তর বিহারের) অধিবাসী অথচ বাংলা দেশেই বাঙালীরা প্রথমেই তাঁর পদসংগ্রহ করে তাঁর কবিকর্মের একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন। বিদ্যাপতি বাঙালী সমাজে কত বড় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তার পরিমাণ নির্ণয় করতে গেলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজেদের অন্তরের একটা নিগূঢ় যোগসূত্র কল্পনা করে তাঁর পদাবলী 'অমৃতবৎ আস্বাদন করেছেন। বাঙালী তাঁকে 'মৈথিল কোকিল,' 'কবিকুলচন্দ,' 'রসিক সভাভূষণ সুখকন্দ,' 'রসধাম,' 'কবিপতি', 'কবিসার্বভৌম' ইত্যাদি উপাধি-ভূষণে ভূষিত করে কৃতার্থ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নিজেকে উদার কাব্যরসিক হিসেবে সপ্রমাণিত করেছে।

বিদ্যাপতি ও বাঙালী

বাংলা দেশে বৈষ্ণব রসিক ভক্তসম্প্রদায় সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির কবিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পদাবলী সঙ্কলন করতে থাকেন। বিখ্যাত বৈষ্ণবপদসংগ্রহে—'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র,' 'পদকল্পতরু' ইত্যাদিতে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ স্থান পেয়েছে। এমনি করে পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে

আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সকল বাঙালী পাঠক সমাজে নানাভাবে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রস্তুত ও সমাদৃত হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, উনিশ শতকের পূর্বে বিদ্যাপতি যে বাঙালী নহেন, মিথিলাবাসী বাঙালী তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারভাঙ্গা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বিদ্যাপতি সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তিনি ১৮৭৫ খ্রীঃ 'বঙ্গ-দর্শন' পত্রিকায় 'বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধে সেগুলি প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বিদ্যাপতি বাঙালী নহেন, তিনি মিথিলাবাসী; মিথিলার রাজা শিবসিংহের তিনি সভাকবি ছিলেন। একই বছরে জন বীম্‌স্ 'Indian Antiquary' পত্রিকায় 'On the Age and Country of Bidyapati' শীর্ষক প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিদ্যাপতিসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় বৃত্তান্ত স্বীকার করে নেন এবং তিনি ইহার প্রতি বিদ্বজ্জনের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর গ্রীয়ার্সন সাহেব দ্বারভাঙ্গা অঞ্চল পরিভ্রমণ করে খাস মিথিলা থেকে বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ সংগ্রহ করেন এবং সেগুলি ১৮৮১ খ্রীঃ 'An Introduction to the Maithili Language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy & Vocabulary (Vol. II)'-তে প্রকাশ করেন। ইহাতে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত মোট ৮২টি পদ সংগৃহীত হয়। ইহার ফলে বাঙালীর বিদ্যাপতির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কীয় ভ্রান্তধারণার অবসান হল এবং বিদ্যাপতিচন্দ্রও ধীরে ধীরে বাংলার আকাশ ছেড়ে মিথিলার আকাশে উদিত হলেন। তবে গৌরবের বিষয়, বিদ্যাপতি কবিত্বশক্তির গুণে বাঙালীর হৃদিমানসে যে অক্ষয় আসন অধিকার করেছিলেন, সে আসন আজও শূন্য হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কখন তা শূন্য পড়ে রবে না।

বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল নিয়ে অনেক গবেষণা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত সে-সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায়নি। বিদ্যাপতির পূর্ব-

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল

পুরুষগণ মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সেজন্য মিথিলার রাজবংশের ইতিহাস থেকে বিদ্যাপতির কালনির্ণায়ক কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সন-তারিখের নানা বৈষম্য ও ত্রুটি বিদ্যমান থাকায় ইহাকে নিঃসংশয়ভাবে গ্রহণ করা যায় না। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলী ও অবহট্ট ভাষায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু কিছু উল্লেখ

দেখা যায়। ইহার দ্বারাও তাঁর আবির্ভাব কাল সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। বিদ্যাপতির সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে নানা রাজবংশের উল্লেখ আছে, কোথায়ও বা তিনি সন-তারিখের ব্যবহার করেছেন। এগুলিও তাঁর আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে কিছুটা সাহায্য করে।

বিদ্যাপতির একটি পদের ভণিতাতে[১] রায় নসরৎ-এর নামোল্লেখ দেখা যায়:

কবিশেখর[২] ভণ অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি।

রায় নসরৎ ১৩৯৪ খ্রীঃ অঃ জোনপুর অধিকার করেন এবং ১৩৯৯ খ্রীঃ অঃ পরলোকগমন করেন। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন।

বিদ্যাপতি মহারাজ কীর্তিসিংহের অসলান নামক জনৈক মুসলমান শাসকের হাত থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কীর্তিকাহিনী অনুসরণ করে অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিলতা' রচনা করেন। কীর্তিসিংহের রাজত্বকাল সম্ভবত ১৪০২—১৪১০ খ্রীঃ অঃ। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' ইহার মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে রচিত হয়ে থাকবে।

বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে স্বহস্তে ভাগবতের নকল করেছিলেন। এই পুঁথির পুষ্পিকায় আছে,—"শুভমস্তু সর্বার্থগতা সংখ্যা ল. সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রাজবনৌলিগ্রামে শ্রীবিদ্যাপতে-র্লিপিরিয়মিতি।" ইহা হতে জানা যায় ১৪২৮ খ্রীঃ অঃ বিদ্যাপতি রাজবনৌলি গ্রামে বসে ভাগবতের নকল করেন।

উপরি-উক্ত তথ্যাদি হতে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সঠিক-ভাবে কিছু জানা না গেলেও এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, কবি চতুর্দশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হন এবং পঞ্চদশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

১। ৩৪ সংখ্যক পদ—'বিদ্যাপতি'—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

২। কবিশেখর বলতে এখানে বিদ্যাপতিকে বুঝতে হবে। কারণ, মিথিলায় প্রাপ্ত লোচনকবির 'রাগতরঙ্গিণী' নামক পদসঙ্কলন গ্রন্থে পদটি বিদ্যাপতির রচনা বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বিদ্যাপতির জীবনকথা সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু জানা যায়নি। তথাপি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গ্রীয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্তৃক আহৃত তথ্যপঞ্জী হতে তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপর কিছুটা আলোকসম্পাত করা যেতে পারে। বিদ্যাপতি দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত বিসফী গ্রামের এক প্রখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি। তাঁদের কৌলিক উপাধি হল ঠক্কুর। পুরুষানুক্রমে তাঁরা মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সকলেই মিথিলার রাজসভায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পিতামহ জয়দত্তের আমল থেকে বিদ্যাশিক্ষার দিকে তাঁদের বংশের মোড় ফিরে। বিত্তের সঙ্গে এভাবে বিদ্যার মণিকাঞ্চন যোগ হয়ে বংশে বিদ্যাপতির মত একজন অসাধারণ পণ্ডিত-কবির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিদ্যাপতির পিতা গণপতির সময়ে অবশ্য বংশের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। তথাপি ঠক্কুর বংশের ঐতিহ্যগুণে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

বিদ্যাপতির জীবনকথা

বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় যে পদাবলী রচনা করেন এবং অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিলতা' নামে যে গদ্য-পদ্যময় চম্পূকাব্য প্রণয়ন করেন, তা থেকে তাঁর জীবনকথা সম্পর্কে কিছু পরিচয় লাভ করা যায়। 'কীর্তিলতা'তে বিদ্যাপতি 'ওইনীবার' ব্রাহ্মণ রাজবংশের কীর্তিকথা উল্লেখ করেন। ঐ বংশের রাজা গএনেস (∠গগনেশ্বর বা গণেশ্বর) ১৩৭২ খ্রীঃ অঃ অসলান নামক এক মুসলমানের কাছে পরাভূত হয়ে নিহত হন। তখন তাঁর দুই পুত্র—বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ দেশ ত্যাগ করে জৌনপুরে চলে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা ইব্রাহিম শাহের সহায়তায় তাঁরা অসলানকে পরাজিত করেন। কীর্তিসিংহ ইহার পর রাজা হন। ইঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' কাব্য প্রণয়ন করেন। কীর্তিসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য দেবসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাপতি 'ভূপরিক্রমা' গ্রন্থ রচনা করেন। দেবসিংহের পর তাঁর পুত্র শিবসিংহ অল্পকালের জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁরই উৎসাহে বিদ্যাপতি অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিপতাকা' ও সংস্কৃতে 'পুরুষপরীক্ষা' রচনা করেন। শিবসিংহের পর তাঁর ভ্রাতা পদ্মসিংহ রাজা হন। তাঁর পত্নী বিশ্বাসদেবীই রাজকার্য পরিচালনা করতেন। বিশ্বাসদেবীর নির্দেশে কবি 'শৈবসর্বস্বসার' এবং 'গঙ্গাবাক্যাবলী' রচনা করেন।

ইহার পর বিদ্যাপতি ঐ বংশের নরসিংহের নির্দেশে 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী', পুরাদিত্যের নির্দেশে 'লিখনাবলী' এবং ভৈরব সিংহের নির্দেশে 'দুর্গাভক্তি' তরঙ্গিণী রচনা করেন। এ সকল তথ্যপঞ্জী থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাপতি আজীবনকাল মিথিলা রাজবংশের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এসেছেন। রাজবংশের সাহচর্যে এসে বিদ্যাপতি যে প্রভূত ধনমান অর্জন করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় শিবসিংহের তাম্রপাত্রে উৎকীর্ণ দানপত্রে। ইহাতে বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' ('সপ্রক্রিয়াভিনবজয়দেব পণ্ডিতঠক্কুর') নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতিকে শিবসিংহ বিসপী গ্রাম দান করেছিলেন।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, শিবসিংহের পত্নী লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রণয় সংঘটিত হয়েছিল। তবে ইহা সত্য নহে, ইহা বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের মনগড়া কাহিনী মাত্র। বিদ্যাপতির অনেক পদে লছিমাদেবীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ থাকায় গল্প-বুভুক্ষু মানুষ এরকম অবৈধ প্রেমকথা সৃষ্টি করে নিয়েছে। শুনা যায়, বিদ্যাপতি নাকি চণ্ডীদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে সুদূর মিথিলা থেকে বাংলা দেশে এসেছিলেন এবং গঙ্গাতীরে দুই কবিতাপসের মিলন হয়েছিল। কিন্তু এ কাহিনীর মূলেও কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নেই।

বিদ্যাপতির ধর্ম

বিদ্যাপতির ধর্ম নিয়ে বাঙালী সমাজে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বিদ্যাপতি বাংলা দেশে পরম ভাগবত, বৈষ্ণবচূড়ামণি, রাধাকৃষ্ণপদাবলীর ব্যাস, নবরসিকের অন্যতম (বৈষ্ণব সহজিয়া মতে) বলে বন্দিত হয়েছেন। উনিশ শতকের শেষভাগে বিদ্যাপতি অবাঙালী বলে প্রমাণিত হওয়ার পর স্বদেশবাসীর (মিথিলাবাসীর) কাছে তিনি পরম শৈব বলে পরিচিত হলেন। মিথিলাবাসিগণ তাঁকে শৈব বলে প্রচারিত করার জন্য নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে শুরু করলেন। তাঁদের মত হল, বিদ্যাপতি আসলে শৈব। তবে অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলাতে শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব—এই তিন ধর্মেরই প্রচলন ছিল। তখন ধর্ম নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কোন বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হয়নি। বিদ্যাপতিও তাই শৈব হয়েও শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেছেন। ইহার ফলে তিনি যুগপৎ হরগৌরী লীলাবিষয়ক পদাবলী ও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী সৃষ্টি করেছেন।

মিথিলাতে শৈবধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের প্রচলন থাকলেও জনসাধারণের মধ্যে শৈবধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। মিথিলাতে এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে দু-একটি শিবমন্দির নেই। একারণে মিথিলাতে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর চেয়ে হরগৌরী-লীলাবিষয়ক পদাবলীর অধিক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। হরগৌরীবিষয়ক পদাবলীর জন্যই বিদ্যাপতি মিথিলাতে অমর হয়ে রয়েছেন।

বিদ্যাপতি যে পরম শৈব ছিলেন তা তাঁর কিছুসংখ্যক পদের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। একস্থলে তিনি বলেছেন—

ঈস চাঁদ গজ হরিকমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভগবতবছল প্রভু বান মহেসর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা॥

বাংলা—ইন্দ্র-চন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ, কমলাসন হরি, সব দেবতাকে আমি বর্জন করেছি। বাণ মহেশ্বর, (তুমি) ভক্ত বৎসল প্রভু—এই জেনে তোমাকে সেবা করেছি।

আবার যাঁরা বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বলে মনে করেন তাঁদের পক্ষেও কিছু বলার আছে। এপর্যন্ত বিদ্যাপতির যত পদ আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রায় সবই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। গ্রীয়ার্সন সাহেব খাস মিথিলা থেকে বিদ্যাপতির যে ৮২টি পদ সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। নেপালের পুঁথি, লোচনকবির রাজতরঙ্গিণী, নগেন্দ্র গুপ্তের তালপাতার পুঁথি—সব মিলিয়ে বিদ্যাপতির যত পদ পাওয়া গিয়েছে তার প্রায় সবই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। আট শ' পদের মধ্যে হরগৌরীলীলাবিষয়ক পদ মাত্র ৬৫টি। মিথিলাতে যদি হরগৌরীলীলাবিষয়ক পদের জনপ্রিয়তা বেশী হয়, তাহলে মিথিলাতে সংখ্যায় ইহা এত নগণ্য কেন? তারপর হরগৌরীলীলাবিষয়ক পদের চেয়ে রাধাকৃষ্ণের পদের সাহিত্যিক মূল্য অনেক বেশী। শৈবপদই যদি বিদ্যাপতির সাহিত্য-কৃতির প্রধান বাহন হয় তাহলে পরবর্তিকালে লোকস্মৃতিতে তিনি কতটুকু স্থান পেতেন? এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে গেলে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদের উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তা ছাড়া শৈবপদে যেমন বিদ্যাপতির শিবভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়, বৈষ্ণবপদাবলীর প্রার্থনাবিষয়ক পদেও সেরকম কবির হরিভক্তির গভীর পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন,

(১) মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

* * *

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

(২) তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহার বিশোয়াসা॥

কাজেই বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন সে-সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা মুশকিল। আসলে বিদ্যাপতির ধর্ম হল কবিধর্ম। যে ধর্ম শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ইত্যাদি বিশেষ কোন গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না, যা সর্বকালের সর্বশ্রেণীর রসিক-ভক্ত পাঠকের হৃদয়কে একসূত্রে বিধৃত করে সেই ধর্মই হল কবির ধর্ম, আর সেই ধর্ম হল বিদ্যাপতির ধর্ম।

বিদ্যাপতি বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি কেবল বৈষ্ণব পদকর্তারূপে পরিচিত হলেও মিথিলাতে তিনি স্মৃতি, মীমাংসা, পূজাপদ্ধতি, তীর্থভ্রমণ, শাক্ত-শৈব পদাবলীর রচয়িতা রূপে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রতিভার এমন বিচিত্র প্রকাশ মধ্যযুগের কোন কবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

বিদ্যাপতির কবিকৃতি

বিদ্যাপতির কবিকৃতির একটা বিশদ পরিচয় লাভ করার জন্য নিম্নে তারই একটা তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া হল :

(১) ভূপরিক্রমা (২) কীর্তিলতা (৩) কীর্তিপতাকা (৪) পুরুষ-পরীক্ষা (৫) লিখনাবলী (৬) বিভাগসার (৭) দানপত্রাবলী (৮) শৈব-

সর্বস্বসার (৯) গঙ্গাবাক্যাবলী (১০) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী (১১) গোরক্ষো-পাখ্যান (১২) পদাবলী সাহিত্য—(ক) শাক্ত পদাবলী (খ) শৈব পদাবলী (গ) বৈষ্ণব পদাবলী।

বিদ্যাপতির 'ভূপরিক্রমা' একখানি ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ। ইহাতে মিথিলা হতে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত যাবতীয় তীর্থের তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা আছে। দেবসিংহের আদেশে ইহা রচিত হয়। দেবসিংহ কোন কারণে মিথিলা ত্যাগ করে নৈমিষারণ্যে গমন করলে বিদ্যাপতিও তাঁর সঙ্গ ধরেন এবং এই তীর্থভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' অবহট্ট ভাষায় রচিত একখানি চম্পূকাব্য। কীর্তি-সিংহের কীর্তিকথাই হল 'কীর্তিলতা'র প্রধান উপজীব্য। গণেশের পুত্র কীর্তিসিংহ কিভাবে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহের সহায়তায় পিতৃহন্তা মুসলমান আততায়ী অসলানকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন তা 'কীর্তিলতা'তে কবি নিষ্ঠার সঙ্গে বিবৃত করেছেন।

'কীর্তিপতাকা' বিদ্যাপতির অবহট্ট ভাষায় রচিত অপর একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথমে কবি শিবসিংহের শৃঙ্গাররসবহুল লীলা বর্ণিত করেছেন এবং ইহার শেষাংশে শিবসিংহ কেমন করে জনৈক মুসলমান নৃপতিকে-পরাভূত করলেন তা বিবৃত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবার থেকে ইহার পুঁথির কিয়দংশ উদ্ধার করে আনেন।

বিদ্যাপতির 'পুরুষপরীক্ষা' সংস্কৃত ভাষায় রচিত আখ্যানমূলক রচনা। শিবসিংহেরই নির্দেশে কবি ইহা রচনা করেন। গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক-অনৈ-তিহাসিক গল্প আছে। বাংলাদেশে ইহার কিছুটা সমাদর হয়েছিল। হরপ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠনের জন্য ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও এই গ্রন্থের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল।

শিক্ষার্থীসকলের সংস্কৃতে পত্রলিখনপদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যাপতি 'লিখনাবলী' রচনা করেন। গ্রন্থটি পুরাদিত্যের নির্দেশে মূলত স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য রচনা। ইহাতে কবি মিথিলার দৈনন্দিন জীবনের চিত্রও নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত করেছেন।

বিদ্যাপতি নরসিংহ ও তদীয় পত্নী ধীরমতীর নির্দেশে যথাক্রমে 'বিভাগসার' ও 'দানবাক্যাবলী' নামে দুখানি আইনবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'বিভাগসারে'

সম্পত্তি বণ্টন ও উত্তরাধিকারতত্ত্ব এবং 'দানবাক্যাবলী'তে বিভিন্ন প্রকার দানের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাসদেবীর নির্দেশে কবি 'শৈবসর্বস্বসার' ও গঙ্গা-বাক্যাবলী' নামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটিতে শিবের উপাসনাপদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টিতে গঙ্গার উপকূলে (হরিদ্বার হতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত) বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রের ক্রিয়াবিধি বিবৃত হয়েছে।

বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' একখানি প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ। ইহাতে সহস্রাধিক শ্লোকে কবি দুর্গাপূজা সংক্রান্ত বিধিবিধান আলোচনা করেছেন।

'গোরক্ষোপাখ্যান' বিদ্যাপতিরচিত একখানি নাট্যগ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থটি সম্পর্কে এপর্যন্ত কোন প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হয়নি।

বিদ্যাপতির পদাবলী প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব পদাবলী। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতির প্রহেলিকা জাতীয়, দুর্গা-গঙ্গার বন্দনাসূচক ও আদিরসাত্মক প্রেমমূলক কিছু কিছু পদ আছে।

বিদ্যাপতির শাক্তপদ সংখ্যায় নগণ্য হলেও ইহাদের মধ্যে আদ্যাশক্তি কালীর রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন,—

কজ্জলরূপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅএ গঙ্গা কহিএ পানী ॥
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মাণী কহিএ হরঘর কহিঅএ গৌরী।
নারায়ণঘর কমলা কহিএ কে জাত উৎপতি তোরী ॥

বাংলা—কাজলরূপে তোমায় কালী বলে, উজ্জ্বলরূপে তুমি বাণী (সরস্বতী)। রবিমণ্ডলে তোমাকে প্রচণ্ড কহে, জলরূপে তোমায় গঙ্গা বলে। তোমাকে ব্রহ্মার ঘরের ব্রহ্মাণী বলে, হরের ঘরের গৌরী বলে, নারায়ণের ঘরের কমলা বলে। তোমার উৎপত্তি কে জানে?

হরগৌরীর লীলাবিষয়ক পদগুলির বিশেষ প্রচলন মিথিলাতে আজও বিদ্যমান আছে। ঈষৎ লঘুধরনের সঙ্গীতগুলি বিবাহ উৎসবে মহিলারা গেয়ে থাকেন। এই পদগুলিতে হরগৌরীর বিবাহ, সংসারযাত্রা ইত্যাদি বাস্তবরসে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইহাতে শিবের নগ্নধূসর, বৃদ্ধ নেশাখোরের রূপটিও বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। পাগলভোলা শিব মাঝে মাঝে নেশা করে কোথায় যে চলে যান গৌরী তা জানতে পারেন না। ঘর ছেড়ে তখন তিনি পাগলকে খুঁজতে পথে

বেরিয়ে পড়েন; পথচারীর কাছে তিনি শিবের উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করে ফিরেন—

উগনা হে মোর কতএ গেলা।
কতএ গেলা সি কি দহু ভেলা॥
জে মোর কহতা উগনা উদেঅশ।
তাহি দেবঁও কর কঙ্গনা বেস॥

বাংলা—দিগম্বর আমার কোথায় গেল। কোথায় গেল সে, কি হল? আমার দিগম্বরের উদ্দেশ যে বলে দিবে তাকে হাতের কঙ্কণ দিব।

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদাবলীই বিদ্যাপতির সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। পূর্বাঞ্চলে কবি যে এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তা এই বৈষ্ণব-পদাবলীর জন্যই। সংখ্যা ও গুণ এই দুয়েরই দিক থেকে পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির প্রায় আট শ' পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ইহার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলি গীতিকাব্যধর্মী। ইহাতে গীতি-কাব্যসুলভ সৌন্দর্যসৃষ্টি ও সর্বজনীন-সর্বকালিক মহিমার সাক্ষাৎলাভ করা যায়। রাধাকৃষ্ণের বাসনা-আসক্তি, দুঃখ-বিরহকে কবি অলংকারমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। যেমন,

কৃষ্ণরূপে মুগ্ধা রাধার উক্তি—

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহি সঞো হঠে হটি মোঞে আনল ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ তইঅও পসারএ পাঁখি॥

অর্থাৎ নয়ন-চোরকে নিবারণ করার জন্য আমি বদন অবনত করে রইলাম। কিন্তু চকোর যেমন চন্দ্রসুধা পান করার জন্য ধাবিত হয়, আমার নয়ন তেমনি প্রিয়ার মুখ-রুচি পান করার জন্য ধাবিত হল। সেখান থেকে সেই একগুঁয়ে নয়নকে এনে চরণে ধরে রাখলাম। মধুপান করার পর ভ্রমর যেমন উড়তে পারে না, শুধু পক্ষ বিস্তার করে (আমার রূপমুগ্ধ নয়ন তেমনি রূপসুধা পান করার পরেও পুনরায় দেখার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল)।

রাধারূপে মুগ্ধ কৃষ্ণের উক্তি—

যাইতে পেখলুঁ হম নাহলি গোরি।
কতি সয়ঁ রূপ ধনি আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহ জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥

* * *

ও লুকি করইতে চাহে কি দেহা।
অবহুঁ ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোহি গলয়ে জলধার॥

অর্থাৎ গৌরীকে স্নান করে যেতে দেখলাম। ধনি কোথা হতে এত রূপ চুরি করে আনল? কেশ নিঙড়াইতে জলধারা বইছে, যেন চামর থেকে মুক্তাধারা ঝরছে। ও (বসনখানি) কি দেহের মধ্যে লুকাতে চাচ্ছে? এখনি আমাকে ছেড়ে যাবে, স্নেহ ত্যাগ করবে, ঐ রস (আনন্দ) আর ফিরে পাব না—ইহার জন্য কাঁদছে, (যেন বসনের) অশ্রুধারা ঝরছে।

অথবা—

জহাঁ জহাঁ পদজুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরলুঁ অপরুব গোরি।
পইঠল হিয় মাহ মোরি॥

অর্থাৎ যেখানে যেখানে পদযুগল রয়েছে, সেখানে সেখানে পদ্ম ভরে উঠছে। যেখানে যেখানে অঙ্গ ঝলকাচ্ছে, সেখানে সেখানে বিদ্যুৎ তরঙ্গিত হচ্ছে। কি অপরূপ গৌরী দেখলাম! আমার হৃদয় মাঝে (সে) প্রবেশ করল।

বিদ্যাপতির পদের একটা সর্বজনীন ও সর্বকালিক আবেদন আছে। রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা বর্ণনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কবি জীবন-রহস্যের অগাধ জলে ডুব দিয়ে মর্মের বেদনা যত সব উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন। রাধাকৃষ্ণের দুঃখবিরহ-সঙ্গীত কেবল তাই ভক্তের মনকে ভরে

তোলে না, সেইসঙ্গে তা পাঠকের হৃদয়কেও পূর্ণ করে তোলে। কবি যেখানে রাধার বিরহ বর্ণনা করেছেন সেখানে তিনি পাঠককেও বিরহের বেগে বাহির করে ছেড়েছেন। ভাদ্র মাসের ভরা বর্ষার সময় রাধা যখন কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে দুঃখ করতে থাকেন,—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥"

তখন সংসারের আর সব বিরহীর অন্তরও হাহাকার করে ওঠে।

অথবা রাধা কৃষ্ণের সন্নিকটে থেকেও তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে না পেরে যখন আক্ষেপ করেন—

"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥"

তখন জগতের সুখৈশ্বর্যবঞ্চিত ভাগ্যহত মানুষের প্রাণের রশিতেও টান পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাপতি সুখের কবি। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হয়ে পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নেই। কবিগুরুর এই উক্তি যথার্থ বলেই মনে হয়। বিদ্যাপতির রাধা দুর্লভ রতন কৃষ্ণপ্রেমমাধুরী লাভ করার জন্য ধৈর্য ধরতে পারেন না। প্রেমের নিবিড় উপলব্ধির চেয়ে কামনার উগ্রতাই তাঁর মধ্যে বেশী। নবযৌবনে সমাগতা রাধাকে একারণেই কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হয়ে আক্ষেপ করতে শুনি—'এ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়ব কি করব সো পিয়া-লেহে' অর্থাৎ এই নবযৌবন যদি বিরহেই কেটে যায় তাহলে প্রিয়তমের স্নেহে আর কি করবে? কৃষ্ণ বিহনে কেমনে তাঁর দিন রজনী কাটবে তা ভেবে তিনি কূল পান না। সখীদের উদ্দেশ্য করে তাই তিনি বলেন—

নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া-সঙ্গ দুখ হাম পাশ॥

অর্থাৎ (প্রিয়ের সঙ্গে) চোখের ঘুম গিয়েছে, মুখের হাসি মিলিয়েছে। প্রিয়ের সঙ্গে সুখও গিয়েছে, আমার পাশে (কেবল) দুঃখ (আছে)। রাধাচিত্তের এই নিরতিশয় চাঞ্চল্য দেখে স্বয়ং কবি তাঁকে আশ্বস্ত করছেন—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

তবে কৃষ্ণপ্রেমের অসীম মহিমা যে বিদ্যাপতির পদে একেবারেই ধরা পড়েনি, তা নয়। অন্তত একটি পদে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

বিদ্যাপতির রাধা

বিদ্যাপতির রাধাচরিত্র বিশ্লেষণ করলে ইহার মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায়। কিশোরী অবস্থা হতে নবযুবতীতে পরিণতি লাভ পর্যন্ত কবি রাধাকে অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত করে তুলেছেন। জীবন-উদ্যানে যৌবন-বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে শঙ্কা-লজ্জা-পুলক-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, অঙ্গে অঙ্গে যে দীপ্তি প্রতিভাত হয়ে ওঠে কবি তা নিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন।

শৈশব ঘুচে গিয়ে যৌবন এসেছে। রাধার সকল অঙ্গে-মনে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে :

বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস॥
মুকুর লঈ অব করঈ সিঙ্গার।
সখি এ পুছই কইসে সুরত বিহার॥

নিরজন উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে আপন পয়োধর হেরি॥

অর্থাৎ বচন তার চাতুর্যপূর্ণ। মৃদু মৃদু হাসি, ধরণীতে (যেন) চাঁদ প্রকাশ করল। দর্পণ নিয়ে এখন সে কেশবিন্যাশ করে। সখীর কাছে সুরত-বিহারের কথা জিজ্ঞাসা করে। নির্জনে সে কতবার স্তন দেখে। নিজের স্তন দেখে সে হাসে।

যৌবনের আরম্ভটা রহস্যপূর্ণ। সদ্যবিকশিত হৃদয় তখন আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করে; আপনার সম্পর্কে আপনি ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে। লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে তখন নিজেকে গোপন করবে কি প্রকাশ করবে তা সে ভেবে পায় না। বিদ্যাপতির রাধা তাই—

কবহুঁ বাঁধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপিয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥

অর্থাৎ কেশ কখন বাঁধে, কখন খুলে রাখে। অঙ্গ কখন ঢেকে রাখে, কখন (অঙ্গের আবরণ) খুলে রাখে।

কবি নবযৌবনা রাধার রঙ-বেরঙের ছবি এঁকেছেন। সখীদের কাছে রসকথা শুনার জন্য কখন রাধা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন :

সুনইত রসকথা থাপয় চীত।
জইসে কুরঙ্গিণী সুনএ সঙ্গীত॥

অর্থাৎ চিত্ত স্থির করে রসকথা শুনে, যেমন হরিণী শুনে সঙ্গীত।

আবার, কখন সখীদের কথায় তিনি লজ্জা পান :

সখি পুছইত আবে দরসএ লাজ।
সাঁচি সুধাও অধ বোলিও বাজ॥

অর্থাৎ সখী জিজ্ঞাসা করলে এখন লজ্জা দেখায়। সুধা বরিষণ করে অর্ধ কথা বলে।

যৌবনপ্রারম্ভে রাধার অন্তরে ইন্দ্রিয়জ বাসনা-কামনা উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু গুরুজন-পরিজনের ভয়ে লজ্জায় তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন না। অনেক ছল-চাতুরী আশ্রয় করে তবে তাঁকে মনোবাসনা পূর্ণ করতে হয়। সিনান করে রাধা গৃহে ফিরছেন। পথিমধ্যে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। গুরুজন সঙ্গে আছে। লজ্জায় নতমুখী রাধা তাই কেমন করে কৃষ্ণের মুখ দেখবেন। তিনি তখন এক অপরূপ চাতুরীর আশ্রয় নিলেন :

সব জন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতিহার তোড়ি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম-দরশ ধনি লেল॥

অর্থাৎ সকলকে ত্যাগ করে এগিয়ে গিয়ে তিনি আড় বদনে ফিরে দেখলেন। তারপর আবার মোতিহার ছিঁড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলে দিলেন (যাতে কুড়াতে দেরী হয়)। বললেন, আমার হার ছিঁড়ে গেল। তখন সকলে এখানে সেখানে নতমুখে খুঁটে খুঁটে একটি একটি করে মুক্তা কুড়াতে লাগল। সেই ফাঁকে রাধা কৃষ্ণকে দেখে নিলেন।

কৃষ্ণকে দেখার পর থেকে রাধার অন্তরে ভাবান্তর দেখা দিল। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য চিন্তা, অন্য কাম্য তাঁর নেই। কৃষ্ণই তাঁর কাছে জগতের সার, জীবনের জীবন, দেহের সর্বস্ব বলে মনে হল। কৃষ্ণকে সম্বোধন করে রাধা তাই বলছেন—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক সার।
দেহক সবরস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥

অর্থাৎ তুমি আমার হাথের দরপণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বূল, বক্ষের মৃগমদ, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পক্ষ, মীনের বারি, জীবের জীবন।

এত বলেও তবু রাধার অন্তর পরিতৃপ্ত হল না। শেষে তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়' অর্থাৎ হে মাধব, তুমি কেমন তা আমাকে বল। কৃষ্ণ অসীম, রাধার প্রেমও অসীম—ছত্রটির ব্যঞ্জনায় তাই প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যাপতি যে প্রথম শ্রেণীর কবি তার পরিচয় ঐ এক পংক্তিতেই।

যৌবন কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাধার মনে যৌনচেতনার উন্মেষ ঘটেছে। তিনি বলছেন—

জীবন চাহি জোবন বড় রঙ্গ।
তবে জোবন জব সুপুরুখ সঙ্গ॥

অর্থাৎ জীবনের চেয়ে যৌবনেই রঙ্গ (আনন্দ) বেশী। তবে, যৌবনে যখন সুপুরুষের সঙ্গ (ঘটে)।

রাধা তাই চললেন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসারে :

নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথবিপথ নাহি মান॥

এরপর রাধাকৃষ্ণের মিলন হল। কবি স্থূল দেহধর্মকে অবলম্বন করে রাধাকৃষ্ণের মিলনোচ্ছ্বাস নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন :

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল ঘামে তিলক বহি গেলা॥

অর্থাৎ চিকুর বিগলিত হয়ে মুখমণ্ডলে মিলিত হল, (যেন) মেঘমালা চন্দ্রকে বেষ্টন করল। মণিময় কুণ্ডল কানে দুলতে লাগল। ঘামে তিলক মুছে গেল।

বিরহের পদে রাধা চরিত্র পূর্ব পরিণতি লাভ করেছে। মনের মধ্যে এখন আর কোন সংশয়ের ভাব নেই। একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তিনি এখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর জীবন ব্যর্থ। কৃষ্ণ মথুরাতে গেলে তাই রাধা বিলাপ করছেন—

বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥
পূবর জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥

অর্থাৎ মনে বড় দুঃখ রইল। প্রিয় যদি আমাকে ভুলে গেল তাহলে আর এ জীবনে কাজ কি। পূর্বজন্মে ভুলক্রমে বিধাতা আমার ভাগ্যে যা লিখেছিলেন তাই হল। আমার প্রিয়ের কোন দোষ নেই; যা আমার কর্মে ছিল তাই

জ্বলছে। অন্যের অনুরাগে প্রিয় অন্য দেশে গেল। প্রিয়বিহনে আমার বক্ষঃ-পঞ্জর ঝাঁঝরা (ছিদ্রময়) হয়ে গেল।

বিরহের পরে কবি ভাবসম্মিলন বর্ণনা করেছেন। সেটা স্বাভাবিক হলেও যৌবনের সেই পথপরিক্রমা আর এখানে নেই। যৌবনে বহুর মধ্য দিয়ে একের জন্য যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ভাবসম্মিলনে এসে সেই একের সঙ্গে আনন্দের সম্মিলন ঘটেছে। অবস্থাটা তরী থেকে তীরে ওঠার মত। আশা-নিরাশার কোন দ্বন্দ্ব নেই। চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য কোন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নেই। আছে কেবল অনাবিল শান্তি, আর অমেয় তৃপ্তি। রাধা তাই বলেছেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

অর্থাৎ আমার ভাগ্যে আজ রজনী প্রভাত হল। প্রিয়তমের চাঁদমুখ দেখলাম। জীবন ও যৌবন সফল করে মানলাম। দশদিক নির্দ্বন্দ্ব হল।

রাধার অন্তরে কোন জ্বালা কেন, নেশা নেই, মোহ নেই। মনে হারানোর কোন ভয়ও নেই। কারণ, কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়মন্দিরে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখন রাধার অন্তরে তাই কেবল প্রেমের শাশ্বত নিবিড় নিঃসীম অনুভূতি বিরাজ করছে :

শীতের ওড়নি পিয়া গিরিসের বাও।
বরিসার ছত্র পিয়া দরিয়ার নাও॥

অর্থাৎ প্রিয়তম আমার শীতের ওড়না, গ্রীষ্মকালের বাতাস, বর্ষার ছত্র এবং দরিয়ার নৌকা।

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। ব্রজবুলি হল কৃত্রিম ভাষা। মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। বিদ্যাপতি মৈথিলীতেই প্রথম বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছিলেন। মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী ছাত্রগণ পরে বিদ্যাপতির পদগুলি বাংলায় নিয়ে আসেন। তারপর লোক-মুখে প্রচারিত হতে হতে মূল মৈথিলী ভাষার বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে থাকে এবং ইহাতে বাংলা শব্দ, বাক্যরীতি অনুসৃত হতে থাকে। পরবর্তিকালে বৈষ্ণব গোস্বামিগণের প্রভাবে এই ভাষা বৈষ্ণব পদাবলীতে অনুশীলিত

বিদ্যাপতি সমস্যা

হয়। ইহাই 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত। এপর্যন্ত বিদ্যাপতির ভণিতায় যত পদ পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে কিছু সংখ্যক পদে ব্রজবুলির ভাষার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। সেগুলি একেবারে খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত। মৈথিল কবির পক্ষে এরকম বাংলায় পদ রচনা করা সম্ভব নহে। কাজেই মৈথিলি বিদ্যাপতি ছাড়া আর একজন বাঙালী বিদ্যাপতির কল্পনা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিদ্যাপতির ভণিতায় যিনি বাংলা পদ রচনা করেন তাঁর আসল নাম কবিরঞ্জন। 'ছোট বিদ্যাপতি' বলে তিনি বিখ্যাত। আবার কেহ তাঁকে 'বাঙালী বিদ্যাপতি' বলেই অভিহিত করতে চান। আধুনিক বৈষ্ণব পদসঙ্কলনে[১] বিদ্যাপতির ভণিতায় খাঁটি বাংলা পদগুলিকে 'বাঙালী বিদ্যাপতি'র বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে এরূপ একটি পদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল:

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি
কানু হেন ধন পরানে বধিলি
একাজ করিলি কি॥
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে
তাহাকে হেরিয়া মুচকি হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে॥
দেখায়ে বদন চাঁদে।
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে।
ভুরিতে আয়লি লখিতে নারিল
ওই ওই বলে কাঁদে॥
হৃদয় দেখায়ে থোরি।
তার মন যে করিলি চুরি
বিদ্যাপতি কহে শুনলে সুন্দরী
কানু জীয়াইবি মোরি॥

(বাঙালী বিদ্যাপতি)

১। বৈষ্ণব পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বাংলাদেশের পদসঙ্কলনে কবিরঞ্জন, কবিশেখর, শেখর, চম্পতি, বল্লভ, ভূপতিসিংহ প্রভৃতির ভণিতায় পদগুলিকে সাধারণত মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিদ্যাপতির মৈথিলি পদে ঐরূপ কোন ভণিতা পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং কবিরঞ্জন, কবিশেখর প্রভৃতিকে বিদ্যাপতির সঙ্গে অভিন্ন করে না দেখে তাঁদের পৃথক পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়াই সমীচীন বলে মনে হয়।

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হলেও বাঙালী তাঁকে কোনদিন ভুলতে পারবে না। ইহার কারণ, বাঙালী তাঁর পদাবলীর মধ্যে আপন হৃদয়ের আনন্দ-বিরহের নিবিড় পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। এক পদাবলী সাহিত্য সৃষ্টি করে তিনি বাঙালী ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য—এই ত্রিবিধ রসপিপাসাকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর কাব্যের ভাব, ভাষা, ছন্দ—সবই পরবর্তিকালের বৈষ্ণব সাহিত্যকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। একারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরতরে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে।

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদ্যাপতির স্থান

চৈতন্য কথামৃত

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা॥

বাঙালীহৃদয়ের প্রেমামৃত তিল তিল করে আহরণ করে শ্রীচৈতন্যের দেহখানি নির্মিত হয়েছিল। তাঁর আবির্ভাবে ভক্তিরসের বন্যায় সমগ্র বাংলাদেশ ভেসে গিয়েছিল। নববারিনিষেকে প্রান্তরভূমি যেমন তৃণশস্যে সমাচ্ছন্ন হয়ে যায় তেমনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমরসে বাঙালীর মনোভূমি নতুন ভাবসম্পদে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একজন মাত্র ব্যক্তির এমন অপ্রতিহত প্রভাব জাতীয় জীবনে বড় একটা অনুভব করা যায় না। শ্রীচৈতন্য যেন বাঙালীর বাঞ্ছাকল্পতরু। বাঙালীর চিরদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা শ্রীচৈতন্যের জীবনসাধনাতে একটা নিটোল রসমূর্তি লাভ করেছিল। ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন ভাবজগতের দ্বারোন্মোচন করে যান।

মধ্যযুগের বাঙালীর কীর্তিকলাপের পরিচয় নিতে গেলে তাই তাঁর শরণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক ভিটা ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীহট্টে মুসলমানের আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজ বাসস্থান ত্যাগ করে নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হন। বিদ্যোৎসাহী সেনরাজাদের আমল থেকে নবদ্বীপে সদাচারী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ভিড় জমে উঠছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে নবদ্বীপ অঞ্চল বিদ্বজ্জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পিতৃভূমি ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। নবদ্বীপে এসে বসবাস করার পর নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর সঙ্গে জগন্নাথের বিবাহ হয়। নীলাম্বর চক্রবর্তী খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান শাসকেরা পর্যন্ত তাঁকে মান্য করতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও নীলাম্বরের দক্ষতা ছিল। চৈতন্যের জন্মের পর তিনি জন্ম পত্রিকা বিচার করে বলে দিয়েছিলেন যে জাতক মহাপুরুষ হবেন।

জগন্নাথ মিশ্রের বড় ছেলের নাম ছিল বিশ্বরূপ। তারপর কয়েকটি সন্তান হয়েই মারা যায়। শেষে বার বছর পরে চৈতন্যের জন্ম হয়। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী চৈতন্যের নাম রেখেছিলেন নিমাই। নিমাই অর্থ, যা নিমের মত তিত। নিমাই নাম রাখার তাৎপর্য হল এই, চৈতন্যের জন্মের পূর্বে অনেকগুলি সন্তানকে যমে নেয়; চৈতন্যকে যাতে যমে ছুঁতে না পারে সেজন্য তাঁর নাম রাখা হয় 'নিমাই'। জগন্নাথ মিশ্র বড় ছেলে বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চৈতন্যের নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর। কিন্তু চৈতন্যকে বাল্যকালে সকলে নিমাই বলেই জানত। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ্ ছিল বলে লোকে তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গৌরচন্দ্র বা গোরাচাঁদ বলত।

চৈতন্যের বাল্যকালে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। জগন্নাথ এতে ভেঙে পড়লেন। তিনি ভেবেছিলেন বড় ছেলে পণ্ডিত হয়ে সংসারের ভার নেবে। তিনি ঠিক করলেন নিমাইকে আর পাঠশালায় দেবেন না। কারণ, শিক্ষালাভ করে নিমাই অগ্রজের পথ অনুসরণ করতে পারেন। বাল্যকালে নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ও দুর্বিনীত ছিলেন। কারোর বসন চুরি করে নিতেন, কারোর গায়ে বালি দিতেন, কারোর কোলের

মধ্যে ওকড়ার বিচি দিয়ে দিতেন। দুষ্টামি করে কাউকে বা বিয়ে করার কথা বলতেন। নিমাই-এর এ-সমস্ত দুরন্তপনা লক্ষ্য করে জগন্নাথ বাধ্য হয়ে তাঁকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দিলেন। নিমাই খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পণ্ডিতরূপে খ্যাতি লাভের পূর্বেই জগন্নাথ মারা যান। মাকে আশ্বস্ত করে চৈতন্য সংসারে মন দিলেন।

ষোল-সতেরো বছরের নিমাই একদা বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে গঙ্গাস্নানে যেতে দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য নিমাই টোল খুলে দিয়ে ব্যাকরণ-অধ্যাপনা শুরু করে দিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা নবদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল।

এসময়ে নবদ্বীপে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসেন। তিনি ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্তে পরম পাজ্ঞ ছিলেন। গৌড়, তিরহুত, দিল্লী, কাশী, গুজরাট, বিজয়নগর, কাঞ্চীপুরী, তৈলঙ্গ, ওড্র প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতদের তিনি পরাস্ত করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ নিমাই পণ্ডিতের কাছে তাঁর সকল গর্ব ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। নিমাই-এর কাছে তর্কযুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। চারিদিকে নিমাই-এর নামে জয় জয়াকার পড়ে গেল।

ইহার কিছুদিন পরে চৈতন্য জলপথে পিতৃভূমি শ্রীহট্টে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিছু টাকাকড়ি সংগ্রহ করে তিনি আবার নবদ্বীপে ফিরে যান। চৈতন্যের প্রথম ভক্ত তপন মিশ্র পূর্ববঙ্গে প্রথম মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। চৈতন্যের উপদেশে তিনি কাশীতে গিয়ে বাস করেন।

চৈতন্যের পূর্ববঙ্গ সফরকালে লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে মারা যান। ঘরে ফিরে চৈতন্য এই দারুণ দুঃসংবাদ পেয়ে খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েন।

শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে নিয়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী নাম-সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। পুত্রের ভাবগতিক লক্ষ্য করে শচীদেবী রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাই-এর সম্বন্ধ স্থির করলেন। চৈতন্য মায়ের প্রভাবে শেষপর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন। মহাধুমধাম সহকারে নিমাই পণ্ডিতের বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হল।

আনুমানিক তেইশ বছর বয়সে চৈতন্য পিতার পিণ্ডদান করার জন্য গয়াধামে যাত্রা করেন। গয়ার ঈশ্বর পুরীর কাছে চৈতন্য দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। দীক্ষা পাওয়ার পর তাঁর হৃদয়ে অসীম কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হল। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সংসারমায়া লোভ-ঐশ্বর্য সব কিছু ভুলে গেলেন। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে তিনি মথুরা-বৃন্দাবনের পথে ছুটে চললেন। সঙ্গী-সাথীরা অনেক যত্নে সুস্থ করে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন তাঁকে। নবদ্বীপে ফিরেও তাঁর প্রেমোন্মত্ততার উপশম হল না। রঙ্গ-পরিহাস, বিদ্যার দম্ভ সব কিছু দূর হয়ে গেল। সংসার-বৈরাগ্য তাঁকে পেয়ে বসল। নিমাই পণ্ডিত টোল বন্ধ করে দিলেন। দিবারাত্র নাম কীর্তনে মগ্ন হয়ে রইলেন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তেরা এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে নামকীর্তনে যোগ দিলেন। বাংলা দেশের মানুষ তখন তন্ত্র-মন্ত্রে লিপ্ত থেকে কৃষ্ণনাম ভুলে গিয়েছিল। ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে মানুষের আচার-ব্যবহার অত্যন্ত নীচুতে নেমে গিয়েছিল। ইহাতে চৈতন্য কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতময় বাণী সমাজে প্রচার শুরু করে দিলেন।

শ্রীচৈতন্যের অনুমতি নিয়ে নিত্যানন্দ-হরিদাস নবদ্বীপের পথে পথে হরিণাম প্রচার করে বেড়ান। একদিন জগাই ও মাধাই নামে নবদ্বীপের দুই বিখ্যাত গুণ্ডার সামনে পড়লেন তাঁরা। জগাই-মাধাই ব্রাহ্মণের ছেলে, স্বভাব-চরিত্রে দুষ্ক্রিয়াসক্ত লম্পট মদ্যপ। নিত্যানন্দ ইহাদের কাছে হরিণাম বিতরণ করতে গিয়ে প্রহৃত হন। মহাপ্রভু ইহা শুনে ঘটনাস্থলে উপনীত হন। তাঁর ক্রোধ দেখে জগাই-মাধাই-এর মন ফিরে যায়। তাঁরা বৈষ্ণব ভিখারীর বৃত্তি গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবদের হরিণাম প্রচারে কেবল জগাই-মাধাই বাধা দেননি, সে যুগের নবদ্বীপের অবৈষ্ণব সমাজও ইহার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তারা কাজীর কাছে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। কাজী নগরসংকীর্তন নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন, যে কীর্তন করবে তিনি তার জাতি নেবেন। চৈতন্য একথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি কীর্তনের দলকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে শেষের দলের পুরোভাগে রইলেন। তাঁর রুদ্রমূর্তি দেখে কাজী ভয়ে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে কাজী সংকীর্তন-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেন।

কিন্তু ইহাতেও বৈষ্ণব সমাজের প্রতি অবৈষ্ণব সমাজের রোষ প্রশমিত হল না। চৈতন্যদেব বুঝতে পারলেন, কেবল কীর্তন ও নৃত্যগীত দ্বারা মানুষের মন জয় করা সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসী ছাড়া অন্য কোন লোকের মুখে ধর্মকথা শুনতে নারাজ। সন্ন্যাসীর প্রথামত গেরুয়া ও দণ্ড ধারণ না করলে কেউ তাঁর কথায় কান দেবে না। চৈতন্য তখন কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর মহাপ্রভু আর গৃহে ফিরেননি। এক দিন কাটোয়ায় অতিবাহিত করে তিনি বৃন্দাবনে যাচ্ছেন মনে করে রাঢ় দেশ (বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ) পরিভ্রমণ করে শান্তিপুরে অদ্বৈতনিবাসে উপস্থিত হলেন। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আবার নীলাচল যাত্রা করলেন। ইহার পর তিনি আর একবার মাত্র গৌড়ে এসেছিলেন।

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের উপর বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার দিয়ে চৈতন্য ১৫১০ খ্রীঃ ফাল্গুন মাসে পুরীধামে পৌছলেন। সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দ, দামোদর, জগদানন্দ ও মুকুন্দ। পুরীধামে পৌঁছে চৈতন্যদেব অচিরকালের মধ্যে দুই জন বড় ভক্ত লাভ করলেন। একজন হলেন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম ও আর একজন হলেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র। কাশী মিশ্রের বাগান বাড়ীতে চৈতন্য বাস করতেন। বাসুদেব সার্বভৌম প্রথমে শ্রীচৈতন্যের ভাবোন্মত্ত ভক্তির অতিরেক দেখে তাঁকে ভক্তিধর্ম ত্যাগ করে নিষ্কাম অদ্বৈতবাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। সাতদিন ধরে তিনি চৈতন্যকে বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্য শুনালেন। চৈতন্যদেব কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে চুপচাপ শুনে গেলেন। বাসুদেবের তখন সন্দেহ হল, চৈতন্য বুঝি তাঁর অদ্বৈতভাষ্য বুঝতে পারছেন না। তারপর চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর তর্ক-বিতর্ক শুরু হল। বাসুদেব শেষপর্যন্ত অদ্বৈতবাদের অসারতা বুঝতে পেরে চৈতন্যের পরম ভক্ত হয়ে গেলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে প্রতাপরুদ্রও চৈতন্যের ভক্ত হয়ে গেলেন। বাংলা ও উড়িষ্যার লোকের কাছে চৈতন্য দেবতা বলে মনে হল। চৈতন্য জগন্নাথের সচল রূপ বলে সর্বসাধারণের ভক্তি-অর্ঘ লাভ করলেন।

পুরীধামে আঠারদিন যাপন করে মহাপ্রভু তীর্থপর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণদাস নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে চৈতন্য কৌপীন-খণ্ড ধারণ করে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমধর্ম প্রচার করলেন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি উপাসনার তিনি প্রবর্তন করলেন দাক্ষিণাত্যে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঙ্কটভট্ট চৈতন্যপ্রভাবে পড়ে নারায়ণের উপাসনা ছেড়ে কৃষ্ণের উপাসনা শুরু করেন। চৈতন্য দক্ষিণ ভারত পর্যটনকালে আদিকেশব মন্দির থেকে, 'ব্রহ্মসংহিতা' এবং কৃষ্ণ-বেণ্বাতীরে বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' সংগ্রহ করেন। এই দুখানি গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। মধ্ব মতাবলম্বী আচার্যগণ চৈতন্যের কাছে পরভূত হয়ে তাঁর শরণ নেন। ইহার পর চৈতন্য রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরী তীরে পরম ভক্ত রায় রামানন্দের সনে মিলিত হন। চৈতন্যের সঙ্গে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে রামানন্দ বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করার জন্য কর্মত্যাগ করে পুরীধামে এসে বসবাস শুরু করে দেন। শ্রীরঙ্গমে পরমানন্দ পুরীর সঙ্গেও চৈতন্যের মিলন হল। পরমানন্দ পুরী চৈতন্যের সান্নিধ্যলাভের জন্য পুরীধামে এসে উপস্থিত হন।

ইহার পর চৈতন্য মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবদের প্রধান কেন্দ্র পন্ধরপুর এবং সেখান থেকে সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভাস পরিক্রমা করে পুরীধামে এসে উপস্থিত হলেন। বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও সমাজকে পুনর্গঠনের জন্য তিনি নিত্যানন্দকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন।

১৫১৩ খ্রীঃ শরৎকালে চৈতন্য গঙ্গাতীরপথে বৃন্দাবন যাত্রা করে গৌড়ে এসে উপস্থিত হন। এসময় তিনি শান্তিপুরে শচী-মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে মনে হয়। এরপর চৈতন্য আর কখনও স্বদেশে ফেরেন না। গৌড়ে এসে তিনি হুসেন শাহের দুজন উর্ধ্বতন কর্মচারী 'সাকর মল্লিক' ও 'দবির খাসে'র আনুগত্য লাভ করলেন। চৈতন্য এই দুই বিখ্যাত ভক্তের নাম দিলেন সনাতন (সাকরমল্লিক) ও রূপ (দবির খাস)। গৌড় থেকে চৈতন্য আবার পুরীতে ফিরে এলেন। ইহার কিছু পরে ১৫১৪ খ্রীঃ চৈতন্য মাত্র একজন পাচক ও একজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে কাশীধামে উপস্থিত হলেন। কাশীর বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কাশী থেকে প্রয়াগ হয়ে মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করলেন। তখন বৃন্দাবনে তীর্থস্থলী বলতে বিশেষ কিছু ছিল না।

চৈতন্য ব্রজমণ্ডল ঘুরে লুপ্ততীর্থের উদ্ধার করলেন, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করলেন। ইহার পর চৈতন্য আবার প্রয়াগে ফিরে এলেন। এখানে তিনি রূপ ও তাঁর ছোট ভাই বল্লভের (অনুপম) সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁরা গৌড়েশ্বরের কর্ম ত্যাগ করে চৈতন্যের সান্নিধ্যলাভের জন্য প্রয়াগে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। রূপকে উপদেশ দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে চৈতন্য কাশীতে ফিরে এলেন। এখানে পলাতক সনাতন এসে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হলেন। মহাপ্রভু রূপের মত সনাতনকেও উপদেশ দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। ১৫১৭ খ্রীঃ চৈতন্য বনপথ ধরে আবার নীলাচলে ফিরে এলেন। জীবনের বাকি আঠার বছর চৈতন্য পুরীধামেই যাপন করেন।

নীলাচলে কাশীমিশ্রের আশ্রমে মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় কাল অতিবাহিত করেন। হরিদাস, গদাধর, স্বরূপ দামোদর, পরমানন্দ পুরী, রায় রামানন্দ—ইঁহারা মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী হয়ে দিবারাত্র তাঁর কাছে থাকতেন। গদাধর এবং হরিদাস (যবন হরিদাস) নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। আমৃত্যু তাঁরা পুরীতেই কাটিয়ে দেন। যবন হরিদাসকে চৈতন্য অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। মায়ের প্রতি চৈতন্যের ভক্তি-ভালবাসা ছিল। সেই মায়ের প্রতি যতটা কর্তব্য তিনি পালন করতে পেরেছেন তদপেক্ষা অধিক কর্তব্য তিনি পালন করেছেন সর্বত্যাগী নিঃস্ব ঈশ্বরপ্রেমিক এই যবন হরিদাসের প্রতি। হরিদাস মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাওয়া দূরে থাকুক মন্দিরের কাছাকাছি পর্যন্ত যেতেন না। চৈতন্য তাঁর কুটীরে গিয়ে দেখা করে আসতেন এবং প্রত্যহ তাঁর জন্য প্রসাদ পাঠাতেন। হরিদাসের মৃত্যু হলে মহাপ্রভু তাঁর দেহ কোলে নিয়ে নৃত্য করেন এবং স্বহস্তে সমুদ্রতীরে তা সমাধিস্থ করেন। পরে তিনি আবার প্রসাদান্ন ভিক্ষা করে হরিদাসের নির্বাণোৎসব করেছিলেন।

পুরীধামে অবস্থান কালে মহাপ্রভুর অন্তরে ঈশ্বরবিরহ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় তাঁর ভক্তবৃন্দের তিনজন—পরমানন্দপুরী, রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন। দামোদর সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় তিনি জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান শুনিয়ে আশ্বস্ত করতেন। দিনের বেলায় চৈতন্য সপারিষদ কৃষ্ণ-

লীলাকাব্য পাঠ করে চিত্ত বিনোদন করতেন। এসময় তিনি ঈশ্বরপ্রেমে এমনই মাতোয়ারা হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর জাগরণ ও চেতনার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। উন্মাদের মত, বিরহীর মত, নিঃস্বের মত তিনি রোদন করতেন, কখন ভাবঘোরে শ্লোক আবৃত্তি করতেন। দিব্য-প্রেমের উদ্বেগ আর্তিতে দিনে দিনে তাঁর তনু ক্ষীণ হয়ে আসে। অব-শেষে আটচল্লিশ বছর বয়সে রথযাত্রার পরে (১৫৩০ খ্রীঃ) তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কে নানান মতবাদ-গল্পগুজব প্রচলিত আছে। কেহ বলেন তিনি ভাবাবেশে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করেন, কেহ বলেন (জয়ানন্দ) রথের উৎসবে নৃত্য করার সময় পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হয়ে শ্রীচৈতন্য অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তারপর তিনি লোকান্তরিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন পাণ্ডারা ঈর্ষাতুর হয়ে মন্দিরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে নিহত করে মন্দির প্রাঙ্গণেই তাঁকে সমাহিত করেন এবং প্রচার করে দেন চৈতন্যের দেহ জগন্নাথের শরীরে লীন হয়ে গিয়েছে। এই শেষোক্ত উক্তিটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র যাঁর অনুগত ভক্ত ছিলেন, পুরীর বহু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ওড়িয়া ভক্ত যাঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করতেন এবং জনসাধারণ যাঁকে জগন্নাথের সচল রূপ বলে মনে করতেন তাঁর উড়িয়া পাণ্ডাদের হাতে নিহত হতে হবে একথা ভাবাই যায় না। তবে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল সে সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয়নি। এজন্য এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ॥

চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নব প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করলেও আসলে তিনি কোন বিশেষ ধর্মতত্ত্ব বা মতবাদ প্রচার করে যাননি। তাঁর বিখ্যাত শিষ্য-প্রশিষ্যগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ আদর্শ, বিধি-বিধান নির্দেশ করে যান। চৈতন্য ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বহু পণ্ডিত ভক্ত-দার্শনিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরা চৈতন্যের অলোকসামান্য দিব্যকান্তি ও ঈশ্বরপ্রেম দর্শন করে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই

তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। পরে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যের আদর্শকে বিচার করে, আবার কেহ বা নির্বিচারে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন এবং লোকহিতের জন্য তা প্রচার করার গুরু দায়িত্ব বহন করেছিলেন। এরূপে চৈতন্যভক্তদের দ্বারা চৈতন্যের ধর্ম সমাজে প্রসারলাভ করে।

চৈতন্য ছিলেন প্রেমিক ভক্ত। তাঁর কাছে উচ্চ-নীচের কোন ভেদ ছিল না। তিনি মনে করতেন কৃষ্ণ সকল জীবের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত আছেন। কাজেই সব মানুষ সমান। দরিদ্র ভেবে, বিধর্মী ভেবে, নিম্নবর্ণের ভেবে, দীন-অভাগা ভেবে তিনি কোন মানুষকে দূরে ঠেলে রাখেন নি. সকলকেই তিনি প্রেমডোরে হৃদয়দ্বারে বেঁধে রেখেছিলেন। অদ্বৈতের ঘরে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেয়ে যেমন তিনি তৃপ্তি লাভ করতেন দরিদ্র শ্রীধরের ঘরে ফুটাপাত্রে জলপান করে তেমনি তিনি শান্তি পেতেন। যবন হরিদাসকে বিধর্মী বলে কখন ঘৃণা করেননি। মায়ের চেয়েও তাঁর প্রতি অধিক কর্তব্য তিনি পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে কোলে নিয়ে চৈতন্য নৃত্য করেছিলেন। হরিদাসের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তিনি নির্বাণোৎসবও করেছিলেন। গলিত কুষ্ঠ রোগীকে তিনি প্রেমাবেশে আলিঙ্গন দিতেন। হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালকে তিনি ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতেন। তাঁর মতে, যেমন নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য, তেমনি আবার 'সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য'। যিনি ভজনা করেন তিনিই বড় ভক্ত। কৃষ্ণভজনে কোন জাতি-কুলের বিচার নেই। নিম্নবর্ণে ও পরধর্মে মানুষকে ঘৃণা ত্যাগ করতে হবে। বৃক্ষের মত সহিষ্ণু. তৃণের মত সুনীচ হতে হবে। তবে মন হবে শুচি, চিত্ত হবে শুদ্ধ। শ্রদ্ধচিত্তে কৃষ্ণপ্রেম জাগলেই মানবজনম ধন্য কৃতার্থ হবে। শ্রীচৈতন্যের এই উদার আহ্বানে মদ্যপ, দুষ্ক্রিয়াসক্ত, পরম পাষণ্ডও সাড়া দিয়েছে। রাজা-মহারাজা ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-গুণী, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছে। সাধনার এমন সহজ পথ তাঁর পূর্বে আর কেউ নির্ণয় করতে পারেননি। শুধু হরিণাম কীর্তন করলেই জগতের সব দুঃখ তাপ দূর হয়ে যাবে। ভক্তের ডাক শুনলে ভগবান আপনি জীবকে উদ্ধার করবেন। মুমুক্ষু মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় আশার বাণী আর কি হতে পারে।

চৈতন্যদেব অন্তরঙ্গ ভক্তদের সংকেতে আটটি উপদেশ দিতেন। বৈষ্ণবদের পক্ষে ইহা একান্ত শিক্ষনীয় বলে এই আটটি উপদেশ শিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত। রূপগোস্বামীর পদ্যাবলী নামক সঙ্কলন গ্রন্থে এই আটটি শ্লোক চৈতন্যদেবের রচনা বলে গৃহীত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতকার শিক্ষনীয় এই আটটি শ্লোকের উপযোগিতা পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করে তাঁর মহামূল্য গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই আটটি শ্লোক পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও ইহারা পরস্পর নিরপেক্ষ নহে, সাপেক্ষ। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণবসমাজের ভক্তগণের চিত্ত চিন্তার ক্রমোন্নতি এবং পর্যায়ক্রমে শ্রেয় প্রাপ্তির বিধান রয়েছে। নিম্নে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করে ইহাদের তাৎপর্য নির্ণয় করা যাচ্ছে :

(১) চেতোদর্পণমার্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্ম-স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং ॥

দর্পণের সঙ্গে চিত্তের তুলনা করে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, দর্পণের মলিনতা দূর হয়ে গেলে ইহার নিকটবর্তী বস্তু যেরূপ ইহাতে প্রতিবিম্বিত হয় সেরূপ মানবচিত্ত হতে মালিন্য দূর হয়ে গেলে তাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। ঈশ্বর চিত্তের অতি নিকটস্থ বস্তু। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলেই মানবচিত্তের সন্নিকটবর্তী। কিন্তু মানবচিত্তে নানাপ্রকার সাংসারিক গ্লানি মলিনতা থাকায় ঈশ্বর স্বরূপ তাতে প্রতিবিম্বিত হতে পারে না। ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা চিত্তের এই মলিনতা দূরীভূত হলে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করে এবং মানবচিত্তে তখন সমুদয় জাগতিক দুঃখ দূরীভূত হয়ে এক অপূর্ব আনন্দোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হয়।

(২) নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপিদুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

ঈশ্বরের নামের প্রশংসা করে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের বহু নাম থাকলেও যিনি যে নাম ইচ্ছা করেন সেই নাম কীর্তনের দ্বারা তিনি ভগবানকে পেতে পারেন। কারণ, নাম ও নামী অভিন্ন। লৌকিক জগতে যদি কেহ এক পরোক্ষ ব্যক্তির নামোচ্চারণ করে তাহলে সেই ব্যক্তির প্রকৃত রূপ যেমন মুহূর্তের মধ্যে মনোমুকুরে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে

সেরূপ ঈশ্বরের যে কোন নামের দ্বারা তাঁকে স্মরণ করলে তাঁর স্বরূপটি মানসচক্ষে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এভাবে ক্রমাগত ঈশ্বরচিন্তার ফলে মানবচিত্তের যে অবস্থা অনুভূত হয় তা তৃতীয় শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

(৩) তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি ॥

ক্রমাগত ঈশ্বরচিন্তার ফলে মানুষের মন থেকে সংসার-গ্লানি দূর হয়ে যায়, মানুষ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তার মন থেকে তখন অভিমান, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তক্লেশকর বৃত্তি তিরোহিত হয়ে যায়। তখন সে তৃণের চেয়েও নম্র, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু হয়। চিত্তের এই অবস্থা শ্রেয় প্রাপ্তির পথে অত্যন্ত সহায়ক বলে ইহা একান্ত কাম্য।

(৪) ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

চিত্তের মলিনতা দূর হওয়ার পর মানুষ যখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। মন থেকে যখন সর্বপ্রকারের অহংকার দূর হয়ে যায় তখন সংসার সুখ তার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। এই জ্ঞানোদয়ের পরে মানুষ ধন-জন-সুন্দরী-কবিতা প্রভৃতি যে সমস্ত অহংকারের মূল উৎস সেগুলিকে পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে এবং সম্মুখে ঈশ্বরের চরণপঙ্কজ দেখতে পায়।

(৫) অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ফলে মানবচিত্তে যে ভাবের উদয় হয় তা এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে। জীবের আনন্দলাভ একমাত্র প্রেমসেবা দ্বারাই সম্ভব। কারণ রসস্বরূপকে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে—সম্বন্ধানুরূপ ভাবে তাঁকে পাওয়া, সেব্যরূপে তাঁকে পাওয়া। প্রেম জন্মিলেই জীব কৃষ্ণের সেবা করতে পারে। জীবের ইহাই একমাত্র পুরুষার্থ বা মুখ্যকাম্য বস্তু। সংসারে অনাসক্তি ও ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে মানবচিত্তে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় এবং তার যে পরিণতি অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা ও হৃদয়বিদারী বিলাপে তা ষষ্ঠ শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে।

(৬) নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

জীবের চিত্তে যে সাত্ত্বিকভাবের (স্বরভঙ্গ-অশ্রু-রোমাঞ্চ ইঃ) উদয় হয় তা চিত্তশুদ্ধির মূল। শুদ্ধচিত্তে যে প্রেমের আবির্ভাব হয় তার পরিণতি হয় পূর্ণ আত্মসমর্পণে। জীব তখন আপন সত্তা হারিয়ে ফেলে এবং সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে দেখতে পায় প্রেমাস্পদের স্বরূপ। প্রেমাস্পদের পূর্ণ প্রকাশে তার হৃদয়ভূমি তখন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু কোন সময়ে ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের জন্য যদি তার হৃদয়রাজ্য হতে প্রেমাস্পদের স্বরূপ তিরোহিত হয় তখন তার যে মানসিক অবস্থা হয় তা বর্ণিত হয়েছে সপ্তম শ্লোকে।

(৭) যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেন মে॥

প্রেমাস্পদের বিরহে এক নিমেষকাল এক যুগের বলে মনে হয়। নয়ন দুটি তখন অবিশ্রান্তবর্ষী বর্ষাকালের স্বরূপ ধারণ করে; সমস্ত জগৎ তখন শূন্য বলে মনে হয়। এভাবে একান্ত আত্মসমর্পণ যা বৈষ্ণবপদাবলীর রাধার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে, তা দ্বারা জীব আপন সত্তাকে অস্বী-কার করে প্রেমাস্পদে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। তার মন থেকে তখন এই ধ্বনিই সর্বক্ষণ উত্থিত হতে থাকে যে, সে নিজের যা কিছু সত্তা দূরে ফেলে চলে এসেছে; এখন তার মন-প্রাণের একমাত্র ভর্তা সেই প্রেমাস্পদ। এরূপ ঐকান্তিক ভাব প্রকাশ পেয়েছে অষ্টম শ্লোকে।

(৮) আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথাস্তু স এব নাপরঃ॥

অর্থাৎ তিনি এখন আমাকে আলিঙ্গনের দ্বারা আত্মসাৎ করুন, অথবা আমার দেহমনকে জর্জরিত করুন, তথাপি তিনি আমার প্রাণসর্বস্ব এবং সবচেয়ে আপন জন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মাধুর্য রসের ইহাই চরম পরাকাষ্ঠা। চৈতন্যদেব সাধনসমৃদ্ধ দিব্যোন্মাদময় শেষজীবনে ইহা উপলব্ধি করেছিলেন এবং ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের চরম ও পরম আলম্বন।

গৌড়ের অদ্বৈত-নিত্যানন্দ॥

গৌড়ের চৈতন্য-ভক্তদের (শ্রীবাস-চন্দ্রশেখর-জগদীশ-গোপীনাথ-গঙ্গাদাস-পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-মুকুন্দ-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-নরহরি প্রভৃতি) মধ্যে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রধান। বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য মহাপ্রভু এই দুজনকেই

উপযুক্ত পাত্র বলে মনে করেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রার পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য এবং তাঁর পত্নী সীতাদেবী বৈষ্ণব সমাজ পরিচালনা করার ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং খড়দহে (কলকাতার সাত-আট মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে নিত্যানন্দ ও তাঁর পত্নী জাহ্নবী দেবী, পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেছিলন। এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া শ্রীখণ্ডে (বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে) বৈষ্ণবদের আরও একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। ইহার নেতৃত্ব করতেন মুকুন্দ দাস ও নরহরি সরকার। কীর্তনে শ্রীখণ্ডসম্প্রদায়ের স্থান খুব উচ্চে ছিল।

অদ্বৈত আচার্য শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। ১৪৩৫ খ্রী: তিনি শ্রীহট্টের লাউড় পরগণায় নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতের বাল্যনাম কমলাক্ষ ভট্টাচার্য। বার বছর বয়সে তিনি শান্তিপুরে চলে আসেন। জ্যোতিষ, ষড়দর্শন ও চতুর্বেদে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ষড়দর্শন পড়ে তিনি অদ্বৈতপন্থী হয়ে পড়েছিলেন বলে বোধহয় তাঁর নাম পরে অদ্বৈত আচার্য হয়েছে। শান্তিপুরের অধিবাসী হয়ে তিনি নবদ্বীপে টোল খুলে ছাত্র পড়াতেন। এই টোলে চৈতন্যের বড় ভাই বিশ্বরূপ পড়তেন। খুব সম্ভব অদ্বৈতেরই উপদেশে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী হয়েছিলেন।

অদ্বৈত আচার্য

অদ্বৈত মূলত জ্ঞানবাদী ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে পরে তিনি ভক্তি-বাদী হয়ে পড়েছিলেন এবং শ্রীবাসের আঙ্গিনায় যে সব ভক্তিবাদী ভক্তের দল কৃষ্ণের স্মরণ-কীর্তন করতেন অদ্বৈত তার নেতৃত্ব করেছিলেন। সাধারণ বৈষ্ণবদের ধারণা অদ্বৈতেরই হুংকারে কৃষ্ণ শচীগর্ভে চৈতন্যরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন। অদ্বৈত বয়সে চৈতন্যের পিতৃতুল্য ছিলেন বলে চৈতন্যকে খুবই স্নেহ করতেন। নীলাচলে তিনি ভক্তবৃন্দসমক্ষে চৈতন্যকে 'নারায়ণ করুণা-সাগর' বলে ঘোষণা করে উদ্দাম নৃত্যগীত আরম্ভ করেছিলেন। চৈতন্যদেব কিন্তু এসব ব্যাপারকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারতেন না। তিনি ইহাতে খুবই বিব্রত বোধ করতেন। কেহ তাঁকে কৃষ্ণাবতার বললে তিনি রুষ্ট হতেন। তা সত্ত্বেও অদ্বৈত গৌড়ের ভক্তবৃন্দের কাছে চৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার বলে প্রচার করে যান এবং সকলে তা বিশ্বাস করেও নেয়।

অদ্বৈতের জীবৎকালে গুরুপদবী নিয়ে শান্তিপুরের সঙ্গে খড়দহের কিঞ্চিৎ বিরোধ ঘটে। নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা নিতে

গেলে নিত্যানন্দ-ভক্তগণ পথ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং বিমাতা জাহ্নবী দেবীর নিকটে শেষপর্যন্ত তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। অদ্বৈতের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী সীতাদেবী এবং সীতাদেবীর পর তাঁর পুত্রেরা শান্তিপুর বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন।

চৈতন্যভক্তদের মধ্যে নিত্যানন্দ ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। সাধারণ লোকে এখনও গৌর নামের সঙ্গে নিতাই নামটি উচ্চারণ করে থাকে এবং নিতাইকে গৌরের (নিমাই-এর) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলেই জানে। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগৃহে এখনও গৌর-নিতাই-এর দারুমূর্তি পূজিত হয়ে থাকে। ইহার কারণ, নিত্যানন্দ ছিলেন সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসী। আপামর জনসাধারণ ও আদ্বিজ-চণ্ডালের মধ্যে তিনি হরিণামামৃত বিতরণ করেছিলেন। ধর্মপ্রচারে নিত্যানন্দের যোগ্যতা সম্পর্কে মহাপ্রভু সম্যক্ অবহিত ছিলেন। সেকারণে তিনি ভাববিহ্বল অবস্থায় বলতেন,—'নিতাই আমাকে ধর।' একথা বলার অর্থ, মহাপ্রভু আপন অন্তরে ভগবদপ্রেমের যে মহিমা নিবিড় করে অনুভব করতেন জীব-উদ্ধারে নিতাইকে দিয়ে তার প্রচারের ইচ্ছা তিনি করতেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যের মনস্কামনা সিদ্ধ করেছিলেন। তিনি আশাতীতভাবে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচার করে গিয়েছেন।

নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দ ১৪৭৮ খ্রীঃ বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। কিশোর বয়সে নিত্যানন্দ এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে যান। প্রায় বিশ বছর তিনি তীর্থে তীর্থে ঘুরে সর্বপ্রকারের সংস্কার, আচার-বিচার, জাতি-পাঁতি উড়িয়ে দিয়ে সব মানুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছিলেন। বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার প্রভৃতি ঘুরে তিনি দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেন। এসময় মাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর প্রভাবে নিত্যানন্দ ভক্তি-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এদিকে নবদ্বীপে চৈতন্যের আবির্ভাবের সংবাদ পেয়ে তিনি ১৫০৯ খ্রীঃ নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দ দেখতে অনেকটা বিশ্বরূপের মত ছিলেন। এজন্য শচীদেবী তাঁকে নিজের ছেলের মত দেখতেন, ভক্তেরাও তাঁকে বলরামের অবতার বলে মনে করতে থাকেন।

নিত্যানন্দের হৃদয় ছিল কুসুমের মত কোমল। তাঁর মধ্যে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দয়া ইত্যাদি গুণের আধিক্য ছিল। দীন-অভাজন, দুষ্ক্রিয়াসক্ত মন্তপকে পর্যন্ত তিনি অকাতরে প্রেমের বশে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রকৃতভাবে প্রেমের পাবনীধারাকে শঙ্খধ্বনি করে আনয়ন করেছিলেন। জগাই-মাধাই-এর মত দুষ্কৃতচারী লম্পটকে পর্যন্ত তিনি কোল দিয়েছিলেন।

নিত্যানন্দ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে চৈতন্য মহিমা প্রচার করেন। তিনিই প্রথম চৈতন্যের বিগ্রহ পূজার প্রবর্তন করেন। পানিহাটি, সপ্তগ্রাম, আগরপাড়া কুমারহট্ট, খড়দহ, পাথরঘাটা ছত্রভোগ, বরাহনগর, চাতরা, পাঁচপাড়া, ফুলিয়া উদ্ধারণপুর, নৈহাটী প্রভৃতি স্থানে নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দসনে চৈতন্যমহিমা কীর্তন করে বেড়িয়েছেন। সমাজের অপাংক্তেয়—অন্ত্যজের প্রতি নিত্যানন্দের অপার করুণা বর্ষিত হয়েছিল; সপ্তগ্রামের সুবর্ণ বণিক উদ্ধারণ দত্তকে তিনি ভক্ত করে নিয়েছিলেন। এমনকি, শুনা যায়, খড়দহে নেড়ানেড়ীদেরও তিনি বৈষ্ণবসমাজে স্থান দিয়েছিলেন। জাতিপাঁতির ভেদকে তিনি একেবারে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। পানিহাটিতে তিনি ছত্রিশ জাতিকে চিড়াদধির ভোজে আহ্বান করেছিলেন। চৈতন্যভক্তদের মন এত উদার ও সংস্কারমুক্ত ছিল না। যার জন্য যবন হরিদাস ও সনাতনকে অন্যান্য ভক্তদের সংস্রব থেকে দূরে থাকতে হত।

নিত্যানন্দ শাস্ত্রের বিধি-বিধান বড় একটা মেনে চলতেন না। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও গৃহীর মত জীবনযাপন করতেন। তিনি বিলাসীর মত অলংকার পরতেন। তিনি শূদ্রের বাড়ীতে অবস্থান করতেন। চৈতন্য জানতেন ইহা নিত্যানন্দের বাইরের রূপ, তাঁর অন্তরের রূপ নির্মল।

চৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরে নিত্যানন্দ কালনার সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছাপ্পান্ন বছর। এই বিবাহের ফলে নিত্যানন্দ দুই পুত্র লাভ করেন। বসুধার গর্ভে জন্মায় বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র এবং জাহ্নবীর গর্ভে জন্মায় রামভদ্র। নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর জাহ্নবী দেবী এবং বীরভদ্র বৈষ্ণবসমাজের কর্ণধারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামিগণ চৈতন্যের ধর্মতত্ত্ব-দর্শন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে না গেলে যেমন বৈষ্ণবধর্মের এতটা প্রভাব বিস্তার লাভ করত না, তেমনি নিত্যানন্দও যদি আপামর জনসাধারণের মধ্যে

চৈতন্য মহিমা প্রচার করে না যেতেন তাহলে বৈষ্ণবধর্মের আদর্শ সমাজের কণায় কণায় এমন ওতপোতভাবে মিশ্রিত হয়ে যেত না।

উৎকলের বাসুদেব-রামানন্দ ॥

চৈতন্যদেব জীবনের শেষ আঠার বছর নীলাচলে কাটিয়েছিলেন। তাঁর দর্শন ও সঙ্গলাভের অভিলাষে বহু বিদ্বজ্জনের সমাবেশ ঘটেছিল নীলাচলে। যে সকল ভক্ত চৈতন্যের কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জনার্দন, কৃষ্ণদাস, শিখি মাহিতী, মুরারি মাহিতী, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, কাশী মিশ্র, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, বিষ্ণুদাস, পরমানন্দ, ভবানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর। এই তিনজন ভক্ত চৈতন্যের নিকটতম সাহচর্য লাভ করেছিলেন বলে ইঁহারা চৈতন্যের গূঢ় তত্ত্বকথার অনেক সংবাদ রাখতেন। চৈতন্যের লীলাতত্ত্ব অনুসরণ করে যে কড়চা স্বরূপ দামোদর রচনা করেছিলেন তা পাওয়া যায়নি। সেকারণে চৈতন্য লীলাতত্ত্ব ব্যাখ্যানে তাঁর অবদান কতখানি তা নির্ণয় করা দুরূহ। বাসুদেব সার্বভৌম এবং রায় রামানন্দ—এঁদের বিশদ পরিচয় চৈতন্যচরিতামৃতকার দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাসুদেব-রামানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

বাসুদেব সম্পর্কে নানা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। তিনি নবদ্বীপে টোল খুলেছিলেন। এখানে নাকি নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ ও চৈতন্য অধ্যয়ন করেছিলেন। ইহা কতখানি সত্য তা নির্ধারণ করা এখন সম্ভব নহে। শুনা যায় বাসুদেব মিথিলাতে গিয়ে পক্ষ-ধরের নব্যন্যায়গ্রন্থ 'চিন্তামণি' এবং উদয়নাচার্যের 'ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি' সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং টোল খুলে ছাত্রদের সে বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তাঁর প্রখ্যাত ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি বিদ্যাবুদ্ধিতে গুরুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান শাসকের ভয়ে বাসুদেব পুরীতে চলে যান। সেখানে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির নিপুণ পরিচয় লাভ করে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। শেষজীবনে বাসুদেব নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যের সঙ্গলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। চৈতন্য

বাসুদেব

দেবের সঙ্গে বাসুদেবের মিল যেমন মধুর তেমনি তাৎপর্যমণ্ডিত। বাসুদেব তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রবিদ ও বৈদান্তিক পণ্ডিত। বৈদান্তিক বাসুদেব প্রথমে দ্বৈতবাদী ভক্তির পথিক চৈতন্যকে ভক্তিমার্গ ত্যাগ করে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। সাতদিন ধরে বাসুদেব চৈতন্যের কাছে বেদান্ত-উপনিষদ ব্যাখ্যা করেন। সাতদিন ধরে চৈতন্যও নীরবে কেবল শুনেই গেলেন, কোন কথা বললেন না। চৈতন্যকে এভাবে সম্পূর্ণ নীরব দেখে বাসুদেব তাঁর তত্ত্বজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন,—

তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি।
সন্ন্যাসের ধর্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি ॥

চৈতন্যদেব বাসুদেবকে আরও বললেন, বাসুদেব বেদান্তসূত্রের প্রকৃত অর্থ গোপন করে, মুখ্যার্থকে বাদ দিয়ে কাল্পনিক অর্থদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। সেকারণে ইহা একদিকে যেমন শিষ্যদের কাছে বিভ্রান্তিকর, অন্যদিকে তেমনি উপনিষদেরও প্রকৃত অর্থবিরোধী। তিনি আরও বললেন, যেহেতু অভিধা অর্থাৎ মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে লাক্ষণিক অর্থকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সেহেতু তাঁর ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ। বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ। লাক্ষণিক অর্থ করলে ইহার স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হয়। দ্বিতীয়ত অদ্বৈতবাদী সাধকগণ ঈশ্বরকে যে নিরাকার বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তা ভ্রান্তধারণাপ্রসূত। কারণ, সকল বেদেই ব্রহ্মকে ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলে গণ্য করা হয়েছে। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করতে বেদ আরও বলেছেন, ঈশ্বরের হস্তপদ না থাকলেও গমনাগমন করতে পারেন, চক্ষু না থাকলেও দেখতে পান ; কর্ণ না থাকলেও শুনতে পান। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ঈশ্বর নিরাকার নহেন।

ইহার পর মহাপ্রভু একে একে বাসুদেবের নির্বিশেষবাদ, পরিণামবাদ ও তত্ত্বমসি-তত্ত্ব খণ্ডন করেন।

বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম নির্বিশেষ অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-দেহগুণাদি কোনরূপ বিশেষত্ব সূচক বস্তু ব্রহ্মের মধ্যে নেই। ইহাই অদ্বৈতবাদীদের মত। যে সমস্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হয়েছে সে সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সারমর্ম হল এই যে, ব্রহ্ম অশরীরী, মহা এবং বিভু (সর্বব্যাপী)। তিনি জীবশরীরে অবস্থান করেন। সার্বভৌমের ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বের এই ব্যাখ্যা শুনে শ্রীচৈতন্য বললেন, যেহেতু

ব্রহ্মবাচক পদের উত্তর অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক ব্যবহার করা হয়েছে যেহেতু ব্রহ্মকে নির্বিশেষ প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। শ্রুতিতে বলা হয়েছে —"যতো ইমানি ভূতানি জাতানি, যেন জীবন্তি যস্মিন্ লীয়ন্তে" অর্থাৎ যা হতে (অপাদান) জীব সমুদয় জন্মগ্রহণ করেছে, যা দ্বারা (করণ) বেঁচে আছে এবং যাতে (অধিকরণ) শেষপর্যন্ত লীন হয় সেই সত্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। ব্রহ্মে ব্যবহৃত এই তিনটি কারকই ভগবানের সবিশেষত্বের চিহ্ন। তাছাড়া যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হয়েছে তাতেই আবার বলা হচ্ছে,—ব্রহ্মের হস্তপদ না থাকলেও তিনি চলতে পারেন, গ্রহণ করতে পারেন; চক্ষু না থাকলেও তিনি দেখতে পান; কর্ণ না থাকলেও তিনি শুনতে পান। ব্রহ্ম যে সবিশেষ এগুলিই তার প্রমাণ। চৈতন্যদেব ইহার পর আরো বললেন যে ব্রহ্মের হস্তপদাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় না থাকলেও তাঁর অপ্রাকৃত (যা প্রকৃতি বা মায়ার অতীত তা অপ্রাকৃত) চক্ষুকর্ণাদি আছে।

সার্বভৌম এরপর সৃষ্টিতত্ত্বের কথা অবতারণা করে বললেন নিরাকার নিগুর্ণ ব্রহ্ম হতে কখন জগৎ সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং সবই মিথ্যা, মায়া প্রপঞ্চ। একথা বলার মূলে যুক্তি এই যে, ঈশ্বর থেকে যদি জগৎ সৃষ্টি হত অর্থাৎ জগৎ যদি ঈশ্বরের পরিণাম হত তাহলে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব থাকত না। মৃৎপিণ্ড থেকে মৃন্ময় পাত্র সৃষ্টি হলে পর মৃৎপিণ্ডের যেমন কোন অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম হলে ঈশ্বর নিত্য হতে পারতেন না, তাঁর পরিবর্তন হত। সুতরাং পরিণাম বাদ সত্য নহে। ইহার উত্তরে চৈতন্যদেব বললেন,—

পরিণামবাদ ব্যাসের সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তব অধিকার ॥

সুতরাং পরিণামবাদই সত্য এবং অদ্বৈতবাদীরা ঈশ্বরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য যে বিবর্তবাদ (ব্রহ্ম সত্য, অন্য সবই মিথ্যা) সৃষ্টি করেছেন তা তাঁদের সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত। মহাপ্রভুর মতে জগৎ মিথ্যা নয়, নশ্বর মাত্র।

বাসুদেব সার্বভৌম এরপর 'তত্ত্বমসি' (তৎ + ত্বম্ + অসি) মহাবাক্যের অবতারণা করে বললেন যে, 'তত্ত্বমসি' ('তৎ' অর্থ সেই ব্রহ্ম; 'ত্বম' অর্থ তুমি এবং 'অসি' অর্থ হইতেছ) মহাবাক্যের অর্থ হল—'জীব তুমি হচ্ছ ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে জীব ও ব্রহ্ম এক

এবং অভিন্ন। ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন 'তৎ' (ব্রহ্ম) ও 'ত্বম' (তুমি) এই দুই বস্তু কখনও এক হতে পারে না। কারণ 'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম হচ্ছেন সর্বব্যাপী নিত্যচৈতন্য এবং 'ত্বং' অর্থাৎ জীব হচ্ছে অনিত্য, অল্প চৈতন্যবিশিষ্ট ও সীমিত পরমাণুস্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব—এই দুয়ের বস্তু কখন এক হতে পারে না। অদ্বৈতবাদীগণ এই দুয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করার জন্য মুখ্য অর্থকে ছেড়ে লাক্ষণিক অর্থকে গ্রহণ করেছেন। ইহা তাই বেদবিরুদ্ধ। কারণ বেদ স্বতঃপ্রমাণ। মুখ্যার্থ ছাড়া লাক্ষণিক অর্থের স্থান বেদে নেই। কাজেই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের লাক্ষণিক অর্থ ভ্রান্ত। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন নয়. ইহাদের মধ্যে ভেদ রয়েছে। ভক্তিবাদের ভিত্তি ইহাই। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির নিকট এভাবে বাসুদেবের শুষ্ক বুদ্ধির পরাভব ঘটল।

চৈতন্যদেবের উৎকল ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রায় রামানন্দ। জাতিতে তিনি শূদ্র হলেও শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে চাকরি করতেন। উচ্চতর কার্যোপলক্ষে তিনি গোদাবরী তীরে রাজমহেন্দ্রীতে বাস করতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সমাপ্ত করে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হন। তখন এই দুই ভক্তিবাদী সাধকের মধ্যে নিভৃত রসতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ় নির্যাসটি তাতে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ চৈতন্য চরিতামৃতে এই রসতত্ত্বকে 'সাধ্য সাধনতত্ত্ব' নামে অভিহিত করেছেন।

রায় রামানন্দ

যে বস্তু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে থাকে সেই বস্তু হল সাধ্য এবং সাধ্যকে লাভ করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করতে হয় তার নাম হল সাধনা। জগতে মানুষের প্রধান কাম্য হল সুখ এবং দুঃখ নিবৃত্তি। সুতরাং এই সুখ এবং দুঃখ নিবৃত্তিই মানুষের কাম্য এবং সাধ্য। মানবজীবনে চরম কাম্য বা সাধ্য কি তা বিশেষভাবে জানার জন্য শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে সাধ্যবস্তুর স্বরূপ শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে অনুরোধ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন কাম্য বস্তুকে লাভ করলে জগতে মানুষ নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেবের এই প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ বললেন, স্বধর্মাচরণই চরম সুখলাভের একমাত্র উপায়। ধর্ম শব্দের অর্থ এখানে কর্তব্য। যাঁরা নিজ নিজ কর্তব্য সাধন করতে পারেন তাঁরা প্রকৃত সুখের অধিকারী

হন। ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব বললেন, ইহা অত্যন্ত বাইরের কথা। স্বধর্মাচরণ কখন সাধ্য হতে পারে না। কারণ, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি কর্তব্যানুষ্ঠানে যে সুখ বা আনন্দ জাত হয় তা চরম সাধ্যবস্তু হতে পারে না। কর্তব্যানুষ্ঠানের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করা যায়। কিন্তু এগুলির মধ্যে কামনার স্পর্শ আছে বলে এগুলি ভবিষ্যতে উপাদেয় না হয়ে হেয় বলে প্রতিপন্ন হয়। তাছাড়া এগুলি শাশ্বতও নয়। রামানন্দ তখন নিজবক্তব্যের সংস্কার করে বললেন, কৃষ্ণে যাবতীয় কর্ম অর্পণই পরম সাধ্যবস্তু। শ্রীচৈতন্য ইহাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন ইহাও বাইরের কথা। রামানন্দের এই উক্তিকে সারহীন বলার উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করার মধ্যেও কামনা আছে এবং তা হল কর্মবন্ধন হতে মুক্তির কামনা। রামানন্দ তখন বললেন, স্বধর্মত্যাগই সাধ্যসার। রামানন্দ গীতায় ভগবানের—"সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই উক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এই কথা বলেছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন, স্বধর্মত্যাগের মধ্যে পাপ থেকে মুক্তিলাভের বাসনা রয়েছে বলে ইহা কখন চরম সাধ্য হতে পারে না। অভিলাষের লেশমাত্র থাকলে তা কখন চরম সাধ্য হতে পারে না। রামানন্দ তখন বললেন, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার। জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানই চরম জ্ঞান। এর সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হলে তা চরম সাধ্যবস্তুতে পরিণত হয়। শ্রীচৈতন্য ইহাকেও বাহ্য বললেন। কারণ, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যই যদি চরম জ্ঞান হয় এবং তন্মিশ্রিত ভক্তি যদি জ্ঞানমিশ্রাভক্তি হয় তাহলে তা দ্বারা কখন প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যেখানে সেব্য-সেবক, উপাস্য-উপাসকের ভাব নেই সেখানে প্রেমভক্তি থাকতে পারে না। এজন্য ইহা (জ্ঞানমিশ্রাভক্তি) অসার। রামানন্দ তখন বললেন প্রেমভক্তি সাধ্যসাধনসার। প্রেম অর্থ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। ভক্তির অনুষ্ঠান করতে করতে শুদ্ধচিত্তে সেবা-বাসনা স্ফুরিত হয় এবং সেই বাসনা ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। এই প্রেমরূপা বাসনাদ্বারা যে ভগবৎ-সেবা তারই নাম প্রেমভক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব ইহাকে অসার বা যুক্তিহীন বললেন না বটে, কিন্তু তিনি ইহার চেয়ে আরো সূক্ষ্মতর কিছু জানতে চাইলেন। রামানন্দ তখন বললেন দাস্যপ্রেমই সর্বসাধ্যসার। এই উক্তির অভিপ্রায় হল এই যে, সংসারমুক্ত জীব সংসারের প্রতি বিরক্ত হয়ে যখন সংসার পরাঙ্মুখ হয় তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ে সর্বশক্তিমান পরমসত্তার উপর। সংসারের গ্লানির মধ্যে থেকে জীবের চিত্তের মধ্যে দুর্বলতা অনুপ্রবিষ্ট হয়

এবং ইহার জন্য সে পরম শক্তিশালী সত্তার কাছে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও হেয় বলে মনে করে। তখন তার চিত্তের মধ্যে যে বৃত্তির উদয় হয় তার নাম দাস্যবৃত্তি। যা আমরা সংসারিক জীবনে দেখতে পাই হীনতম দরিদ্রের ও শক্তিশালী ধনীপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে। এই দাস্যবৃত্তি নিয়ে সেবক পরম সত্তাকে উপাসনা করে এবং দাস্যভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়। শ্রীচৈতন্য ইহাপেক্ষা আরো সূক্ষ্মতর তত্ত্ব জানতে চাইলে রামানন্দ রায় বললেন, সখ্যপ্রেমই সর্বসাধ্যসার। একথা বলার অভিপ্রায় এই যে, বহুদিন সেবাকার্যের ফলে প্রভুজ্ঞানে মনিবজ্ঞানে যে গৌরববোধ ও সঙ্কোচ ছিল তা অন্তর্হিত হয়ে যে চিত্তবৃত্তির উদয় হল তাতে প্রেমের উৎকর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল এবং সেব্য-সেবকের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা ক্রমশ দূর হতে লাগল। এর চেয়ে আরো কোন সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আছে কিনা জানতে চাইলে রামানন্দ বললেন, বাৎসল্য প্রেমই সর্বসাধ্যসার। সেবকের উপাস্যের উপরে স্নেহ-মমতা আধিক্য এবং নিজেকে গুরুস্থানীয় মনে করে উপাস্যকে স্নেহপাত্রজ্ঞানে অনুগ্রহদান এবং তিরস্কারাদি বাৎসল্য প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা। এই অবস্থায় শান্তের একনিষ্ঠতা, দাস্যের সেবা এবং সখ্যের মমত্ববুদ্ধি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ইহাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তখন রামানন্দ বললেন, কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার। এই প্রেমে সেবক নিজেকে উপাস্যের উপভোগ্যের কান্তা মনে করে নিজের সমস্ত সুখ-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র উপাস্যের সম্ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য নিজাঙ্গ দান করে থাকে বলে এই প্রেমের নাম কান্তা প্রেম। কান্তা প্রেমেই শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অসংকোচভাব, বাৎসল্যের মমত্বাধিক্য ও লালন এ সমস্ত ত আছেই, অধিকন্তু উপাস্যের সুখের জন্য নিজাঙ্গ দিয়ে সেবাও রয়েছে। নিজসত্তাকে বিসর্জন দেওয়ার প্রবৃত্তি আছে বলেই এই প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ।

এজন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,—

কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

শ্রীচৈতন্য এই কান্তাপ্রেমকেই সর্বসাধ্যসার বলে স্বীকার করে নিলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীদের মধ্যে ইহার নাম মধুর রস এবং ইহাই পঞ্চম চরম ও পরম পুরুষার্থ।

বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামী ॥

শ্রীচৈতন্যের উপদেশে যাঁরা সংসারত্যাগী হয়ে বৃন্দাবনে ধর্মপ্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'ছয় গোসাঞি'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা গ্রন্থরচনা ও নিজ নিজ জীবনের আদর্শে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনকে একটা বিশিষ্ট দর্শনশাখারূপে গড়ে তুলেছিলেন যা পরবর্তিকালে একটি দার্শনিক মতবাদরূপে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করে। বাস্তবিকই বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে এই 'ছয় গোসাঞি'র শরণ লওয়া ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। প্রখ্যাত চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে ভক্তিপূর্ণভাবে এই 'ছয় গোসাঞি'র চরণ বন্দনা করেছেন :

> শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
> শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
> এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
> যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥

রঘুনাথ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের পুত্র। তপন মিশ্র পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে তপন মিশ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে সাধ্যসাধন বিষয়ে উপদেশ দেন। তাঁরই নির্দেশে তপন মিশ্র সপরিবারে কাশীবাসী হন। বৃন্দাবন গমনাগমনের সময় চৈতন্য দুবার কাশীতে তপন মিশ্রের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বালক রঘুনাথ সে সময় শ্রীচৈতন্যের পরিচর্যা করার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে রঘুনাথ মহাপ্রভুর সাহচর্য লাভের জন্য নীলাচলে উপস্থিত হন। নীলাচলে আট মাস থাকার পর মহাপ্রভু তাঁকে বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার জন্য এবং বৈষ্ণবস্থানে ভাগবত অধ্যয়ন করার জন্য পুনরায় কাশী পাঠিয়ে দেন। কাশীতে এসে রঘুনাথ চার বছর রইলেন। এসময়ের মধ্যে তিনি ভাগবতে পরম প্রাজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তারপর

রঘুনাথ ভট্ট (ভট্টাচার্য)

পিতামাতার মৃত্যুর পর সংসারের সব বন্ধন মোচন হলে রঘুনাথ আবার নীলাচলে ফিরে এলেন। আটমাস কাছে রেখে মহাপ্রভু রঘুনাথকে বললেন,—

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপ সনাতন॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান॥

এই বলে মহাপ্রভু জগন্নাথের তুলসীর মালা রঘুনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। বৃন্দাবনে ফিরে রঘুনাথ রূপ গোস্বামীর সভায় ভাগবত পাঠ করে সকলকে বিমুগ্ধ করলেন। রঘুনাথ একাধারে ভক্ত, সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে সেকথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন:

পিকস্বর কণ্ঠ তাহে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥

রঘুনাথ ছিলেন নাম-খ্যাতিহীন বিনয়ী ভক্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ সীমিত পরিসরের মধ্যে তাঁর জীবনচিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

গ্রামবার্তা নাহি শুনে না করে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজা দিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম নাহি শুনে কানে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে—এই মাত্র জানে॥

রঘুনাথ হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা গোবর্ধন দাস সপ্তগ্রাম মুলুকের অধিপতি ছিলেন। রঘুনাথ ছিলেন গোবর্ধনের একমাত্র পুত্র। বাল্যে তিনি অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হন। কিন্তু এসময় হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে রঘুনাথের সাক্ষাৎ হওয়ায় বাল্যেই রঘুনাথ বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে পড়েন। গোবর্ধন তখন রঘুনাথকে সংসার-মায়াজালে জড়িত করার জন্য এক পরমাসুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হল না। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য যখন শান্তিপুরে আসেন রঘুনাথ তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীচৈতন্য বুঝেছিলেন যে রঘুনাথের সংসার আশ্রম ত্যাগের সময় তখনও হয়নি। তাই তিনি কিশোরকে উপদেশ দিলেন—

রঘুনাথ দাস

স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধু কূল॥

মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।

চৈতন্যের উপদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে রঘুনাথ গৃহে ফিরে এলেন। গৃহের কাজকর্ম যথারীতি করতে লাগলেন। কিন্তু অন্তঃপুরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তরুণী স্ত্রীকে ত্যাগ করে তিনি বহির্বাটীতে মন্দিরে অবস্থান করলেন। বৃন্দাবন থেকে মহাপ্রভুর নীলাচলে ফেরার সংবাদ শুনে রঘুনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সুযোগ মিলল না। এরপর তিনি শুনলেন নিত্যানন্দ ঠাকুর ভক্তগণসনে পানিহাটীতে এসেছেন। পিতার অনুমতি নিয়ে রঘুনাথ নিত্যানন্দকে দর্শন করার মানসে চললেন পানিহাটীতে। রঘুনাথ প্রণাম করলে নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে তাঁকে আলিঙ্গন দান করে আশীর্বাদ করে বললেন,—

নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে।।
দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ মনে।।

রঘুনাথ বাইরে বিষয়ীর মত আচরণ করলেও অন্তরে ছিলেন সংসার-বিরাগী শুদ্ধচিত্ত পরম ঈশ্বরভক্ত। এজন্য নিত্যানন্দের ভাষায় তিনি 'চোরা'। নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ বহু অর্থ ব্যয় করে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভক্তদের চিঁড়াদধি ভোজন করালেন। চিঁড়াদধির পর সকলকে মালাচন্দনে ভূষিত করা হল। ইহাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'চিঁড়াদধি-মহোৎসব'।

মহোৎসব সমাপনান্তে রঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন। পিতামাতা তাঁকে চোখে চোখে রেখেছেন, প্রহরী নিযুক্ত করেছেন পাছে তিনি মহাপ্রভুর কাছে পালিয়ে যান। সর্বদা তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কেমন করে পিতামাতা-রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। এদিকে ভক্তগণ রথের পূর্বে নীলাচল যাত্রা করল। রঘুনাথ তাঁদের সঙ্গে গেলেন না। কারণ তিনি জানেন, মাঝপথ থেকে প্রহরীরা আবার তাঁকে বেঁধে ঘরে আনতে পারেন। তখন রঘুনাথ একদিন সুকৌশলে রক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে নীলাচলগামী ভক্তদের সঙ্গ ছেড়ে অজ্ঞাত

বিপজ্জনক পথে প্রায় অভুক্ত অবস্থায় শীর্ণ দেহে নীলাচলে উপস্থিত হলেন। তরুণ ভক্তকে পেয়ে খুশি হয়ে চৈতন্য—

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা—আর্দ্রচিত্ত হঞা॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥

রঘুনাথ স্বরূপ দামোদরের কাছে বৈষ্ণব দর্শন ও চৈতন্যতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে লাগলেন। মহাপ্রভুও স্বরচিত শিক্ষাষ্টক'টি সংক্ষেপে রঘুনাথকে বুঝিয়ে বললেন। রঘুনাথ ক্রমে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। অশন-বসনে নিতান্ত উদাসীন হয়ে পড়লেন। প্রথমে ভিক্ষা করে খেতেন। পরে তাও ছেড়ে দিয়ে পরিত্যক্ত অন্নব্যঞ্জন কুড়িয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাই খেয়ে কোনরকমে জীবনধারণ করতে লাগলেন। রাতদিন ঈশ্বরচিন্তা ও নামসঙ্কীর্তনে মত্ত হয়ে রইলেন। চৈতন্য তাঁর দুটি প্রিয় বস্তু—গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ সেই শিলা পূজা করতে লাগলেন। চৈতন্য ও স্বরূপ দামোদরের তিরোধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে চলে যান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রঘুনাথ কঠোর বৈরাগ্য আচরণ করে গিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শেষ জীবনে তাঁর পরিচর্যা করতেন। বৃন্দাবনে রঘুনাথের শেষজীবন কিভাবে কেটেছিল তিনি তা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন :

সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষ নাম।
সহস্র বৈষ্ণবে করে নিত্য পরণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণ নাম যে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন মান॥
সাধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥

রঘুনাথ দাসের নামে অনেকগুলি স্তোত্র ও কবিতা পাওয়া গিয়েছে। এগুলি সব সংস্কৃতে রচনা। 'মুক্তাচরিত্র' এবং 'দানকেলিকৌমুদী' নামে দুখানা ক্ষুদ্র কাব্যও তিনি রচনা করেছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যবৃক্ষের শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে গোপাল ভট্টের নাম

সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করলেও গোপালভট্ট সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। গোপাল একজন নিষ্ঠাবান বিনয়ী ভক্ত ছিলেন। রূপ সনাতন মুসলমান-সহবাসে কিছুকাল ছিলেন বলে তাঁরা গুরুগিরি করতে অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করতেন। একারণে গোপালভট্টের উপরেই মন্ত্রদান ও গুরূপদেশের গুরুভার ন্যস্ত হয়েছিল। গোপালভট্ট দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে গিয়ে শ্রীরঙ্গমে ত্রিমল্ল ভট্টের গৃহে চারমাস অবস্থান করেন। কবিরাজ গোস্বামী আবার অন্যত্র বলেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণভারত ভ্রমণ কালে কাবেরী নদীতে স্নানাদি করার পর রঙ্গনাথের মন্দির দর্শন করে বেঙ্কট ভট্টের নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর গৃহেতেই চারমাস অবস্থান করেন। একই গ্রন্থের মধ্যে একই ঘটনাকে এভাবে দুরকম করে বর্ণনা করায় ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 'প্রেম-বিলাস' প্রণেতা নিত্যানন্দ দাস, 'অনুরাগবল্লী' প্রণেতা মনোহর দাস এবং 'ভক্তিরত্নাকর' প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী—এই সমস্ত বৈষ্ণব লেখকগণের পরিবেশিত তথ্যাদি বিচার করে এটুকু অনুমান করা যায় যে, ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী—এঁরা তিনজন সহোদর এবং গোপাল ভট্ট বেঙ্কট ভট্টের পুত্র ছিলেন। এঁরা সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করতেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে ইঁহারা আবার রাধাকৃষ্ণের পরম ভক্ত হয়ে যান এবং এসময় গোপাল ভট্টও মহাপ্রভুর অনুরাগী ভক্ত হয়ে পড়েন। পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছে শিক্ষালাভ করে গোপালভট্ট মহাপ্রভুর নির্দেশে বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং সেখানে রূপ-সনাতনের সাহচর্যে বাস করেন। গোপাল ভট্ট 'হরিভক্তি-বিলাস' নামে একখানি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিকে কুড়িটি বিলাসে (অধ্যায়ে) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচার-আচরণ, সামাজিক বিধিবিধান, কৃত্য প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে—ইহার কোন স্থলে, রাধার উল্লেখ নেই; এমনকি বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় 'রাসযাত্রা'রও কোন বর্ণনা ইহাতে নেই। কৃষ্ণকে এখানে চক্রধারী চতুর্ভুজরূপে বর্ণনা করা হয়েছে; বৃন্দাবনের রাধিকা-রমণ মুরলীধরের রূপ এখানে অনুপস্থিত। কবিরাজ গোস্বামী আবার 'হরিভক্তিবিলাস' সনাতন গোস্বামীর রচনা বলে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র

গোপাল ভট্ট

দু-এক স্থলে উল্লেখ করেছেন। মনোহর দাসের মতে গ্রন্থটির খসড়া রচনা করে দেন সনাতন গোস্বামী। গোপালভট্টের জীবনী সম্পর্কে এপর্যন্ত কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কোন লেখক বিশদভাবে বিস্তৃতভাবে তাঁর পরিচয় দিয়ে যাননি। অথচ বৈষ্ণব সমাজে গোপাল ভট্টের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। এর কারণ হয়ত নরহরি চক্রবর্তী তাঁর 'ভক্তি-রত্নাকরে' যা বলেছেন তাইই :

শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥
কেন নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে।
নিরন্তর অতিদীন মানে আপনারে॥
কবিরাজ তার আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবার।
নামমাত্র লিখে না করে প্রচার॥

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর মধ্যে সনাতন, রূপ ও জীবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করে বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছিলেন। ইঁহারা সকলেই কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ—ভূস্বামীর সন্তান ছিলেন। কয়েক পুরুষ বাংলা দেশে থেকে ইঁহারা একপ্রকার বাঙালী হয়েই গিয়েছিলেন। সনাতনের পিতা কুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান ছিল। তাঁদের মধ্যে সনাতন, রূপ ও অনুপম (অপর নাম বল্লব) বিখ্যাত। জীব গোস্বামী অনুপমেরই পুত্র। সনাতন এবং রূপ হুসেন শাহের উর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন এবং অনুপম ছিলেন টাঁকশালের অধ্যক্ষ। প্রচুর ধনজন ও প্রতিষ্ঠালাভ করে তাঁরা গৌড়ের নিকটে রামকেলি গ্রামে বাস করতেন। হুসেন শাহের কর্মচারী থাকাকালীন সনাতনের উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং রূপের উপাধি ছিল 'দবির খাস'।

সনাতন গোস্বামী

চৈতন্যদেব গৌড়ে এলে রামকেলিতে সনাতনের সঙ্গে তাঁর প্রথম মিলন হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সনাতন আর রাজকার্যে মন বসাতে পারলেন না। অসুস্থতার ভান করে তিনি ঘরে বসে রইলেন। হুসেন শাহ তাঁকে উড়িষ্যা-অভিযানে সঙ্গে যেতে বললেন। সনাতন জানতেন হুসেন শাহ উড়িষ্যার তীর্থ মন্দির ও দেবদেবী ধ্বংস করতে চলেছেন। তাই তিনি রাজার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন :

তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা ভাঙিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে।

হুসেন শাহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সনাতনকে কারাগারে বন্দী করে রেখে অভিযানে বেরিয়ে গেলেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সনাতন তখন কারাধ্যক্ষকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে একেবারে কাশীতে গিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হলেন। চৈতন্য পরম প্রীত হয়ে সনাতনকে শিক্ষা দান করলেন। জীবের অধ্যাত্মিক মুক্তিকে অবলম্বন করে সনাতন শ্রীচৈতন্যকে যে তিনটি প্রশ্ন করেন, সেই তিনটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য যা বলেছিলেন তা সনাতনের শিক্ষা নামে অভিহিত। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার বিংশ অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী বিশদভাবে ইহা আলোচনা করেছেন। সনাতনের প্রশ্নত্রয় হল এই—

কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়।।

অর্থাৎ প্রথম প্রশ্ন, আমি স্বরূপত কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার দুঃখ দ্বারা নিষ্পিষ্ট হই কেন? তৃতীয় প্রশ্ন, ইহা হতে মুক্তিলাভের উপায় কি?

প্রথম প্রশ্নের স্বরূপ হল এই যে, যাকে 'আমি' বলে জানি তা প্রকৃত এই দেহ কিনা অথবা ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অন্য কোন বস্তু কিনা তাইই জিজ্ঞাস্য। দেহের সঙ্গে মন ও অপর ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক রয়েছে; মন আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করছে। এখন এই দেহ অথবা ইন্দ্রিয় সমন্বিত দেহ জীবের প্রকৃত স্বরূপ কিনা তাই প্রথম অনুসন্ধানের বিষয়। ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।

অর্থাৎ আনন্দময় কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি হতে জীবের উৎপত্তি। জীব ঈশ্বরের তটস্থা শক্তি। জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভেদাভেদ (অর্থাৎ ভেদও বটে, আবার অভেদও বটে)। যেমন, মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় বস্তুর সম্বন্ধ। মৃৎপিণ্ড থেকে মৃন্ময় বস্তুর উদ্ভব। কিন্তু মৃৎপিণ্ডের সঙ্গে মৃন্ময় বস্তুর সম্বন্ধ আকারে ভিন্ন। আবার উভয়ে মৃত্তিকা ব্যতীত অন্য কিছু নয় বলে উভয়ে স্বরূপত অভিন্নও বটে। সেরূপ শক্তিমান ঈশ্বর হতে জীবের উৎপত্তি বলে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক

স্বরূপত অভিন্ন, কিন্তু আকারে ভিন্ন। ঈশ্বর ব্যাপক, জীব অব্যাপক। জীব ঈশ্বরের আনন্দময় সত্তা হতে উদ্ভূত বলে জীবের মধ্যে সেই আনন্দের মাত্রা বিদ্যমান রয়েছে, জীব সর্বদা সেই আনন্দসমুদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জীব তাই কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবকর্তৃক এই কৃষ্ণের সেবাতেই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধের চরম স্বার্থকতা।

সংসারে মানুষ তিনপ্রকার দুঃখ ভোগ করে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন,—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

ঈশ্বরের প্রতি জীবের টান স্বাভাবিক। যেমন নদীস্রোতের টান সমুদ্রের প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করার নাম অন্তরমুখতা এবং তাঁকে ভুলে অন্য বস্তুতে মনোনিবেশ করার অর্থ বহির্মুখতা। নদীর গতি সমুদ্রের প্রতি না হয়ে যদি মরু-প্রান্তরের দিকে হয় তাহলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেরূপ ঈশ্বরের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা ত্যাগ করে জীব যদি মায়িক সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে তাকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিনপ্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই ত্রিতাপ থেকে উদ্ধার পেতে হলে কৃষ্ণের নিত্যসম্বন্ধের স্মৃতিকে জাগ্রত করার প্রয়োজন। এই স্মৃতিকে জাগ্রত করার উপায় হচ্ছে জীবের মুখ্য কর্তব্য—ইহাই অভিধেয়। কৃষ্ণভক্তিতে এই স্মৃতি জাগ্রত হয়। তাই 'কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান'।

সনাতনের তৃতীয় প্রশ্নের অভিপ্রায় হল এই যে, কৃষ্ণোন্মুখ হলেই যদি সংসারের যাবতীয় দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তাহলে জীবের মধ্যে সেই কৃষ্ণোন্মুখতা কিভাবে স্ফুরিত হতে পারে এবং সেবিষয়ে মানুষের কি করা কর্তব্য। ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বললেন,—

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হলেই তার চিত্ত নির্মল হয়। পরিষ্কৃত দর্পণের উপর যেরূপ বিশুদ্ধ প্রতিবিম্ব পড়ে সেরূপ জীবের নির্মল চিত্তে ঈশ্বরস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। এ অবস্থায় রসস্বরূপ ভূমা কৃষ্ণকে পেলে জীব বাস্তবিক সুখী হতে পারে, অন্যকিছুতে নয়। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে—'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' অর্থাৎ ভগবান প্রেমময় রস-স্বরূপ; রসস্বরূপ

পরতত্ত্ব-বস্তুকে পেলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরম তৃপ্তিলাভ হতে পারে, জীব আনন্দী হতে পারে।

জীবের এই আনন্দলাভ একমাত্র প্রেমসেবা দ্বারাই সম্ভব। কারণ রস-স্বরূপকে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্বন্ধানুরূপ ভাবে তাঁকে পাওয়া। প্রেমলাভ হলেই জীব কৃষ্ণের সেবা করতে পারে। জীবের ইহাই একমাত্র পুরুষার্থ বা কাম্যবস্তু। এজন্য প্রেমকে মুখ্য প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হয়।

চৈতন্য সনাতনকে বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে বললেন,—

তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তিস্মৃতি শাস্ত্রে কবি করিহ প্রচার॥

চৈতন্য নীলাচলে ফিরে এলেন। সনাতন বৃন্দাবনে কিছুকাল থেকে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য নীলাচলে উপস্থিত হলেন। সনাতন রাজকার্যের অনুরোধে পূর্বে মুসলমানের সাহচর্যে ছিলেন বলে নিজেকে হীন মনে করতেন। তিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যেতেন না। হরিদাসের গৃহে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। সনাতনের এই সঙ্কোচ ভাব লক্ষ্য করে কেহ কেহ মনে করেন সনাতন সুলতানের অধীনে চাকর করে মুসলমান উপাধি ও আচার-আচরণ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নয়। বিনয়বশত সনাতন মনের মধ্যে এরূপ দীনভাব পোষণ করে থাকতেন। সনাতন বৃন্দাবনে প্রস্থান করে মহাপ্রভুর নির্দেশমত লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধার এবং বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন প্রচার করেন। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি লোকান্তরিত হন।

সনাতন গোস্বামী কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে যান। ইহাদের নাম 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃত', 'হরিভক্তিবিলাস', 'লীলাস্তব' বা 'দশম চরিত', ও 'বৈষ্ণব-তোষণী'। 'বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে' গৌড়ীয় তত্ত্ব-দর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছে। 'হরিভক্তিবিলাস' খুব সম্ভব গোপাল ভট্টের রচনা। তবে ইহাতে সনাতনের কিছুটা হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে। এসম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 'লীলাস্তব' বা 'দশমচরিত' গ্রন্থখানি পাওয়া যায়নি। সনাতনের 'বৈষ্ণবতোষণী' গ্রন্থখানি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা।

নীলাচল থেকে মহাপ্রভু বাংলাদেশে এলে রামকেলিতে শ্রীরূপ-সনাতম তাঁর চরণ দর্শন করেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপ-সনাতনের কথোপকথনের পর

তাঁদের মনে বিষয়ত্যাগের চিন্তা উদিত হয়। তাঁরা ঠিক করে ফেললেন রাজকর্ম ত্যাগ করে চৈতন্যের ভক্ত হয়ে যাবেন। রূপ প্রথমে পলায়ন করে প্রয়াগে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

রূপ গোস্বামী

মহাপ্রভু দশদিন ধরে রূপকে ভক্তিতত্ত্বাদি শিক্ষা দিয়ে ভক্তিতত্ত্ব প্রচারের জন্য তাঁকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। রূপ ইহার পরে নীলাচলে গিয়ে কয়েকমাস মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে থাকেন। পুনরায়, মহাপ্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলে বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করেন এবং বহু ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রূপগোস্বামী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কেবল নির্জনে বসে তিনি আত্মানন্দ লাভ করার জন্য সাধন-ভজন-পূজনে ব্যাপৃত ছিলেন না, ভক্তজন ভূলোকহিতের জন্য তিনি ধর্ম-সাহিত্য-দর্শনের চর্চাও করে গিয়েছেন। ধর্ম-সাধনার সঙ্গে সাহিত্যসাধনার এমন মণিকাঞ্চন যোগ বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। তিনি 'হংসদূত', 'উদ্ধব সন্দেশ' ও 'স্তবমালা' রচনা করে কবিত্বশক্তির পরিচয় রেখে গিয়েছেন; তিনি 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেলি কৌমুদী' রচনা করে নাট্যকারের কীর্তি রেখে গিয়েছেন; তিনি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' রচনা করে রসতত্ত্ব ও অলংকার-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন; তিনি 'পদ্যাবলী' রচনা করে কাব্যরসিকতার, 'নাটকচান্দ্রিকা' রচনা করে নাট্যতত্ত্বজ্ঞানের এবং 'ভাগবতামৃত' রচনা করে ধর্মতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এগুলি ছাড়া রূপ গোস্বামী 'শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা' 'কৃষ্ণজন্মতিথি,' 'গোবিন্দ বিরুদাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে যান। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হ'ল।

'হংসদূত' কাব্যে বিরহশীর্ণা রাধার হৃদয়বারতা শ্বেত হংসদূতের সাহায্যে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় কৃষ্ণের কাছে প্রেরণের, বৃন্দাবন থেকে মথুরা পর্যন্ত পথসৌন্দর্যের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'উদ্ধবসন্দেশ'ও একখানি উৎকৃষ্ট দূতকাব্য। ইহাতে উদ্ধবকে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে দূত করে পাঠানর বৃত্তান্ত অলংকারমণ্ডিত ভাষায় বিবৃত হয়েছে। 'স্তবমালা'র মধ্যে রূপ আলংকারিক নৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তির বিচিত্র বিকাশ দেখিয়েছেন। ইহার চৌষট্টিটি স্তবে চৈতন্য বন্দনা ও রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা স্থান পেয়েছে।

কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অবলম্বন করে রূপ 'বিদগ্ধমাধব' এবং বৃন্দাবনলীলা,

মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা অবলম্বন করে 'ললিতমাধব' নাটক রচনা করেন। 'ললিতমাধব' দশাঙ্কে পরিসমাপ্ত একখানি বৃহৎ নাটক।

রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলী' একখানি বিখ্যাত কাব্যসঙ্কলন গ্রন্থ। ইহাতে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক ও দ্বৈতবাদী ভক্তিসম্বলিত প্রাচীন ও নবীন কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। বৈষ্ণব সমাজে এই কাব্যগ্রন্থখানির সমাদর সেকারণে অধিক।

রূপগোস্বামীর প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ ঘটেছে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও উজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থে। মানবমনীষার উল্লেখ্য নিদর্শন আছে এই দুখানি গ্রন্থে। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম—এই চারি বিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে আবার অনেকগুলি 'লহরী' বা উপ-পরিচ্ছেদ আছে। পূর্ব বিভাগে চার লহরীতে ভক্তিকথা বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রথম লহরীতে সামান্যভক্তি, দ্বিতীয় লহরীতে সাধনভক্তি, তৃতীয় লহরীতে ভাবভক্তি এবং চতুর্থ লহরীতে প্রেমভক্তির কথা আলোচিত হয়েছে। দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাবের শ্রেণীবিন্যাস, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা, পশ্চিম বিভাগে শান্ত, প্রীতি, অদ্ভুত, বাৎসল্য ও মধুর বা উজ্জ্বল—এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরসের পরিচয় এবং উত্তর বিভাগে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটি গৌণ ভক্তি-রসের বর্ণনা রয়েছে।

রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে মধুর বা উজ্জ্বল রসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। নীলমণি অর্থাৎ কৃষ্ণের উজ্জ্বল বা মধুর রস ইহাতে বর্ণিত হয়েছে বলে ইহার নাম 'উজ্জ্বলনীলমণি।' উজ্জ্বল রসের স্থায়ী ভাব হল 'প্রিয়তা' বা 'মধুর রতি।' 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এই মধুরা রতির সাতটি পর্যায় পরিকল্পিত হয়েছে,—(১) প্রেম (ভাববন্ধনের বীজ অর্থাৎ প্রীতির মূল); (২) স্নেহ (প্রেমের উর্ধ্বতর। হৃদয়-দ্রাবণ ইহার প্রধান লক্ষণ) (৩) মান (প্রেমে ঔদাসীন্য থেকে আক্ষেপাতিরেক এবং তা থেকে জন্ম মানের); (৪) প্রণয় (বন্ধুর বিশ্বস্ততা); (৫) রাগ (প্রেমবেদনার আনন্দে রূপান্তর); (৬) অনুরাগ (নিত্যনব প্রেম); (৭) ভাব বা মহাভাব (প্রেমের পরাকাষ্ঠা—ব্রজগোপীরা যে প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন)।

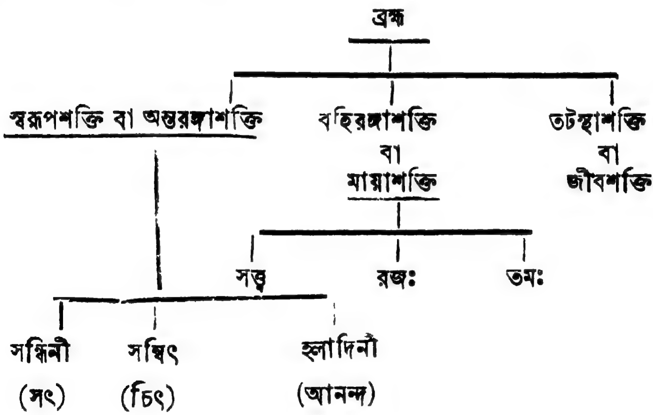
রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' যে পরবর্তিকালের বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্য-দর্শনকে পরিপুষ্ট করে তোলে তা অবশ্যস্বীকার্য।

সনাতন ছিলেন মূলত ভাষ্যকার, রূপ কবি ও রসবেত্তা এবং জীব ছিলেন দার্শনিক। জীব গোস্বামীর মধ্যে সংগঠনী প্রতিভা ছিল। জ্যেষ্ঠতাতদের গ্রন্থগুলি বাংলাদেশে প্রচার এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দর্শনতত্ত্ব বিষয়ে সন্দেহ নিরসন—এই দুই কাজ তিনি করেছিলেন। বাল্যকাল থেকে জীব পিতা (অনুপম) ও জ্যেষ্ঠতাতদের (রূপ-সনাতন) কাছে চৈতন্যকথামৃত শুনতে শুনতে সংসারবিরাগী হয়ে উঠেছিলেন। কিশোর বয়সেই জীব মস্তক মুণ্ডন করে গৈরিক বসন পরিহিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি নবদ্বীপে নিত্যানন্দ-সন্নিধানে উপস্থিত হন এবং তারপর তাঁর নির্দেশে তিনি কাশীধামে গিয়ে মধুসূদন বিদ্যা-বাচস্পতির কাছে ব্যাকরণ-স্মৃতি-বেদান্ত পাঠ করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে জীব বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে দীক্ষা দান করেন। জ্যেষ্ঠতাতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীব এরপর দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'গোপালচম্পূ,' 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম,' 'মাধবমহোৎসব,' 'গোপালবিরুদাবলী, কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ,' 'সূত্রমালিকা' (ব্যাকরণ), 'রসামৃত শেষ,' 'দুর্গমসঙ্গমণি,' 'লোচনরোচনী' তাঁর ব্যাকরণ-রসশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের স্মৃতি বহন করছে। 'কৃষ্ণার্চাদীপিকা,' 'গোপালতাপনী,' 'ব্রহ্মসংহিতা,' 'ক্রমসন্দর্ভ' ও 'লঘুতোষণী'তে তাঁর বৈষ্ণবস্মৃতি ও ধর্মতত্ত্বে অধিকারের পরিচয় বিদ্যমান রয়েছে। 'ভাগবত-সন্দর্ভ' বা 'ষট্সন্দর্ভ' ও 'সর্বসংবাদিনী'তে তাঁর বৈষ্ণবদর্শনপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে। নিম্নে জীবগোস্বামীর প্রধান প্রধান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

জীব গোস্বামী

জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' সত্তর অধ্যায়ে সমাপ্ত একখানি গদ্যপদ্যময় বিরাট কাব্যগ্রন্থ। পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ—এই দুই খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত। পূর্বার্ধে কৃষ্ণের বাল্য-কৈশোরলীলা এবং উত্তরার্ধে কৃষ্ণের মথুরা-দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। জীবগোস্বামীর 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় গ্রন্থ। ইহাতে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি এসে মিলিত হয়েছে। ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে করতে ভক্তছাত্রেরা যাতে কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে পারে সেজন্য তিনি কৌশলে উদাহরণস্থলে রাধাকৃষ্ণাদির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। জীবগোস্বামীর সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি হল 'ভাগবতসন্দর্ভ।' ইহা 'তত্ত্বসন্দর্ভ,' 'ভগবৎসন্দর্ভ,' 'পরমাত্মসন্দর্ভ,' 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ,' 'ভক্তিসন্দর্ভ' ও 'প্রীতিসন্দর্ভ'—এই ছয় খণ্ডে বিভক্ত।

'ভাগবতসন্দর্ভে' মূলত ভাগবতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। ইহার 'তত্ত্বসন্দর্ভে' ন্যায়শাস্ত্রের বিবিধ প্রমাণ আলোচিত হয়েছে। 'ভগবৎসন্দর্ভে' ভগবানের স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। ব্রহ্মের শক্তি ত্রিবিধ—স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি এবং তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি। স্বরূপ শক্তির আবার বৃত্তি তিনটি—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। সন্ধিনী হল ভগবানের সৎ-অংশের শক্তি। ইহাদ্বারা ব্রহ্ম নিজের ও অপরের সত্তাকে ধারণ করেন এবং অপরের সত্তা দান করেন। সম্বিৎ হল ব্রহ্মের চিৎ-অংশের শক্তি। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হয়ে যা দ্বারা নিজেকে জানেন ও অপরকে জানিয়ে থাকেন তার নাম সম্বিৎ শক্তি। হ্লাদিনী হল ভগবানের আনন্দ-অংশের শক্তি। ব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হয়ে ইহা দ্বারা নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন ও অন্যকে আনন্দ আস্বাদন করিয়ে থাকেন। ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি ও বৃত্তিকে নিম্নে তালিকা দ্বারা স্পষ্ট করা যাচ্ছে :



'পরমাত্ম সন্দর্ভে' জীবশক্তি ও মায়াশক্তি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। জীবশক্তি স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয় বলে ইহাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। সমুদ্রের তট যেমন সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার উচ্চ তীরেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, উভয় হতে একটা পৃথক স্থান, সেরূপ। অনন্ত কোটি জীব ভগবানের জীবশক্তির অংশ। স্বয়ং ভগবান সূর্যমণ্ডল-তুল্য এবং এই পরিদৃশ্যমান জগতের জীবগণ তাঁর রশ্মিতুল্য। রশ্মি সূর্য-মণ্ডলের বাইরে, যদিও তা সূর্যেরই অংশ। সূর্যমণ্ডলের মধ্যে রশ্মি থাকে না। তদ্রূপ জীব ঈশ্বরের অংশ হলেও ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে থাকে না,

বাইরে থাকে। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ আছে বটে, আবার অভেদ আছেও বটে। এই তত্ত্ব তাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তিভূমি। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি (স্বরূপ শক্তি) হলেও মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, ব্রহ্মের বাইরে মায়ার অবস্থিতি। মায়াকে এজন্য ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার কার্যস্থল এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়ার বৈভব।

'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে' কৃষ্ণের পরিকর ও বাসস্থানের আলোচনা, 'ভক্তিসন্দর্ভে' কৃষ্ণভক্তির বর্ণনা এবং 'প্রীতিসন্দর্ভে' ভগবানের প্রতি প্রীতি বা প্রেমভক্তির প্রয়োজন-ব্যাখ্যা স্থান পেয়েছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও চৈতন্যদেব ॥

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। কেহ কেহ তাঁকে কৃষ্ণাবতার, আবার কেহ কেহ তাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলে বন্দনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা ধর্মগ্রন্থ, দর্শনগ্রন্থ, ভক্তিশাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্রে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে যেরূপ মননশীল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, চৈতন্যতত্ত্ব সম্পর্কে সেরূপ কোন উচ্চবাচ্য কোথায়ও করেননি। চৈতন্যকে কেহ কৃষ্ণ বললে তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হতেন। গুরুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকার জন্য কি গোস্বামিগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণাবতার বা ভাবের রাধারাণী বলে বিশেষ প্রচার করে যাননি? নাকি ব্যক্তিজীবনে তাঁরা ভক্তি-আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হলেও দার্শনিক জীবনে তাঁরা সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন বলে দর্শন-তত্ত্বাদি বিশ্লেষণে তাঁরা চৈতন্যের নামোল্লেখ করেননি? ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা এখন আর সম্ভব নহে। তবে সুখের বিষয় চৈতন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় গোস্বামিগণ সচেষ্ট না হলেও তাঁদের গুণী ছাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সুবিখ্যাত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে এসম্পর্কে বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। চৈতন্যস্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

গৌরতত্ত্ব

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম।

* * *

সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা॥

* * *

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥

* * *

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর॥

* * *

রাধিকার ভাব যেন উদ্ধব দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥

কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তিনি চৈতন্যকে 'রাধিকার ভাবমূর্তি' বলে জানতেন। বাস্তবিকই সন্ন্যাসগ্রহণান্তর মহাপ্রভু গৌর অঙ্গে গৈরিক বসন পরিহিত হওয়ার পর দেহমনে যেন একেবারে রাধা হয়ে গিয়েছেন। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী হয়ে রাত্রিদিনে যেরূপ অন্তরে স্বস্তি অনুভব করতেন না, মহাপ্রভু সেরূপ নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে নিদারুণ মর্মজ্বালা অনুভব করতেন। বৈষ্ণবভক্ত কবিগণ এজন্য চৈতন্যপ্রেমকে রাধিকার নিগূঢ় প্রেমরহস্যের মধ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি বলে মনে করতেন। বাসুদেব ঘোষ অতি সুন্দরভাবে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন :

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর-বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

প্রবোধানন্দ সরস্বতী, স্বরূপ গোস্বামী, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের

চক্ষে শ্রীচৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিতরূপ—অন্তরঙ্গে তিনি কৃষ্ণ, বহিরঙ্গে তিনি রাধা। প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে' বলেছেন,—

ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহুভঙ্গীমভিনয়ন্,
ক্বচিদ্ রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যার্তিরুদিতঃ।

স্বরূপ গোস্বামী তাঁর কড়চায় লিখেছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনা শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণ-স্বরূপম্॥

"রাধা হইলেন কৃষ্ণেরই প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি; এইজন্য তাঁহারা একাত্ম হইয়াও পৃথিবীতে (বৃন্দাবনধামে) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধুনা আবার সেই দুই ঐক্য লাভ করিয়াছে; রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত চৈতন্যাখ্য সেই প্রকট কৃষ্ণস্বরূপকে আমি প্রণাম করি।"[১]

মহাপ্রভুর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনার পর রায় রামানন্দ যখন মহাপ্রভুর স্বরূপ ধরে ফেলেন তখন—

হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন কলিযুগে একাধারে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপে আবির্ভূত হলেন স্বরূপ দামোদর একটিমাত্র শ্লোকে তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজানি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

"যে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার অদ্ভুতমধুরিমা আস্বাদান করে শ্রীরাধার সেই প্রণয়মহিমাই বা কি রকম; আর রাধাপ্রেম কর্তৃক আস্বাদ্য যে আমার অদ্ভুতমধুরিমা তাহাই বা কি রকম; আমাকে অনুভব করিয়া

১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

রাধার যে সুখ তাহাই বা কি রকম,—ইহারই লোভে রাধাভাবযুক্ত হইয়া শচীগর্ভ রূপ সিন্ধুতে হরি (গৌরাঙ্গ) রূপ ইন্দু (চন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"[১]

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দুটি—(১) নবদ্বীপ গৌড়সম্প্রদায় এবং (২) বৃন্দাবন সম্প্রদায়। মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপুর (পরমানন্দ সেন), বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদকর্তাগণ নবদ্বীপ-গৌড়সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং রূপগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ বৃন্দাবন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দুই দলের মধ্যে তত্ত্ব নিয়ে কিঞ্চিৎ বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। ইহা ছাড়া অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতি গৌরভক্তবৃন্দও এক একজন এক একটি করে উপসম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার—এঁরা বাংলাদেশে 'গৌরপারম্যবাদ' প্রচার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ইঁহাদের কাছে পরমতত্ত্বরূপে গৃহীত হয়েছেন বলে ইঁহাদের মতবাদ 'গৌরপারম্যবাদ' নামে খ্যাত। বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ এই মতবাদের ধার ধারতেন না। তাঁরা চৈতন্যকে দেবতাজ্ঞানে ভজনা করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রধান উপাস্য ছিল ব্রজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। গৌরপারম্যবাদিগণ এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে তাঁরা গোপাল মন্ত্র ছেড়ে দিয়ে গৌরমন্ত্রকে কৌলিক আচার বলে গ্রহণ করেন। মুরারি গুপ্ত, রায় রামানন্দ—এঁরা নীলাচলে জগন্নাথ দর্শনের পূর্বে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেছিলেন।

গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরবাদ

গৌরপারম্যবাদিগণ ব্যক্তিগতভাবে শ্রীচৈতন্যকে এরপর কৃষ্ণনাগররূপে এবং নিজেদের ব্রজগোপী বা নাগরীভাবে[২] কল্পনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ যেমন ব্রজগোপীদের নিয়ে লীলা করতেন, গৌরচন্দ্রকেও সেরূপ নাগরভাবে কল্পনা করে ভক্তপদকর্তাগণ নিজেদের গোপী মনে করে তাঁর মাধুর্য আস্বাদান করতেন। লোচন দাস, নরহরি সরকার প্রভৃতি পদকর্তাগণ আদিরসপূর্ণ স্থূল ভাষায় নদীয়া-নাগরীগণের গৌরাঙ্গ-কামনা বর্ণনা করেছেন।

১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত।

২। রূপের নাগর, রসের সাগর, উদয় হলো এসে
নাগরী লোচনের মন, তাইতে গেলো ভেসে॥

(১) আর শুনেছ আলো সই গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কাঁদে আকুল তথা॥
হলুদ বাটিতে গৌরী বসিল যতনে।
হলুদবরণ গোরাচাঁদ পড়ি গেল মনে॥
মনে প্রাণে যৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছটফটানি প্রাণে॥

* * *

(২) লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় এমন অবতার॥
জলের ঘাট, আলো করেছে, গৌর-অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে, হুড় পড়েছে, নব যুবতীর ঘটা॥
সাধ কৈরে, দেখতে গেলাম, এমন কেবা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে, প্রাণকে ধৈরে টানে॥
উড়্‌ উড়্‌ করে প্রাণ রইতে নারি ঘরে।
গৌরচাঁদকে না দেখিলে, প্রাণ যে কেমন করে॥

* * *

কুল খোওয়াবি, বাউরি হবি, লাগবে রসের ঢেউ।
লোচন বলে, রসিক হলে, বুঝতে পারে কেউ॥

গৌরাঙ্গকামনা যে কতটা স্থূল-কদর্য, নগ্ন-আশোধিত রূপ গ্রহণ করতে পারে নরহরি সরকার তা দেখিয়েছেন :

একদিন আমি শাশুড়ী ননদী বসিয়াছি আঙ্গিনায়।
খেড়কীর পথে চাহিয়া দেখিনু যাইছে গৌরাঙ্গ রায়॥
সুজনের মত ঘোঙটা টানিয়া আমি রহিলাম বসি।
পহিলা ননদী মদনে মাতিয়া দাঁড়াইল হাসি হাসি॥
গবাক্ষের পথে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল গোরা।
অঙ্গের বসন শিথিল দেখিয়া শাশুড়ী দিলেন তাড়া॥
বিবশ ননদী গোরারূপ হেরি সে তাড়া না শুনিল।
দেখিতে দেখিতে সর্বাঙ্গ উলঙ্গ বসন পড়িয়া গেল॥

তা দেখিয়া আমি হাসিতে হাসিতে বস্ত্র পরাইতে গেলাম।
বস্ত্র পরাব কি গৌররূপ হেরি নিজেই উলঙ্গ হৈলাম॥
হুঁহারে শাসিতে ক্রোধ করিয়া শাশুড়ী নিকটে গেল।
বিধির কি কাজ গৌরাঙ্গ দেখিতে বুড়িও উলঙ্গ হৈল॥
উলঙ্গ হইয়া তিন জন মোরা দেখিতে লাগিনু গোরা।
দেখিতে দেখিতে আঁধল করিয়া চলি গেল আঁখিতারা॥
তখন সম্বিত হইল তিনের মাঝে জিভ কাটি সবে।
শাশুড়ী কহিলা আজুকার লাজ বধূ কারে না কহিবে।

ভক্তের নিকট ইহার তত্ত্ব যত গভীর হোক না কেন রসগ্রাহী পাঠকের চক্ষে ইহা যে স্থূল ভাঁড়ামি বলে প্রতীয়মান হবে সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তগণের মতে নবদ্বীপের বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহ্য-ভজনাদর্শ-চৈতন্যপ্রতীতি বৃন্দাবনের ঐতিহ্য-ভজনাদর্শ-চৈতন্যবোধ থেকে পৃথক।

উপায়-উপেয় তত্ত্ব

নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীচৈতন্য আরাধ্য উপেয়; আর বৃন্দাবনের আদর্শে তিনি উপায়। তবে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ—এই উভয় স্থানের ভক্তবৃন্দ তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসী। নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ চৈতন্যকে ভগবান ভেবে পূজা করতেন এবং বৃন্দাবনের ভক্তেরা তাঁকে শ্রীরাধার ভাব আস্বাদনের জন্য অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপে মানতেন। নরহরি, শিবানন্দ, বাসু ঘোষ, লোচন দাস প্রমুখ ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভাবকে অবলম্বন করে ও নিজেরা গৌর-নাগরীভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করতেন। বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব অবলম্বন করে ও নিজেদের মঞ্জরীভাবে ভাবিত করে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করতেন। এখন দেখা যাক বৈষ্ণবধর্মের ভজনাদর্শ ও চৈতন্যতত্ত্ব সম্পর্কে বৃন্দাবন-নবদ্বীপের ভক্তদের মধ্যে যে মতবিরোধ লক্ষিত হয়েছে তা কতখানি সত্য।

গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণলীলাবেশে দিন কাটাতেন। মুখে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না। বাইরে গৌর হলেও অন্তর ছিল তাঁর কৃষ্ণময়। বলতেন,—"চণ্ডাল চণ্ডাল নয় যদি কৃষ্ণ বোলে।" আরো বলতেন,—

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম।
সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

নিত্যানন্দ-হরিদাসকে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন,—

প্রতি ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

এই কৃষ্ণার্তিই ছিল শ্রীচৈতন্যের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সুতরাং কৃষ্ণকে ত্যাগ করে চৈতন্য পূজা করার অর্থ হল মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা। এটুকু বোধ অন্তত নবদ্বীপবাসীদের ছিল। নিত্যানন্দ গৌরভজনের উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু দস্যু তস্করদের উদ্ধার করার পর তিনি তাদের কৃষ্ণমন্ত্রই দিতেন। তিনি নিজে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের পূজা করতেন। অদ্বৈত মদনগোপাল পূজা করতেন। গদাধর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। মুকুন্দ-শ্রীবাসাদি চৈতন্যসঙ্গলাভের পূর্ব থেকেই কৃষ্ণার্চনা করতেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণিত করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অনেক স্থানেই তিনি 'ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র' বলে শ্রীচৈতন্যের স্তুতিপাঠ করেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যও উপেয়, উপায় মাত্র নন। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যকে উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে কৃষ্ণসাধনার একটি মাত্র পথ থাকে এবং তা হল রাধাভাবে সাধনা। কিন্তু মহাপ্রভু ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রাধাভাবে কৃষ্ণসাধনা করা সম্ভব নয়। অন্তত গোস্বামিগণ তা বিশ্বাস করতেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণসাধনার উপায় রূপ প্রতিপন্ন করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁদের পক্ষে শ্রীচৈতন্যকে উপায়রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায়, রঘুনাথ দাস প্রহরেক ধরে প্রত্যহ মহাপ্রভুর চরিত্রকীর্তন করতেন, রূপ সনাতনাদির চৈতন্যকথা শ্রবণ-চিন্তন দৈনন্দিন কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। নরোত্তম দাস প্রার্থনা বিষয়ক পদে বলেছেন,—"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।" রূপ-সনাতন-রঘুনাথ দাসের স্তব-স্তোত্রে মহাপ্রভুর উপাস্যত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলে স্বীকার করলে তাঁর উপাস্যত্ব স্বীকার করা প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বৃন্দাবনবাসীদের বিশ্বাস, ব্রজলীলা-নবদ্বীপলীলার মিলনজনিত মাধুর্য তুলনারহিত।

চৈতন্যজীবনী কাব্য।

শ্রীচৈতন্যের জীবন একখানি বিরাট মহাকাব্য। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার জাতীয় জীবনের চিত্রখানি এই মহাকাব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত জীবনী

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-মহারাজা, মন্ত্রী, জমিদার, ধনিক শ্রেণীর মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের অস্পৃশ্য দীনহীন ব্যক্তি পর্যন্ত তাঁর পরম ভক্ত হয়ে গিয়ে তাঁর জীবনে এক একটি পর্ব বা অধ্যায় গড়ে তুলেছেন। মহাকাব্যের কাহিনীর অঞ্চলবিশেষ নিয়ে পরবর্তিকালে যেমন কাব্য-নাটক রচিত হয়ে থাকে চৈতন্য মহাকাব্যের লীলাকাহিনী অনুসরণ করে তেমনি শ্রীচৈতন্য জীবিত থাকতে থাকতেই সংস্কৃত ও বাংলায় কাব্য-নাটক রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃতে যাঁরা চৈতন্যজীবনীকাব্য রচনা করে গিয়েছেন তাঁদের নাম—মুরারি গুপ্ত, পরমানন্দ সেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও স্বরূপ দামোদর।

চৈতন্য জীবনীসমূহের আদিমতম নিদর্শন হল মুরারি গুপ্তের কড়চা বা 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিতামৃতম্'। কড়চা শব্দের অর্থ—সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার উৎপত্তি

মুরারি গুপ্তের কড়চা

সংস্কৃত 'কৃতকৃত্য'[১] থেকে (সংস্কৃত কৃতকৃত্য 7 প্রাকৃত কটকচ্চ 7 বাংলা কড়চা)। মুরারি গুপ্ত শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করতেন। দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে মুরারি গুপ্ত 'কড়চা' রচনা করেন। মোট আটাত্তরটি সর্গে চৈতন্যের প্রায় সমগ্র জীবনী ইহাতে চিত্রিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটিকে কড়চা বলা যায় না। মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যের অনুচর এবং নবদ্বীপলীলার সাক্ষী ছিলেন। এজন্য পরবর্তিকালে কবিকর্ণপূর, দামোদর, জয়ানন্দ, লোচনদাস, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস নবদ্বীপলীলা প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থকেই প্রামাণিক বলে গ্রহণ করে তা থেকে চৈতন্যচরিতের উপাদান সংগ্রহ করেন। গ্রন্থমধ্যে মুরারি গুপ্ত চৈতন্যকে নারায়ণের অবতার, স্বয়ং ভগবান বলে প্রণাম জানিয়েছেন।

চৈতন্যভক্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্র পরমানন্দ সেন চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে

১। ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

একখানি নাটক—'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ও একখানি কাব্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে ইনি কবিকর্ণপূর নামে খ্যাত।

পরমানন্দ সেন

সাতবছর বয়সে পরমানন্দ সেন পিতার সঙ্গে পুরীধামে এসেছিলেন। শিবানন্দ সেন এবং স্বয়ং মহাপ্রভু পর্যন্ত কেহই এই শিশুকে কৃষ্ণনাম বলাতে পারেননি। শেষে একদিন পরমানন্দ নিজকৃত বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক পড়ে মহাপ্রভুকে শোনান। এই শ্লোকের প্রথম দুটি অক্ষর 'শ্রবসোঃ কুবলয়ম্' (দুইকর্ণের নীলপদ্ম) অনুসারে তাঁর নাম হয় 'কবিকর্ণপূর'। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকখানি দশাঙ্কে পরিসমাপ্ত। ইহাতে সমগ্র চৈতন্যজীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের পর রাজা প্রতাপরুদ্রের শোক অপনয়নের জন্য এই নাটকখানি রচিত হয়। নাটকটি ১৫৪০-৪১ খ্রীঃ কিছু পূর্বে রচিত হয়ে থাকবে (কারণ ১৫৪০-৪১ খ্রীঃ প্রতাপরুদ্রের মৃত্যু ঘটে)।

১৫৪২ খ্রীঃ কবিকর্ণপূরের চৈতন্যজীবনীকাব্য 'চৈতন্যচরিতামৃত' সমাপ্ত হয়। ইহার বিশটি সর্গে ধৃত উনিশ শতের অধিক শ্লোকে চৈতন্যদেবের প্রায় সমস্ত জীবন বর্ণিত হয়েছে।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যদেবের কাশীবাসীভক্ত ছিলেন। তিনি 'চৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্' নামে একখানি চৈতন্যভক্তিবিষয়ক কাব্য রচনা করেন। কাব্য হিসেবে 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্, বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও চৈতন্যদেবের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ইহাতে প্রাদর্শিত হয়েছে। প্রবোধানন্দ যে গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তার ইঙ্গিত এই গ্রন্থে বিদ্যমান।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী

স্বরূপ দামোদর পুরীধামে নৃত্যগীতের দ্বারা মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দান করতেন। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে তিনি পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁকে এজন্য বিশেষ মান্য করতেন। ভক্তদের শিক্ষার ভার মহাপ্রভু অনেক সময় স্বরূপ দামোদরের উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এরূপ একটি বিশেষ উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। স্বরূপের উপর রঘুনাথের শিক্ষার ভার অর্পণ করে মহাপ্রভু রঘুনাথকে উপদেশ দিলেন,—

স্বরূপ-দামোদর

সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥

স্বরূপ দামোদরের পূর্বনাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যে উল্লিখিত আছে যে, পুরুষোত্তম সন্ন্যাসগ্রহণ করে 'স্বরূপতা' (কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা) লাভ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় স্বরূপ দামোদর। চৈতন্যজীবনীবিষয়ক যে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন তা 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' নামেই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার উল্লেখ আছে :

প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাহিলেন গ্রন্থের ভিতর।

কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শন ও চৈতন্যতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই 'কড়চা'র বহুবার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করলেও ইহা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

সংস্কৃত ভাষার শুষ্ক জটাজাল বিচ্ছিন্ন করে চৈতন্যলীলা ও বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের তত্ত্বরহস্যের পাবনীধারার স্পর্শলাভ সাধারণের ভাগ্যে ঘটেনি। শ্রীচৈতন্যের জীবনকথামৃত বাংলা ভাষায় প্রচারিত হলে মুমুক্ষু ভক্ত-পাঠকের মনোবাসনা পূর্ণ হল। তাছাড়া এগুলি পরবর্তি-কালের (ষোড়শ—সপ্তদশ শতকের) বৈষ্ণবকবিদের পদাবলী রচনার রসদ জুগিয়েছে। একারণে বাংলায় রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির নাম —বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', 'গোবিন্দদাসের কড়চা', চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়া' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যের বাংলা জীবনী

বাংলায় রচিত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' আদিমতম রচনা। তত্ত্ব-দর্শনের গূঢ় অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে চৈতন্যের জীবনকাহিনী ও সেইসঙ্গে চৈতন্যভক্তদের পরিচয় সুললিত ভাষায় মধুর ছন্দে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থখানিকে কবি সাধারণের নিকট সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ হিসেবেও ইহা বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। মহাপ্রভুর তিরোধানের অল্প কয়েক বছর পরে তাঁরই অন্যতম প্রধান ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে গ্রন্থখানি রচিত হয়। ভাগবতে বেদব্যাস যেমন কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেন, চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন তেমনই চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেন। এজন্য কবি বৈষ্ণবসমাজে বেদব্যাসের অবতাররূপে খ্যাত। গ্রন্থটির

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'

নাম নাকি পূর্বে 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। পরে ইহাতে ভাগবতের প্রভাব ও লীলাপর্যায় বিদ্যমান দেখে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ইহার নাম দেন 'চৈতন্য-ভাগবত'। নিত্যানন্দ দাস কৃত 'প্রেমবিলাসে' চৈতন্য ভাগবতের নতুন নামকরণের উল্লেখ আছে :

চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল।

বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত'কে তিনখণ্ডে—আদি, মধ্য ও অন্ত্য বিভক্ত করে চৈতন্যলীলা বিবৃত করেন। আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের জন্ম-বাল্যলীলা থেকে শুরু করে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের পর গয়াধাম থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখণ্ডে ইহার পর মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রা, নীলাচলে ভক্তবৃন্দসনে দর্শন-তত্ত্বাদি নিয়ে নানান আলোচনা, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কালযাপন ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা ও অগণিত ভক্তের সঙ্গে সম্মেলন ইত্যাদি ঘটনা স্থান পেয়েছে।

চৈতন্যলীলা বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস মাঝে মাঝে সম্ভাব্যের সীমা লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। জীবদ্দশাতেই শ্রীচৈতন্য অবতাররূপে পূজিত হতে থাকেন। কেহ তাঁকে স্বয়ং ভগবান বা কৃষ্ণ, কেহ তাঁকে রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু বলে প্রচার করেন। বৃন্দাবন দাস ইঁহাদের চেয়ে আরো এক প্রস্থ এগিয়ে গিয়ে চৈতন্যের বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত সমুদয় ঘটনাকে ভাগবতের আদর্শে সাজান। শৈশবে কৃষ্ণলীলার অনুসরণ, ভাগবত ধরি আলিঙ্গন, গোপালের বেশধারণ, হরিধ্বনিতে সান্ত্বনা লাভ, নিজেকে গোয়ালা বলে ঘোষণা ইত্যাদি ঘটনায় ভাগবতের প্রভাব সুস্পষ্ট। মুরারি গুপ্তের নিকট মহাপ্রভুর বরাহ-মূর্তিতে আবির্ভাব, শ্রীবাসের নিকট গিয়ে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীর মূর্তিতে হুঙ্কারকরণ ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। চৈতন্যকে অবতাররূপে প্রমাণ করার জন্যই কবি এসকল ঘটনাকে মনের মত করে গড়ে নিয়েছিলেন।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' তৎকালীন (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতকের প্রথমভাগ) বঙ্গসমাজের বিশেষ করে নবদ্বীপের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব থেকে পাঠান শাসনের ফলে ধর্মকর্ম ব্যাপারে বেশ একটু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল। উচ্চবর্ণের লোকেরা স্মৃতিশাস্ত্র, নব্যন্যায় ও তন্ত্রসাধনার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট

হয়ে পড়েছিল। নবদ্বীপ তখন একটা বিদ্যাস্থানে পরিণত হয়েছিল। নানা দেশ থেকে ছাত্রেরা সেখানে অধ্যয়ন করতে আসত :

নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পাঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

বিদ্যারসে মেতে তখন 'কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার'। লোকে ধর্মকর্মের বিশেষ ধার ধারতেন না :

ধর্মকর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোনো জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধনে॥

—সমাজের সব লোকে ব্যবহার-রসে (সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে অনুরাগ) মেতে উঠেছিল। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি ছেড়ে—

বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥

শুধু তাই নয়, নামকীর্তনকে তারা অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখত। শ্রীবাসের আঙিনায় ভক্ত বৈষ্ণবগণ নামকীর্তন করলে অবৈষ্ণবসম্প্রদায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত। তারা মনে করত ইহাতে বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নে যাবে। 'পাষণ্ডী'রাও (শাক্তেরা) পরস্পর বলাবলি করত—

এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥

* *

কেহো বলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥

'পাষণ্ডী'রা বৈষ্ণব ভক্তদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিতও করত :

কেহো বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি অবৈষ্ণব সমাজের এই নিন্দা-কুৎসা রটনার মূল কারণ, খুব সম্ভব, বিদ্বেষ নয়, রাজভয়। সেকালে মুসলমান শাসকেরা সুযোগ পেলেই হিন্দুদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করতেন। হিন্দুদের ধর্মাচারে মন দিতে দেখলে তাঁরা কেবল জাতি নেওয়ার তালে থাকতেন। চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে কাজীদলনের বৃত্তান্ত থেকে তা বোঝা যায়।

বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় তেমন মনোসংযোগ না করলেও কাব্যরচনায় তিনি কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্য-লীলাকে ভক্তিরসে জারিত করে একটা সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত রূপ তিনি গড়ে তুলেছেন। ভক্তপাঠকের কাছে গ্রন্থখানি সেজন্য এত সমাদর লাভ করে।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার অল্পকাল পরে (সম্ভবত ১৫৫০—'৬৬খ্রীঃ মধ্যে) কোন এক সময়ে লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' রচিত হয়; কারণ কাব্য-মধ্যে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে। জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥' লোচনদাস সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য পাঁচালী-মঙ্গলকাব্যের রীতির মিশ্রণে 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। সেজন্য ইহা তত্ত্বজ্ঞ বিদগ্ধজনের মনঃপূত হয়নি, বিশ্বাসপরায়ণ ভক্ত-সাধারণের ভোজ্যে পরিণত হয়েছে।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল

'চৈতন্যমঙ্গল' চার খণ্ডে বিভক্ত—সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। সূত্রখণ্ডের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত তিনি গণেশ, হরপার্বতী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা করে, গুরুকে (নরহরি দাসকে) প্রণাম জানিয়ে কাব্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছেন। তারপর কবি কৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপন ও অন্তর্বাহ্য রাধাময় হওয়ার জন্য নবদ্বীপে শচীগৃহে জন্ম গ্রহণের কথা বলেছেন। কৃষ্ণের অনুচরেরা নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে কে কার ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন তার উল্লেখও কবি করেছেন। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর শৈশবকাল থেকে শুরু করে গয়াগমন ও গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এই অংশের একটি বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় হল গৌর নাগর ভাবের বর্ণনা:

বসিলা সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে।
সে অঙ্গবাতাসে রঙ্গিণীর অঙ্গ কাঁপে॥
বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়নে অলসযুত কাহারও হইল॥

কেহো অঙ্গপরশে অনঙ্গরঙ্গ করে।
ঢুলিয়া পড়িলা বিশ্বম্ভরের উপরে॥

মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা ও নীলাচল স্থান পেয়েছে। এই অংশে কবি কৃষ্ণের গোপীদের বস্ত্রহরণ দৃশ্য অনুসরণ করে মহাপ্রভুর তাঁর অনুচরদের বস্ত্রহরণের হাস্যকর বর্ণনা দিয়েছেন:

সবার অঙ্গের বস্ত্র নিলা ত কাড়িয়া।
আনন্দে হাসয়ে সবে বিবস্ত্র করিয়া॥
সব জন লজ্জায় অবশ ভেল তনু।
করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ চাটুকরে পুনু॥

শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও তথা হতে পুরীধামে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর অলৌকিক মহাপ্রয়াণ বর্ণিত হয়েছে।

লোচনদাস মাঝে মাঝে অত্যন্ত স্থূল বিকৃত কদর্য রুচির[১] পরিচয় দিলেও স্থানে স্থানে বর্ণনশক্তির বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গৌরদাসের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলছেন,—

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো
এক ভৈল শুধুই সুনেহা॥

* * *

না চাহে আঁখির কোণে সদাই সবার মনে
দেখিবারে আঁখিপাখি ধায়।
আঁখির পিয়াস দেখি মুখের লালস গো
আলসল জরজর গায়॥

১। গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবনলীলা বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখেছেন—

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥

অদ্বৈতপন্থী মুরারির ভক্তিপথ গ্রহণে বাধ্য করার জন্য নিমাই-এর কাণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে লিখছেন—

মধ্য ভোজন বেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
থাল ভরি মুত মুতিল।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পাঁচালীর ঢঙে লেখা। বোধ হয় তিনি জনসাধারণের উপভোগের জন্য গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন; ঠিক শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবদের জন্য নয়। কাব্যখানি নয় খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে তিনি শিব, গনেশ, জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, রাধাঠাকুরাণী, ব্রহ্মা, নৃসিংহ, বামন, আদ্যাশক্তি, নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি দেবদেবীর অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী বর্ণনা করে যুগের ধর্মকর্মেরও কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করেন। নদীয়া খণ্ডে চৈতন্যের পিতৃভূমি শ্রীহট্টের বর্ণনা, নবদ্বীপে চৈতন্যের পিতার বাস্তুনির্মাণ এবং নবদ্বীপ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হিন্দুদের উপর মুসলমান সুলতানের অত্যাচারের কাহিনী[১] লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'তৃতীয়ে বৈরাগ্য খণ্ডে' মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়াস এবং সন্ন্যাস খণ্ডে মহাপ্রভুর কাটোয়ার কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের বর্ণনা এবং কাটোয়া থেকে শান্তিপুব যাত্রার ঘটনা স্থান পেয়েছে। উৎকল খণ্ডে মহাপ্রভুর পুরীধামে উপস্থিতি এবং প্রকাশখণ্ডে ও তীর্থখণ্ডে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার কন্যা সত্যবতীর বিবাহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিজয়খণ্ডে জালীন্দ্র ও তাঁর পতিব্রতা পত্নী তুলসীর কাহিনী এবং উত্তরখণ্ডে বিষ্ণুমাহাত্ম্য, মহাপ্রভুর নীলাচল থেকে নদীয়ায় আগমন ও আবার নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, নিত্যানন্দের পরিচয়াদি বর্ণিত হয়েছে।

জয়ানন্দের
চৈতন্যমঙ্গল

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কাব্যগরিমা না থাকলেও ইহাতে অভিনব ঐতিহাসিক তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন :

চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ
আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্টের দেশে পলাঞা গেলা
রাজা ভ্রমরের ডরে॥

শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুসম্পর্কে কোন জীবনীকার স্পষ্ট করে কিছু বলে যাননি। জয়ানন্দ বলেছেন, পুরীধামে রথ-উৎসবে নৃত্য করার সময় পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হয়ে মহাপ্রভু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তারপর তিনি প্রাণত্যাগ করেন :

১। আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিল গৌড় দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব পারিষদ সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা॥
নানা বর্ণে দিব্য মাল্য আইল কোথা হইতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন রথ আন ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ॥
মায়া-শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥

চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থসমূহের মধ্যে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' সর্বশ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামিগণের (রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদাস-রঘুনাথ ভট্ট-গোপাল ভট্ট) অনুপ্রেরণায় বৃদ্ধ জরাতুর অবস্থায় কৃষ্ণদাস ইহা রচনা করেন। শুধু জীবনী হিসেবে নয়, কাব্য হিসেবেও 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের বিশদ চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হয়েছে। বৈষ্ণবদের কাছে ইহা ধর্মগ্রন্থ। বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের দুরূহ তত্ত্বকে কবি সরস—সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণিত করেছেন। পাণ্ডিত্য ও কবিপ্রতিভার এমন অপূর্ব সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ ভাবপ্রবণ চরিত্রকে একমাত্র তিনিই কাব্যরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। একারণে শুধু বৈষ্ণব সমাজে নহে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি তিনি চৈতন্য-নিত্যানন্দের পরম ভক্ত

ছিলেন। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ শুনে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলে যান এবং ষড়-গোস্বামীর কৃপায় তিনি বৈষ্ণব দর্শন-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন আদর্শ বৈষ্ণব। চৈতন্যলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি অনেক দুরূহ তত্ত্বাদি নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমানটুকু কোথায়ও প্রকাশ পায়নি। সমস্ত বিষয়টিকে তিনি পূজারীর নৈবেদ্যের মত পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিনয় সহকারে ভক্ত ও সাধারণ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। মন ও মননের এমন নিঃসঙ্কোচ নিরভিমান প্রকাশ একান্তই দুর্লক্ষ্য। গ্রন্থরচনাকালে কবি নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,—

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥
তৈছে এক কোণ আমি ছুঁইল লীলার।
এ দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বলিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি॥

পাঠকগণের প্রতিও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অন্ত নেই :

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥

বৈষ্ণব না হলে কি কেউ কখন একথা বলতে পারে? কাব্যমধ্যে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে তাতে অবৈষ্ণব কবি হলে বলতেন,—চৈতন্য-চরিতের কথা অমৃত সমান। কবি কৃষ্ণদাসে কহে শুনে পুণ্যবান।

কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস মাৎসর্য-বিষদশনের কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পাননি। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকগণের দুটি গুরুতর অভি-যোগ আছে: প্রথম, তিনি বৈষ্ণব গোস্বামিগণের দার্শনিক অভিমতগুলি চৈতন্যের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন; দ্বিতীয়, গ্রন্থমধ্যে তিনি অনেক অনৈতি-হাসিক ঘটনার আমদানি করেছেন। এই দুটি অভিযোগের মূলে কিছুটা

সত্য থাকলেও ইহার সবটা সত্য নহে। এজন্য কৃষ্ণদাসকে আদৌ দোষী করা যায় না। কৃষ্ণদাস ছিলেন সরল বিশ্বাসী। বিশ্বাসই ধর্মের অধিষ্ঠানভূমি। বৈষ্ণবধর্মের সার কথা—'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। কৃষ্ণদাস ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব। তিনি তাই চৈতন্যলীলাতত্ত্ব বর্ণনকালে কোন তথ্য-যুক্তির উপর নির্ভর করেননি। গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করে গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস যদি আধুনিক বুদ্ধিজীবীর মত গ্রন্থমধ্যে নীরস যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতেন তাহলে বৈষ্ণব ভক্তসমাজে ইহার সমাদর হত কিনা সন্দেহ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধ বয়সে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য রচনা করেন। ইতিপূর্বে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যজীবনী কাব্য প্রণয়ন করে চৈতন্যলীলার ব্যাসরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তথাপি কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনী রচনা করলেন কেন? কবি নিজেই ইহার উত্তর দিয়েছেন। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেননি। অথচ এই অন্ত্যলীলাই মহাপ্রভুর দিব্যজীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। এই অন্ত্যলীলাকে দীর্ঘ করে রচনা করার জন্য এবং যে যে স্থান বৃন্দাবন দাস ছেড়ে গিয়েছেন সেই সেই স্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থমধ্যে কবি-মনীষীদের ঋণ তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। কাব্যপরিকল্পনা সম্পর্কে কবি বলেছেন,—

দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বলিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িয়া যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান॥
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিয়ে চর্বণ॥

বৃন্দাবন দাসের মত কৃষ্ণদাস তাঁর গ্রন্থকে আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করে রচনা করেন। আদিলীলাতে কবি চৈতন্যদেবের

বাল্যকৈশোরলীলা, কাজীদলন ও সন্ন্যাসগ্রহণের সম্বন্ধ বর্ণিত করেছেন। এই অংশে কবি গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য উল্লেখ করে, গোস্বামিগণের ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও রসতত্ত্বের নিপুণ আলোচনা করে, রাধা-কৃষ্ণের যুগলতনুরূপে চৈতন্যের আবির্ভাবের তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করে এবং চৈতন্যভক্তদের শাখানির্ণয় ও তাঁর অনুচর-পরিকরগণের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থের মূল্য পরিবর্ধিত করেছেন। মধ্যলীলাতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণ, রাঢ়দেশ ভ্রমণ, নীলাচল যাত্রা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, রাঢ় হয়ে বৃন্দাবন গমন, বৃন্দাবনকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা এবং পুনরায় নীলা-চলে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে বাসুদেব সার্বভৌমের বেদান্ত-বিচার, রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন তত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনা, সনাতনের শিক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। অন্ত্যলীলাতে কবিরাজ গোস্বামী মুখ্যত মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার বিশদ পরিচয় দিয়েছেন। শেষজীবনে মহাপ্রভু রাত্রিদিন কিভাবে কাটাতেন কবিরাজ গোস্বামী তাঁর কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল :

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্যসদ্‌গুণসাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস সাগর।
কাঁহা গেলে তোমা পাই তুমি কহ তাঁহা যাই
এত কহি চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল নিয়া॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দ গীতি
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ॥

মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কাহিনী অবলম্বনে গোবিন্দদাস কর্মকার একখানি কড়চা রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে

প্রসিদ্ধ। গোবিন্দদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন। প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি ঘটনা তিনি যত্ন করে লিখে রাখতেন। পরে ইহা 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক গ্রন্থের আকার ধারণ করে।

গোবিন্দদাসের কড়চা

১৮৯৫ খ্রীঃ শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতবংশীয় জয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক 'গোবিন্দদাসের কড়চা' প্রকাশিত হয়। জয়গোপাল প্রথমে গোবিন্দদাসের কড়চার পুঁথি সংগ্রহ করে তার নকল করে নেন। পরে কোন কারণে নকলের কিয়দংশ হারিয়ে যায়। জয়গোপাল তখন হারান অংশটুকু নিজে রচনা করে তা গোবিন্দদাসের নামে চালিয়ে দেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে যে অংশ তিনি বুঝে উঠতে পারেননি বা যে অংশ তাঁর কাছে দুরূহ বলে মনে হয়েছিল তা তিনি নিজেই রচনা করে দিয়েছিলেন। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামে অন্য কোন পুঁথি আর কোথায়ও পাওয়া যায়নি। এ সমস্ত কারণে জয়গোপাল কর্তৃক প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা'-খানিকে কেহই প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেননি। আধুনিক সাহিত্য সমালোচকগণের মতে গ্রন্থখানি আগাগোড়া কোন আধুনিক কবির রচিত (ইহা জয়গোপালের রচনাও হতে পারে)। ইহার ভাষা নিতান্ত আধুনিক। ঘটনা অনেকস্থলে রুচিগর্হিত, চৈতন্যের জীবনাদর্শ বিরোধী। সে কারণে ১৯২৬ খ্রীঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয় ও বনোয়ারী লাল গোস্বামীর (জয়গোপাল গোস্বামীর পুত্র) সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'গোবিন্দ দাসের কড়চা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে গ্রন্থটির অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে অনেকে কঠোর ভাষায় ইহার সমালোচনা করেন। ১৩৩৪ সালে মৃণালকান্তি ঘোষের 'গোবিন্দদাসের কড়চা' রহস্য এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ ঢাকা হতে বিপিন-বিহারী গুপ্তের Govindadas's Kadcha—a Black Fogery প্রকাশিত হলে 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র ছদ্মবেশ খসে পড়ে। পণ্ডিতমহলে ইহা জাল গ্রন্থরূপে পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এই জাল-গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনা করে পণ্ডশ্রম করে কিছু লাভ নেই। উপভোগের জন্য গ্রন্থটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর বটেশ্বর তীর্থে অনাহারে রাত্রিযাপনের পর মধ্যাহ্নসময়ে এক ধনবান ব্যক্তি সন্ন্যাসীর মন পরীক্ষা করার জন্য দুজন-

বেশ্যাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। কুলটা নারীদের পঙ্ককুণ্ড হতে মহাপ্রভু কিভাবে উদ্ধার করলেন কবি তারই নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করে দেখিয়েছেন—

সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥
ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন।
প্রভুরে বুঝিতে বহু করে আয়োজন॥
তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে।
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলি খুলিয়া সত্য দেখাইল স্তন।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ সম্বোধন।
থর থরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে।
কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে।
কেন অপরাধী কর আমারে জননী।
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী।
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর।
সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর।
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥

*   *   *

সত্যেরে বাহুতে ছাঁদি বলে বল হরি।
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি।

কোথা প্রভু কোথায় বা মুকুন্দ মুরারি।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি॥

সন্ন্যাস গ্রহণান্তর মহাপ্রভুর জীবনের এরূপ কদর্য চিত্র কল্পনাই করা যায় না। যিনি ভক্তদের সবসময়ে কামিনীকাঞ্চনের সংসর্গ ত্যাগ করতে উপদেশ দিতেন এবং নিজেকে যা থেকে সর্বদা দূরে রাখতেন সেই সন্ন্যাসীর পক্ষে গণিকার সম্মুখে নির্বিচারে প্রেমাবেশে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করা আদৌ সম্ভব নয়। ভক্তির পরিবর্তে ইহা শুধু আমাদের কাছে কবির গর্হিত রুচির পরিচয়ই বহন করে আনে। গ্রন্থটি যে জাল ইহাই তার একটা বড় প্রমাণ।

অমরাপুরীতে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থার চিত্রটি কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির দৃষ্টিতে মহাপ্রভু—

পাগলের ন্যায় যেন ইতি উতি ধায়।
আবেশে উন্মত্ত হয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়।
উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে কভু যেন জ্ঞান হারা।
মিশিয়া গিয়াছে উর্ধ্বে নয়নের তারা।
পৃষ্ঠদেশে এলায়ে পড়েছে জটাভার।
হৃদয়মাঝারে অশ্রু পড়ে অনিবার।

কবিত্বশক্তির সঙ্গে সঙ্গে আর যে জিনিসটি এখানে বিশেষভাবে চোখে পড়ে সেটি হল ইহার ভাষা। আধুনিক ভাষার নগ্নদেহের গৌরকান্তি এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অল্প কিছুকাল আগে চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' নামক একখানি চৈতন্যজীবনী বিষয়ক কাব্যের খণ্ডিত পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৫৭ খ্রীঃ ডাঃ সুকুমার সেনের সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হয়। প্রাচীন কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকায় এতদিন তাই গ্রন্থের নাম সকলের অজ্ঞাত ছিল। তবে পদাবলী সাহিত্যে চূড়ামণি দাস একেবারে অজ্ঞাত নহেন। পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা, প্রভৃতি পদসঙ্কলন গ্রন্থে চূড়ামণি দাসের ভণিতার কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়েছে।

চূড়ামণি-দাসের গৌরাঙ্গবিজয়

'গৌরাঙ্গ বিজয়ে'র পুঁথির ভগ্নাবশেষ মাত্র আমাদের হস্তগত হওয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা গেল না। কবি যে তিন খণ্ডে

বিভক্ত করে কাব্যখানি পরিসমাপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং ইহার নাম যে দিয়েছিলেন 'গৌরাঙ্গবিজয়' তা একটি পদে উল্লিখিত হয়েছে :

আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড কহিব।
গৌরাঙ্গবিজয় তিন খণ্ড পূর্ণ হৈব॥

পদাবলী প্রসঙ্গে

পদাবলীর ধর্মনৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি॥

বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের আদর্শে পরিকল্পিত রাধাকৃষ্ণের নিত্য বৃন্দাবনলীলাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব ধর্ম ভক্তিবাদ-আশ্রয়ী। শাণ্ডিল্যসূত্র, নারদসূত্র, নারদপঞ্চরাত্র, মহাভারত, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়েছে। শণ্ডিল্যসূত্র এবং নারদসূত্রের মূল উপনিষদে পওয়া যায়। তাই ভক্তিধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম।

সাধারণত শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে ভক্তিধর্মের প্রধান গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়। বাস্তবিকই গীতাই ভক্তিশাস্ত্রের বেদ। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, যোগী তপস্বীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; আবার যে যোগী সমস্ত হৃদয়মন সম্পূর্ণ অর্পণ করে শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁকে ভজনা করেন তিনি যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অর্জুনকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন—মদ্গত চিত্ত হও, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাতেই শরণ লও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। এই শরণাগতিই ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য। শাণ্ডিল্যসূত্রে বলা হয়েছে—'সা ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে' অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরক্তি বা প্রেমই ভক্তি।

গীতার ভক্তিবাদ শ্রীমদ্‌ভাগবতে লীলারসাত্মক কাব্যরূপ লাভ করেছে। তত্ত্বের দিক দিয়ে যে ভক্তিযোগ গীতায় বিঘোষিত হয়েছে, লীলার দিক থেকে তা ভাগবতের কাব্যকথায় ফুটে উঠেছে। সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ ভগবান প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে গোপীদের চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছেন। তাঁরা

সকল ভুলে সকল ফেলে ছুটেছেন তাঁকে লাভ করার জন্য। বৈষ্ণব চায় কৃষ্ণের চরণে এরূপ একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে। ধন নয়, জন নয় সুন্দরী নয়, কবিতা নয়, জন্মে জন্মে যেন ভগবানের পায়েতে অহৈতুকী ভক্তি থাকে—বৈষ্ণবের প্রার্থনা ইহাই। কৃষ্ণসেবা ছাড়া ভক্ত আর কিছুই চাহে না। মোক্ষের অভিসন্ধি পর্যন্ত সে মনে স্থান দেয় না। ব্রজগোপীগণই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করার সময় তাঁরা একটি পলক বা নিমেষকেও ধিক্কৃত করেন। মনে হয় যেন মীনের মত নিমেষহীন চক্ষু হলে ভাল হত।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্মের অদ্ভুত বিকাশ ঘটেছিল কতকগুলি সাধু-সন্তদের দ্বারা। ইঁহারা 'আলোয়ার' সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। ভগাবানকে পতিরূপে উপাসনা করা অলোয়ারগণের প্রচারিত ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলোয়ারগণের মধ্যে একজন ছিলেন রমণী। তিনি গোপীভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি প্রতিবেশিনীগণকে নিয়ে শ্রীরঙ্গনাথের (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দিরে ঠাকুরের ঘুম ভাঙাতে যেতেন। ভগবান রঙ্গনাথকেই অর্থাৎ কৃষ্ণকেই তিনি তনুমনযৌবন সমর্পণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে রঙ্গনাথের প্রেয়সী, পত্নী বলে মনে করে আর বিবাহ করেননি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঠিক এভাবে নিজেদের ভগবানের প্রেমিক রূপে কল্পনা করেননি। কিন্তু এখানে ভক্ত প্রেমিকা যেমন করে তাঁর দেহমন কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছেন, বৈষ্ণবগণ অনুরূপভাবে সর্বস্ব কৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর সেবা করতে চেয়েছেন। বৈষ্ণব কবিগণ মঞ্জরী বা সখীর ভূমিকা গ্রহণ করে তাঁকে সেবা করেছেন, দূর থেকে তাঁর অচিন্ত্য লীলা মানসনয়নে দর্শন করে ধন্য হয়েছেন, কিন্তু নিজেরা কখনও ভগবানের প্রেমিকা হওয়ার বাসনা করেননি। তাঁরা চিনি হতে চান না, চিনি খেতে ভালবাসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্যই তাই, কান্তাভাবের ভজন—কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার। ভগবান প্রেমময়, তিনি রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। একমাত্র প্রেমের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়। প্রেমই ভক্তি, ভক্তিই প্রেম। এই বোধ, এই প্রতীতি বৈষ্ণবের প্রাণ।

বৈষ্ণব ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম দার্শনিক মতবাদ বিজড়িত হয়ে আছে। বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। এই কৃষ্ণ কে, আর, রাধাই বা কে? বৈষ্ণব দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা ইহাই।

বৈষ্ণবদের মতে, কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'।

ভগবানের তিনটি স্বাভাবিকী শক্তি আছে—চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি ও তটস্থা শক্তি বা জীব শক্তি। স্বরূপ শক্তির আবার তিনটি বৃত্তি আছে—সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। সন্ধিনী হল সৎ-অংশের শক্তি; সম্বিৎ হল চিৎ-অংশের শক্তি এবং হ্লাদিনী হল আনন্দ-অংশের শক্তি। ভগবানকে তাই বলা হয় সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ)। সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ভগবান নিজের ও অপরের সত্ত্বাকে ধারণ করেন। সম্বিৎ-এর দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ হয়ে তিনি নিজে জানেন ও অপরকে জানিয়ে থাকেন। হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা নিজে আনন্দ আস্বাদন করে থাকেন এবং অপরকে আস্বাদান করিয়ে থাকেন। উৎকর্ষের বিচারে এই তিন শক্তির মধ্যে সন্ধিনী অপেক্ষা সম্বিৎ প্রধানা, সম্বিৎ অপেক্ষা আবার হ্লাদিনী প্রধানা। সুতরাং হ্লাদিনীই হল তিন শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি। রাধিকা হলেন ভগবানের এই হ্লাদিনী শক্তিরই প্রকাশ।

স্বরূপে ভগবান হলেন রসময়। তাঁর এই রসময়ত্বের কারণ তাঁর স্বরূপশক্তির ভিতরকার শ্রেষ্ঠ হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তির কাজ দুটি—ভগবানকে আনন্দিত করা, অপরকে আনন্দ দান করা। সুতরাং হ্লাদিনী শক্তির ভগবৎ-কোটি ও জীব-কোটি—এই উভয় কোটিতেই প্রবেশ আছে। ভগবৎ-কোটিতে প্রবিষ্ট হয়ে ইহা ভগবানকে বিচিত্র লীলারস দানের দ্বারা রসময় করে তুলছে, আবার জীব-কোটিতে প্রবিষ্ট হয়ে ইহা ভক্ত হৃদয়ে বিশুদ্ধতম আনন্দ বিধান করছে। হ্লাদিনী শক্তি তাহলে ভগবানের ভিতরে রসরূপিণী এবং ভক্ত জনহৃদয়ে ভক্তিরূপিণী। এই হ্লাদিনী শক্তির সারঘন মূর্তি হলেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা তাই একাধারে প্রেমরূপিণী এবং প্রেমদাত্রী। ভগবানের ভিতরে অনন্ত হ্লাদিনী শক্তিরূপে তিনি বিরাজমান। বলে তিনি ভগবানের প্রেমকল্পলতা এবং হ্লাদিনী শক্তির অনুরূপে জীবের ভিতরে পতিত হয়ে তাকে প্রেমভক্তিতে আপ্লুত করে রাখেন বলে জীবের নিকট তিনি প্রেমকল্পতরু।[১] চৈতন্য চরিতামৃতকার একথা স্পষ্ট করে বলেছেন—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

শ্রীরাধা ভক্তের আনন্দ দান করে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন বলে ভক্তের নিকট তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। এজন্য আমাদের দ্বারে ভিক্ষা করতে

১। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত।

এসে ভিখারী প্রথমেই বলে—'জয় রাধে'। কৃষ্ণ তারা বলে না। কারণ, ভক্তের পক্ষে ভগবানের করুণা লাভের একমাত্র আশ্রয়স্থল হলেন শ্রীরাধা।

শ্রীরাধার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বৈষ্ণবগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রাধাঠাকুরাণী হলেন মহাভাবস্বরূপিণী। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার অংশ হল প্রেম, প্রেমের আবার যে পরম সার অংশ মহাভাব সেই মহাভাব হল রাধা ঠাকুরাণীর স্বরূপ:

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥

রাধাকৃষ্ণের-তত্ত্বকথা আলোচনা করে এটুকু বোঝা গেল যে, স্বরূপত রাধা এবং কৃষ্ণ একই। এখন প্রশ্ন হল, স্বরূপত যা এক তার আবার যুগলমূর্তি কল্পনা করা হল কেন? কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ইহার জবাব এই যে,—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ উভয়ে এক হয়েও লীলাচ্ছলে আবার দুই। যেমন মৃগমদ ও তার গন্ধ, অগুন ও তার তাপ—ইহারা স্বরূপে অভেদ হলেও রূপের দিক থেকে ভেদ, তেমনি রাধাকৃষ্ণ স্বরূপে এক হলেও লীলারূপের দিক থেকে ভেদ। অচিন্ত্য শক্তিবলেই এই অভেদের মধ্যে ভেদ, ইহাই হল অচিন্ত্য ভেদাভেদ।

লীলারস অস্বাদনের জন্য সচ্চিদানন্দ ভগবান আপনাকে যে রাধা ও কৃষ্ণ—এই দুই রূপে প্রকাশ করলেন তাঁদের বিহারক্ষেত্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম। বৈষ্ণবমতে লীলাপ্রকটনে রাধা হলেন কৃষ্ণের পরকীয়া-ভাবের নায়িকা। কারণ, তাঁরা বলেন—'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস'। যে নারী অনুরাগবশে কুল, শীল, মান, জাতি, অভিমান, ইহলোক-পরলোক সবকিছু উপেক্ষা করে পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে সেই পরকীয়া। সহস্র বাধা, সহস্র নিষেধ প্রতিমুহূর্তে হারাবার আশঙ্কা পরকীয়াভাবে থাকে বলে ইহাতেই প্রেমের চরম স্ফূর্তি। বৈষ্ণব কবিরা

পরকীয়া প্রেমের প্রেক্ষাপটে শ্রীরাধার এক অপূর্ব মূর্তি অঙ্কন করেছেন। যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের বংশীরব শুনে পূর্বরাগময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তারপর অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ অভিসার, মিলন, মাথুর প্রভৃতি অবস্থার ভিতর দিয়ে ভাবসম্মেলনে তিনি সেই অখিলরসামৃত মূর্তিকে নিজের হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ভাবসম্মেলন হল মহামিলন। এই মহামিলনের জগতে শোক নেই, তাপ নেই, বিরহ নেই, বিচ্ছেদ নেই আছে শুধু নিত্যকালের মিলন সুখ। দ্বৈততত্ত্বে রাধাকৃষ্ণের প্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার যে সূচনা, অদ্বৈততত্ত্বে তারই সমাপ্তি।

এপর্যন্ত কেবল ভগবানের স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির পরিচয় লওয়া হল। এখন তাঁর অপর দুটি শক্তি—বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে। বহিরঙ্গা শক্তির অপর নাম মায়া শক্তি। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি হলেও মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না, ব্রহ্মের বাইরেই তার অবস্থিতি। এজন্য মায়াকে ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। মায়া ভগবানের শক্তি হলেও ইহা চেতনাময়ী শক্তি নয়, জড়রূপা শক্তি। ভগবানের অধ্যক্ষতায় মায়া বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কাজ করে। মায়ার দুটি বৃত্তি—জীবমায়া ও গুণমায়া। জীবমায়া জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, স্বরূপত সে যে চিদ্‌বস্তু জীব-মায়াপ্রভাবে জীব তা ভুলে যায়। সে সাংসারিক সুখভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ভগবদ্-কৃপায় জীবের মায়াবন্ধন শিথিল হলে জীব আবার ভগবত্তত্ত্বে পরিণত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি হল গুণমায়া। গুণমায়া হচ্ছে বিশ্বের উপাদান কারণ; মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান কারণ, তদ্রূপ।

স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয় বলে জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। সমুদ্রের তট যেমন সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার উচ্চ তীরেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, উভয় হতে একটি পৃথক স্থান, সেরূপ। অনন্ত কোটি জীব ভগবানের জীব-শক্তির অংশ। স্বয়ং ভগবান সূর্যমণ্ডলতুল্য এবং পরিদৃশ্যমান জগতের জীবগণ তাঁর রশ্মিতুল্য। রশ্মি সূর্যমণ্ডলের বাইরে, যদিও তা সূর্যেরই অংশ। সূর্যমণ্ডলের মধ্যে রশ্মি থাকে না। তদ্রূপ জীব ঈশ্বরের অংশ হলেও ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে থাকে না, বাইরে থাকে। সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ আছে বটে, আবার অভেদও আছে বটে। অচিন্ত্য শক্তিবলেই ইহা সম্ভব। এই তত্ত্বকে বলা হয় তাই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ইহা ভিত্তিভূমি।

বৈষ্ণব পদবলীর বিভিন্ন পর্যায় ॥

বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। গৌরচন্দ্রের এই উভয় ভাব অবলম্বনে পদ রচিত হয়েছে। তথাপি তাঁর মধ্যে রাধাভাবদ্যুতিটা অধিকতর স্ফূর্তি লাভ করেছে। এই ভাবে কৃষ্ণ তাঁর কান্ত; কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মানসলীলা। গৌরলীলা তাই বৃন্দাবনলীলার ভাব প্রতিরূপ। যে সকল পদের মধ্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অনুসরণে গৌরলীলা বর্ণিত হয়েছে তাদের বলা হয় গৌর-চন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের অবতরণিকা রূপে এই পদ কীর্তনের আসরে প্রথমে গাওয়া হয় বলে ইহার নাম গৌরচন্দ্রিকা। কীর্তনীয়াগণ রাধাকৃষ্ণের যে পর্যায়ের গান করবেন 'তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র' অর্থাৎ তদনুরূপ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ প্রথমেই গেয়ে নেন। ইহাতে শ্রোতৃবর্গ গৌরচন্দ্রিকা শুনেই পূর্বহতে বুঝতে পারেন রাধাকৃষ্ণের কোন পর্যায়ের গান আসরে গাওয়া হবে। বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য নিম্নে কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

গৌর চন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী

(১) রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ কীর্তন করতে হলে এরকম পদ প্রথমে গাইতে হবে—

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ্র।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥
ছল ছল নয়ন-কমল-সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ
পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পাওল থেহ ॥

—এই গৌরচন্দ্রিকাতে শ্রোতার মানসচক্ষে যে চিত্রখানি ফুটে ওঠে তা পূর্বরাগময়ী রাধার চিন্তা-ঔৎসুক্য-উদ্বেগের চিত্র।

(২) মাথুরলীলা কীর্তনের পূর্বে এরূপ পদ গীত হয়—

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥

তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তন-বিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥

—এই গৌরচন্দ্রিকাতে সন্ন্যাসগ্রহণান্তর মহাপ্রভুর নদীয়াত্যাগে নদীয়াবাসীর অন্তরে যে নিদারুণ বেদনা উপস্থিত হয়েছে তা কৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগে ব্রজবাসীর বেদনার অনুরূপ।

গৌরাঙ্গবিষয়ক সব পদ গৌরচন্দ্রিকা নয়। যে-সমস্ত পদ রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা অনুসরণে রচিত হয়নি সেগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না। যেমন,—

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি॥
বরণ-আশ্রম কিঞ্চন-অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি- দুলহ প্রেমধন
দান করয়ে জগজনে॥
ঐছন সদয় হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

—এই পদে প্রেমবিতরণকারী পতিতপাবন হৃদয়রসময় গৌরচন্দ্রের রূপ ফুটে উঠেছে।

গৌরচন্দ্রের দিব্যজীবনকে আশ্রয় করে যেমন জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল, তেমনি তাঁর জীবনী অনুসরণে পদসাহিত্যও রচিত হয়েছে। নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ, বংশীবদন প্রভৃতি ভক্ত কবির দল মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। গৌরাঙ্গের জন্মলীলা, বাল্যলীলা, বিবাহ, দারপরিগ্রহ, অভিষেক, কীর্তন প্রভৃতি ঘটনা অবলম্বনে তাঁরা বহু পদ রচনা করে গিয়েছেন। এই পদগুলিতে উচ্চাঙ্গ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া না গেলেও এগুলিতে চৈতন্যের বাস্তবজীবনের স্বচ্ছ চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে ইহার একটি নমুনা দেওয়া হল:

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌরপদদ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

বৈষ্ণব কবিগণ রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের আদর্শে রাধাকৃষ্ণের লীলার পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় রেখে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, রাসলীলা, মাথুরলীলা, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি পর্যায় অনুসারে সাজিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখ্য পর্যায়ের—পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, ও ভাবসম্মেলন, সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

রাধাকৃষ্ণলীলার পালা-পর্যায়

মিলনের পূর্বে দর্শন-শ্রবণাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে রতির উদ্ভব হয় তা বিভাবাদি সংযোগে আস্বাদনীয় হলে পূর্বরাগ নামে অভিহিত

হয়। সংক্ষেপে, সঙ্গমের পূর্বে নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে রাগ জন্মে তাকে বলে পূর্বরাগ। বৈষ্ণব কবিগণ নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই পূর্বরাগ বর্ণনা করেছেন। যেমন,—

রাধার পূর্বরাগ

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥

মিলনার্থে সঙ্কেতকুঞ্জাভিমুখে নায়কের উদ্দেশে নায়িকার যাত্রা অথবা নায়িকার উদ্দেশে নায়কের যাত্রাকে বলা হয় অভিসার। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীরাধার অভিসার অপূর্ব চিত্রসঙ্গীতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে:

কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি তারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ— গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

'বাসকসজ্জা' অর্থ, মিলনোদ্দেশে নিজদেহসজ্জায় ও বাসগৃহসজ্জায় নিরতা। বাসকসজ্জা অবস্থায় নায়িকা নায়কের ইচ্ছাক্রমে কুঞ্জভবনে অবস্থান করে·

নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করে এবং নিজদেহ ও বাসগৃহ সজ্জিত করে। যেমন,—

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বূল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে—এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রসশিরোমণি আসিব এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

'বিপ্রলব্ধা' অর্থ, নায়কের দ্বারা বঞ্চিতা বা প্রতারিতা। সঙ্কেত করার পরেও নায়ক যখন আসে না তখন সেই বঞ্চিতা নায়িকাকে বলা হয় বিপ্রলব্ধা নায়িকা। নায়িকার বিপ্রলব্ধা অবস্থাটি জ্ঞানদাসের পদে চমৎকার ফুটে উঠেছে :

বিফলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ।
কী ফল উপচারপুঞ্জ॥
কী ফল অঙ্গসমীপ।
উজরলুঁ রতন-প্রদীপ॥
গাথলুঁ মালতীমাল।
মরমে রহি গেল শাল॥
কি ফল চতুঃসম গন্ধে।
ভূষণ বেশ সুছন্দে॥

প্রতিনায়িকার নিকট থেকে প্রভাতে আগত নায়ককে দেখে রুষ্টা

নায়িকাকে বলা হয় খণ্ডিতা নায়িকা। চণ্ডীদাস নায়িকার খণ্ডিত অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন:

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুকমাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ॥
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় হয়েছ ভূষিত॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ-চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

খণ্ডিতা নায়িকার একমাত্র আশ্রয় হল 'মান'। মানে হৃদয়বল্লভকে হারিয়ে অনুতাপ করলে নায়িকাকে বলা হয় কলহান্তরিকা। গোবিন্দদাস ইহার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

আকুল প্রেম পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥
সজনি তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সোই তাপনি জগ মাহ॥
যো হাম মান বহুত করি মানলুঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ— শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥

বৈষ্ণব কবিগণ মাথুর বা বিরহে রাধাকৃষ্ণলীলা সমাপ্ত করে দেননি। তাঁরা মাথুরের পর আবার রাধাকৃষ্ণের ভাবসম্মেলন বর্ণনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে এসেছেন এই আশায় শ্রীরাধার নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও

মনের মধ্যে অসীম আনন্দ উপলব্ধি ভাবসম্মেলনের পদে বর্ণিত হয়েছে। বিদ্যাপতির একটি পদে শ্রীরাধার ভাবোল্লাস চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে :

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাঞ্জু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার।
কদলী-রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণি সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদক হাট॥

পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য॥

পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণের পূর্বে পদাবলী বস্তুটি কি এবং এর উৎপত্তি কোথা থেকে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। পদাবলী আভিধানিক অর্থে—ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলী এবং বিশিষ্টার্থে বৈষ্ণব গীতিকবিতা। এখন আবার শাক্তগানকেও পদাবলী বলা হয়। পদসমুচ্চয় অর্থে পদাবলী শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় আচার্য দণ্ডীর (সপ্তম শতক) 'কাব্যাদর্শে' ('শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী')। এর পর দেখা যায়, কবি জয়দেব তাঁর গোবিন্দের গীতাবলীকে 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' বলে অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের উৎসভূমি হল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য। বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবকে তাই মহাজন আখ্যা দিয়েছেন, গুরুবলে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, জয়দেবের ব্যবহৃত 'পদাবলী' শব্দটি পরবর্তিকালে বৈষ্ণব সাহিত্যে গৃহীত হয়।

পদাবলীর মূল 'পদ' শব্দটির ব্যবহার অতি প্রাচীন। সঙ্গীতশাস্ত্রে গান অর্থে পদ শব্দটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। গন্ধর্ব শাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে ভরত গান অর্থে পদ কথাটির প্রয়োগ করেন ('যৎ কিঞ্চিদক্ষরকৃতং তৎ সর্বং পদসংজ্ঞিতম্')। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যেও সঙ্গীতার্থে পদ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে ('মদ্‌গোত্রাঙ্কনং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকাম্')। প্রাচীন যুগে

গানের জন্য রচিত ক্ষুদ্র স্তবককে পদ বলা হত। চর্যাগীতিকায় 'ধ্রুবপদ', 'পদ' প্রভৃতি শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে, খুব সম্ভব, জয়দেবের কাল থেকে সুরে-তালে গেয় পদাবলী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তারপর খুব স্বাভাবিক-ভাবেই পদ শব্দটি বৈষ্ণব মহাজনদের ভজনকীর্তন গানে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

বৈষ্ণবপদাবলী মূলত ধর্মসঙ্গীত হলেও ইহার একটা কাব্যিক আবেদন আছে। বৈষ্ণব কবিতার প্রধান উপজীব্য হল প্রেম। এই প্রেম পার্থিব এবং অপার্থিব দুইই। কারণ বৈষ্ণব কবিগণ মর্তের সাধারণ নরনারীর প্রেমছবি নিরীক্ষণ করে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কল্পনা করেছেন। বৈষ্ণব সঙ্গীত-রসধারা মর্তভূমি থেকে উৎপত্তি লাভ করে স্বর্গসমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়েছে, মর্তের গিরি-নদী বন-উপবনের চেনা পথ বেয়ে স্বর্গের অচেনা অসীম অনন্ত সত্য সুন্দরের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। রসজ্ঞ সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই দিকে তটভূমি, আনন্দকলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল-সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কূজিত, জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য। বিদ্যাপতি রাধার মুখে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, তাহা হইতেও বেশী, তুমি আমার নিকট পাখীর পাখা—তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই—মাছের পক্ষে জল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, জল হইতে তুলিলে সে তখনই মরিয়া যায়—আমি তোমাকে সব দিয়াছি। কিন্তু 'মাধব তুহুঁ কৈছে কহবি মোয়'—আমার সর্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়—মাধব, বল তুমি কে এবং কেমন।"[১]

বৈষ্ণব কবিতার দুটি দিক আছে—একটি হল ইহার আধ্যাত্মিকতার দিক, আর একটি হল ইহার কবিত্বের দিক। বৈষ্ণব ভক্ত অধ্যাত্মিক মার্গে ইহার বিচিত্র সঙ্গীতমাধুর্য আস্বাদন করেন এবং রসিক কাব্যিক মার্গে ইহার বিচিত্র

১। 'বৈষ্ণব পদাবলী'র (কঃ বিঃ কর্তৃক প্রকাশিত) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

রূপসৌন্দর্য উপভোগ করেন। ভক্তজন যেমন পদাবলী কীর্তন করে রসময়ের রসস্বরূপ উপলব্ধি করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান, রসিকজন তেমনি ইহা পাঠ করে সাধারণ নরনারীর প্রেমামৃত পান করে ধন্য হন। বৈষ্ণব কবিতা তাই বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষেরই প্রাণের সামগ্রী। এখন দেখা যাক, কাব্যরসিকের কাছে ইহার আবেদন কতখানি।

ধর্ম আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। ধর্ম সাহিত্যের উপাদান মাত্র। মাটির মূর্তি গড়তে যেমন কাঠ, বাঁশ, খড়, মাটি ইত্যাদির প্রয়োজন, সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে তেমনি ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সমাজ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলে জল হয়। কিন্তু অক্সিজেন ও জল এক পদার্থ নয়। সেরূপ ধর্মকে আশ্রয় করে সাহিত্য সৃষ্টি হলেও ধর্ম ও সাহিত্য এই দুই বস্তু এক নয়। ধর্ম হতে সাহিত্য সম্পূর্ণ অভিনব বস্তু। ধর্ম হল একপ্রকার গোষ্ঠীচেতনা। আর সাহিত্য, জগতের মাঝে কত বিচিত্র। ইহার কোন দেশকাল নেই, কোন সংস্কারের বাঁধন নেই। সর্বমানবের হৃদয়রসঘন আনন্দমূরতি হল সাহিত্য। বৈষ্ণব ধর্মকে অনুসরণ করে বৈষ্ণব সাহিত্য। তবু বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে একথা খাটে। বৈষ্ণব কবিতা ধর্মাশ্রয়ী হয়েও তা নিত্যকালের পাঠককে বিমুগ্ধ করে। ইহার অনিমেষ মূরতি পাঠককে কাঁদায়-হাসায়, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর চিত্তকে উদ্বেলিত করে, বিরহীর শোককে শতগুণে বর্ধিত করে। জ্ঞানদাসের রাধা অনুরাগভরে যখন বলেন,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

তখন বাসনাবিদ্ধ হয়ে আমাদের মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

বিদ্যাপতির রাধার প্রেমের নিঃসীম অনুভূতি আমাদের চিত্তকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়:

জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।

* * *

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥

গোবিন্দদাসের রাধার উদ্ধত মনোভাব প্রেমিকের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে:

কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলু
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

প্রিয়তমের দুঃখ মানুষের মর্মে যে কি নিদারুণ শেল হানে তা বোঝা যায় চণ্ডীদাসের রাধার সকরুণ উক্তি থেকে:

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনা'র মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

বৈষ্ণবকবিতাকে কেহ কেহ খাঁটি গীতিকবিতা বলে ভুল করেন। গীতিকবিতা হল কবির অহং-এর প্রকাশ। অহং-কে বিচিত্র বর্ণে-রূপে প্রকাশ করার জন্য গীতিকবি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগত নিগূঢ় অনুভূতিই (intense personal emotion) গীতিকবিতার প্রাণ। বৈষ্ণব কবিতা যে বৈষ্ণব কবির অন্তরের কথা নয়, একটা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অভিপ্রায়েরই রসমূর্তি তা সর্বজনবিদিত। বৈষ্ণব কবিতা গোষ্ঠীচেতনাপ্রসূত। কাজেই ইহাকে আধুনিক গীতিকবিতা অভিধায় ভূষিত করা যায় না। আধুনিক গীতিকবিতার আরো একটি বৈশিষ্ট্য—বিষয়বৈচিত্র্য এখানে অনুপস্থিত। শত শত বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার গতানুগতিক ছাঁচে পদ রচনা করে গিয়েছেন। তাঁদের রচনাকে সামগ্রিকভাবে তাই বড়ই ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। তবে গীতিকবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব কবিতাতে। যেমন,—

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন-তার॥

অথবা,

অবনত আনন কএ হম রহলিহুঁ বারল লোচন-চোর।
পিয়া-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল জনি সে চাঁদ চকোর॥

গীতিকবিতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য—সার্বজনীনতা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই সার্বজনীন আবেদনের জন্যই বৈষ্ণব কবিতা ধর্মকেন্দ্রিক হয়েও কাব্যরসপিপাসু পাঠকের হৃদয়কে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। বৈষ্ণব কবিতার জনপ্রিয়তার মূলে ইহাই একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে। পূর্বের উদ্ধৃতিগুলি থেকে একথা সহজবোধ্য হবে।

পদাবলীর ভাষা ও ছন্দ॥

বৈষ্ণব পদাবলী ব্রজবুলি এবং খাঁটি বাংলা—এই দুই ভাষাতেই রচিত হয়েছে। মৈথিলী ভাষাকে ভিত্তি করে গঠিত এক প্রকার কৃত্রিম ভাষায় মহাজনগণ পদ রচনা করে গিয়েছেন। এই কৃত্রিম ভাষার নাম ব্রজবুলি। ব্রজবুলি ব্রজের বুলি; রাধাকৃষ্ণ এই ভাষাতে কথা কইতেন—এধারণা ভ্রান্ত। ব্রজবুলি আসলে বাংলা-মৈথিলী মিশ্রণজাত সাহিত্যিক ভাষা।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে মিথিলা সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা থেকে অনেক ছাত্র মিথিলাতে অধ্যয়ন করতে যেত। মিথিলাতে তখন মৈথিলী ভাষার বিশেষ সমাদর ছিল। মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী ছাত্রগণ মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তারপর লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে এই ভাষার রূপান্তর ঘটে। বাঙালী গায়েন ও পাঠকবর্গ দুরূহ মৈথিলী শব্দগুলিকে অপসৃত করে সেখানে বাংলা শব্দ বসিয়ে দেন।

কালক্রমে মৈথিলী ব্যাকরণের নিয়মও শিথিল হয়ে আসে এবং ইহাতে বাংলা বাক্যরীতি অনুসৃত হতে থাকে। পরবর্তিকালে বাংলা-মৈথিলী মিশ্রণজাত এই কৃত্রিম ভাষা মহাজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরা বিপুলভাবে এই ভাষা অনুশীলন করতে থাকেন। এই কৃত্রিম ভাষাই 'ব্রজবুলি'। ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণ কথা বলতেন—এই লোকনিরুক্তি এবং দুরূহতা ও অপূর্ব ধ্বনি-ঝংকারের জন্য ব্রজবুলি বৈষ্ণব সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

আধুনিক বাংলা ছন্দের 'তিনটি প্রকারই—তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও

শ্বাসাঘাতপ্রধান, বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে ইহাতে তানপ্রধান ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের ব্যবহারই বেশী; শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের নিদর্শন খুবই কম। নিম্নে ইহাদের একটি করে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল :

তানপ্রধান ছন্দ—

কালার লাগিয়া হাম | হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল | প্রাণ নিল বাঁশী॥

ধ্বনিপ্রধান ছন্দ—

ইন্দীবর বর | উদর সহোদর | মেদুর মদহর | দেহ।
জাম্বূনদ মদ | বৃন্দবিমোহিত | অম্বর বর পরি | ধেই॥

শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ—

আ́র্ শুন্যাছ | আ́লো সই | গোঁ́রা-ভাবের | ক́থা।
কোঁ́ণের ভিতর্ | কু́লবধূ | কা́ন্দ্যা আকুল্ | ত́থা॥

পদাবলীর ছন্দ কানে শুনলে একটু ত্রুটিযুক্ত বলে মনে হবে। বৈষ্ণব পদাবলী পূর্বে গীত হত, পঠিত হত না। কীর্তনীয়াগণ গানের সময় অক্ষর-গুলিকে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতেন। কাজেই ছন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। তাহলেও বৈষ্ণব কবিগণ মোটামুটি ছন্দের একটা ক্রম রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

চৈতন্যযুগের পদাবলী সাহিত্য

চৈতন্যসমসাময়িক বৈষ্ণবপদাবলী ॥

চৈতন্যদেব জীবিতাবস্থাতেই ভগবানের অবতার রূপে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক মহিমা লক্ষ্য করে ভক্ত কবির দল পদাবলী রচনায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। যে সকল কবি মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন, রমানন্দ, গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যসমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলীর দুইটি ধারা—একটি চৈতন্য বিষয়ক পদাবলী, অপরটি রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলী। চৈতন্যবিষয়ক পদাবলী আবার বিষয়ভেদে তিনপ্রকার—গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্য জীবনীবিষয়ক (চৈতন্যের জন্ম, বাল্য, যৌবন ও সন্ন্যাস-গ্রহণ ইহার বর্ণনার বিষয়) এবং গৌরনাগরভাব-বিষয়ক। ইহাদের মধ্যে গৌরচন্দ্রিকা পরবর্তিকালে বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চৈতন্য জীবন কথার মধ্যে বাসু ঘোষের নিমাই-সন্ন্যাস পালা জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করে। গৌরনাগর ভাবের পদগুলি আদিরসাত্মক বিকৃতরুচির পদে পরিণত হয়।

চৈতন্যের সমকালীন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী সংখ্যায় অল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে ঐগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পদাবলীর উপর তখনও বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের প্রভাব পড়েনি। প্রেমোন্মাদিনী রাধার নিরাভরণ চিত্রখানি চৈতন্য-প্রত্যক্ষদর্শী কবিদের পদে সুন্দর ফুটে উঠেছে।

মুরারী গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বাল্য সহচর ছিলেন। চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মত তাঁরা শ্রীহট্ট ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। এই সূত্রে শৈশবকাল থেকেই তিনি চৈতন্যের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত ও নিমাই এঁরা সকলেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করতেন। মুরারি চৈতন্যের চেয়ে বয়সে

কিছু বড় ছিলেন। পরিহাসপটু নিমাই মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের খোঁচায় মুরারিকে অস্থির করে তুলতেন। মুরারি প্রথম জীবনে যোগোপাসক ছিলেন। পরে চৈতন্য-প্রভাবে তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মুরারি গুপ্তের প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু তিনি মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে পাঠককে বিদায় করে দিয়েছেন। তাঁর কড়চায় উল্লিখিত আছে যে প্রথমে তিনি বাংলা-ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন; দামোদর পণ্ডিতের নির্দেশে তিনি পরে চৈতন্য-জীবনীকাব্য প্রণয়ণ করেন। মুরারি গুপ্তের ভণিতায় যে দশ-বারটি পদ পাওয়া গিয়েছে তারই মধ্যে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় বিদ্যমান। চৈতন্যজীবন ও রাধাকৃষ্ণলীলা—এই উভয় বিষয়ে পদরচনায় তিনি নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। চৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বাৎসল্য রস চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন:

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লালে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্বগায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি॥

কবি রাধার আক্ষেপানুরাগের অনবদ্য ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন:

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন পুতুলি করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি-কুল-শীল-অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।

স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপ্তেতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

রাধার বিরহদশা বর্ণনায়ও যে মুরারি গুপ্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি :

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন॥
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥

মুরারি গুপ্ত যদি তাঁর কবিপ্রতিভাকে পুরোপুরি পদরচনার কাজে লাগাতেন তাহলে চৈতন্য সমসাময়িক পদাবলী সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠত।

নরহরি সরকার নবদ্বীপে চৈতন্যের পার্শ্বচর ছিলেন। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করে তিনি বিখ্যাত হন। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। নবদ্বীপের টোলে অধ্যয়নকালে নিমাই-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

নরহরি সরকার

নরহরি সরকার গৌরনাগর সাধনার প্রথম সূত্রপাত করেন এবং গৌরনাগর ভাবের পদ রচনা করে এক বিচিত্র ধরনের গৌরাঙ্গ-ভক্তির পরিচয় দেন। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের চক্ষে ইহা বিসদৃশ বলে মনে হয়েছিল। খুব সম্ভব একারণে কোন প্রামাণিক চৈত্যন্যজীবনী গ্রন্থে তাঁর বিশেষ পরিচয় উল্লিখিত হয়নি।

নরহরি নামে দুজন কবি ছিলেন। প্রথম জন চৈতন্য সমকালীন কবি, নাম নরহরি সরকার; দ্বিতীয় জন অষ্টাদশ শতকের কবি, নাম নরহরি চক্রবর্তী। নামের সাদৃশ্য থাকায় জন্য উভয়ের পদের মধ্যে গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

উভয়ের রচনারীতির মধ্যে অবশ্য কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। নরহরি সরকারের ভাব ও ভাষা দুইই সরল। নরহরি চক্রবর্তীর ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশী। তিনি অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে রচনা করেন এবং তাঁর পদগুলি অনেকটা কৃত্রিম, শব্দাড়ম্বরময় ও জটিল। নরহরি চক্রবর্তী কিছু পদ 'ঘনশ্যাম দাস' ভণিতায় রচনা করেন।

নরহরি সরকারের ভণিতায় রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক দু-তিনটি পদ পাওয়া গিয়েছে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও শিল্পোৎকর্ষে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধাকৃষ্ণের হৃদয়ব্যাকুলতা বর্ণনায় নরহরি বেশ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। বিরহখিন্ন রাধার বিপন্ন অবস্থা শুনে বিদগ্ধ শিরোমণি কানাই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। নরহরির পদে ইহা চমৎকার ফুটে উঠেছে—

রাই-বিপতি শুনি বিগদ্ধ শিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
পুন পুন পরশই নাসা।
বিছুরল চরণ রণিত মণিমঞ্জীর
বিছুরল মুরলিক রন্ধ্র।
বিছুরল বেশ বসন ভেল বিগলিত
বিগলিত শিখিপুছচন্দ্র।

বিরহিণী রাধার অশ্রুসিক্ত মর্মান্তিক কাতরোক্তিও বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে নরহরির রচনায়:

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে।

সংখ্যা ও গুণের দিক থেকে নরহরির গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভণিতায় দুইশতের অধিক পদ পাওয়া গিয়েছে। গৌর-নাগরভাবের পদরচনা করে নরহরি পদাবলী সাহিত্যের একটা নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেছেন। এই শ্রেণীর পদে নবদ্বীপ-নাগরীদের আবেগ-উৎকণ্ঠা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

বেলি অবসানে ননদিনী সনে
জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসী ভাঙ্গিয়া এনু।
কাঁপে কলেবর, গায়ে আসে জর,
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে
সাঁতারে না পাই থা।
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল
বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে
মদন কাঁপয়ে ডরে।
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ মাধুরী
যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার সকলি মজিল
গোরাচাঁদের অনুরাগে।

গৌরাঙ্গ-বিরহ বর্ণনায় নরহরির কবিত্বশক্তির আরো নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

সোনার বরণ গৌরসুন্দর
পাণ্ডুর ভৈগেল দেহ,
শীতে ভীত যেন কাঁপয়ে সঘন
সোঙরি পূরব নেহ।
কিছু না কহই দীঘ নিশাসই
চিত্রের পুতলী পারা।
নয়ন যুগল বাহি পড়ে জল
যেন মন্দাকিনী ধারা।

শিবানন্দ সেন

শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিল কাঁচড়াপাড়ায়। মহাপ্রভু পুরী থেকে বৃন্দাবন যাত্রার পূর্বে গৌড়ে এসে তাঁর কাঁচড়াপাড়ার বাটিতে অবস্থান করে-ছিলেন। প্রতি বৎসর রথের সময় তিনি ভক্তগণকে নিয়ে নীলাচল যাত্রা করতেন।

শিবানন্দ উচ্চ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন না। সর্বসাকুল্যে সাতটি কি আটটি পদ তিনি রচনা করেছিলেন। চৈতন্যের পার্শ্বে থেকে তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করায় সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য বৈষ্ণব সমাজে তিনি বিশেষ পরিচিত। তা হলেও তাঁর দু'একটি পদে মহাপ্রভুর প্রেমঘন মূরতি-খানি সুন্দর ফুটে উঠেছে:

অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করল বাদর।
উচা নীচ যত ছিল প্রেমজলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরিণাম মহামন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত তারা হৈল ভাগবত
বাঢ়িল গৌরাঙ্গঠাকুরালি॥
জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈণু মায়াভোলে
প্রভু মোরে দেহ পদছায়া॥

গোবিন্দ ঘোষ

মুর্শিদাবাদের বল্লভ ঘোষের তিন পুত্র—গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব পদরচনায় ও কীর্তনগানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিন ভাইএর মধ্যে কীর্তনে মাধবঘোষ এবং পদরচনায় বাসুদেব ঘোষ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। তিনজনেই মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর নির্দেশে গোবিন্দ পুরীধামে রয়ে যান এবং মাধব ও বাসুদেব বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনজনেই নিবিড় আন্তরিকতা ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

গোবিন্দ ঘোষ কেবল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেন। সহজ সরল

প্রকাশভঙ্গী ও বাস্তবতার জন্য তাঁর পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পদে ভক্তপ্রাণের ব্যাকুলতার চরম স্ফূর্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতুলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তন বিলাস॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া॥

মাধব ঘোষ

মাধব ঘোষ ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণলীলা এবং বাংলাতে গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদ রচনা করেন। তাঁর রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ সংখ্যায় মাত্র দু' তিনটি। তথাপি ইহাতে কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর আছে। রাধার বিরহ-দশা কবি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন:

শকতি ক্ষীণ অতি উঠই ন পারই
কাতরে সখী মুখে চাই।
পরশি ললাট করহি মুখ ঝাঁপল
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই॥
মাধব করুণা কি লব তোহে নাই।
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ
এ দুহুঁ পদ দরশাই॥
রাইক পেখি ধরণী পর লুঠই
কত কত সারঙ্গ নয়নি।
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত
জীবইতে সংশয় জানি॥

মাধব ঘোষ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদরচনায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নৃত্যপর গৌরাঙ্গের নয়ন ভোলানো মূরতিখানি কবি আশ্চর্যসুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন :

নাচে পহুঁ কলধৌত গোরা।
অবিরত পূর্ণকল মুখ বিধুমণ্ডল
নিরবধি প্রেমরসে ভোরা॥
অরুণ কমল না কি জিনি রাঙ্গা দুটি আঁখি
ভ্রমরযুগল দুটি তারা।
সোনার ভূধরে যৈছে সুরনদী বহে তৈছে
বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা॥
কেশরীর কটি জিনি তাহাতে কৌপীনখানি
অরুণ বসন বহির্বাস।
গলায় সোনার মালা করিছে ভুবন আলা
নাসা তিলকুসুম বিকাশ॥
কনক মৃণালযুগ সুবলিত দুটি ভুজ
করযুগ কুঞ্জর বিলাস।
রাতা উতপল ফুল নহে পদ সমতুল
পরশনে মহীর উল্লাস॥
আপাদমস্তক গায় পুলকে পূরিত তায়
যৈছে নীপফুল অতি শোভা।
প্রভাতে কদলি জনু সঘনে কম্পিত তনু
মাধব ঘোষের মনোলোভা॥

বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণ বিষয়ক পদ রচনা করে প্রভূত যশ অর্জন করেন। গৌরাঙ্গের নদীয়ালীলার তিনি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বলে তাঁর পদাবলীতে বিবৃত বৃত্তান্তকে অনেকে চৈতন্য-জীবনীকাব্য অপেক্ষা বেশী মান্য করেন। চ�ৈতন্যের জীবনকথার একটা বাস্তবসম্মত রূপ দিয়ে তিনি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহা একটি অভিনব সংযোজনা হিসেবে গণ্য হতে পারে।

বাসুদেব ঘোষ

বাসু ঘোষের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী দুটি ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ের পদগুলি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অনুসরণে রচিত হয়। চৈতন্যকে

রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য বাসু ঘোষ এই কৃত্রিম পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করে এই শ্রেণীর পদকে উচ্চতর কবি-কল্পনার আধার বলে গ্রহণ করা যায় না। যেমন, রাধার মান বিষয়ক পদের অনুসরণে মানী গোরার চিত্রখানি :

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কান্দে ঘন ঘন।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে॥
সুগন্ধি চন্দন গোরা নাহি মাখে গায়ে।
ধুলায় ধূসর তনু ভূমি গড়ি যায়ে॥
মানে মলিন মুখ কিছুই না ভায়।
রজনী দিবস গোরা জাগিয়া গোঙায়॥

এই শ্রেণীর পদ রচনা করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কবি বিকৃত রুচির পঙ্ককুণ্ডে নেমে গিয়েছেন। যেমন, দানী কৃষ্ণের সঙ্গে গৌরাঙ্গকে মেলাতে গিয়ে কবি বলছেন,—

গৌরাঙ্গ চান্দের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল॥
কিসের বা দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেড় দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী॥
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে।
নগরে নাগরী সব পড়িল বিপাকে॥

বাসু ঘোষ অনেকগুলি গৌরনাগরভাবের পদ রচনা করেন। এগুলিতে নাগরীদের বাসনা-কামনার নিরাবরণ প্রকাশ ঘটলেও এগুলি আস্বাদনে বিশেষ বাধা উপস্থিত হয় না। যেমন, আক্ষেপ অনুরাগের একটি পদ—

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ বিদরে।
নিরবধি ছলছল আঁখিজল ঝরে॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি।
নিরবধি মনে পড়ে গোরা গুণনিধি॥
কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে।
অনুখন গোরাপ্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥

গৌরাঙ্গ পিরীতিখানি বড়ই বিষম।
বাসু কহে নাহি বহে কুলের ধরম॥

অথবা, রসোদ্গারের একটি পদ—

শয়নমন্দিরে হাম শুতিয়া আছিলুঁ
নিশির স্বপনে আজি গৌরাঙ্গ দেখিলুঁ॥
সেই হৈতে প্রাণ পোড়ে শুন গো সজনি।
গোরারূপ মনে পড়ে দিবস রজনী॥
গোরা গোরা করি সখি কি হৈল অন্তরে।
বসন ভিজিল মোর নয়নের লোরে॥
আলসে অবস গা ধরণে না যায়।
গোরাভাব মনে করি বাসু ঘোষ গায়॥

বাসুঘোষের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলীর দ্বিতীয় পর্যায়ের পদগুলিতে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ও নীলাচলের জীবনলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই শ্রেণীর পদে বাসুঘোষের কবিত্বশক্তির নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যের মানবিক রূপটি এখানে কবি আন্তরিক সহানুভূতির আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। যেমন, মহাপ্রভুর নীলাচললীলার একটি পদ—

সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে শুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়াগিরি ধূলায় লোটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মূরছায়॥
উত্তান শয়নে মুখ ফেনায় ভরিল।
বাসুঘোষের হিয়া গরলে জারিল॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাসু ঘোষ বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতরোক্তি মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গিনীরে পাইয়া বিরলে।
ব্যাকুল হিয়ার গদগদ কিছু বলে॥

আজি কেন নদীয়া উদাস লাগে মোরে।
অন্নে নাহি পাই সুখ দুটি আঁখি ঝুরে॥
নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ দক্ষিণ নয়ন।
খসিয়া পড়িল মোর কর্ণের ভূষণ॥
সুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা।
ভ্রমর না খায় মধু শুকাইল পাতা॥
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবীর ধারা।
কোকিলের রব নাহি হৈল মূক পারা॥

রামানন্দ বসু

রামানন্দ বসু কুলীনগ্রাম (অধুনা এই গ্রাম বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তরগত মেমারী রেল স্টেশনের নিকটে অবস্থিত) নিবাসী শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থপ্রণেতা মালাধর বসুর সুযোগ্য পুত্র। তিনি চৈতন্যের পরম ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব রামানন্দকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কুলীনগ্রাম বৈষ্ণবধর্মচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ মহাপ্রভুর খুবই প্রিয় ছিল। এসকল কারণে হরীধামে মহাপ্রভু একবার কথায় কথায় রামানন্দকে বলেছিলেন,—

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥

রামানন্দ রাধাকৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা—এই উভয় বিষয়ে পদ রচনা করেন। তাঁর ভণিতায় সতেরটি পদ পাওয়া গিয়েছে। সংখ্যায় অল্প হলেও পদগুলিতে রামানন্দের শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় আছে। কবি পূর্বরাগময়ী রাধার স্বপনসুখ ও নিদ্রাভঙ্গে বিলাপোক্তি একটি পদে অপূর্বসুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন :

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥
শাওন মাসের দে রিমিঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক— পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥

বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিনু মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিনা যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিয়া জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু সেহ নহে সতি।
আকুল পরাণ মোর দুনয়নে বহে লোর
কহিলে কি যায় পরতীতি॥

গৌরলীলা বর্ণনায়ও কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন :

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা গাঁথনি॥
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেনে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন ডাক ঊর্ধ্ববাহু করি।
পতিত জনারে পহুঁ বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমাগুণ জগজনে গায়।
বসু রামানন্দ তাহে প্রেমধন চায়॥

বংশীবদন

বংশীবদন চট্টো চৈতন্যের প্রতিবেশী ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য নীলাচল গমন করলে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁর উপরেই পড়েছিল। বংশীবদন সম্ভবত চৈতন্যের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ে অনেকগুলি পদ রচনা করেছিলেন। বংশীবদন ছাড়া শ্রীনিবাস আচার্যের এক শিষ্য বংশীদাসের ভণিতায় কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়েছে। ইহাতে বংশীবদন ও বংশীদাসের পদের মধ্যে মেশামেশি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। তবে বংশীবদন ভণিতার পদগুলি বংশীবদন চট্টোরই রচনা মনে হয়। শ্রীরাধার পূর্বরাগ বর্ণনায় বংশীবদন কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন :

আজ দেখিনু রূপ কদম্বের তলে।
হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি জানি হৈল
নিরবধি ধিকি ধিকি জ্বলে॥
কেন বা চঞ্চল চিত নিবারিতে নারি গো
মন মোর স্থির নাহি বান্ধে।
তিলে তিলে বারে বারে মুরছা পাইয়া থাকি
চেতন পাইলে প্রাণ কান্দে।
ধীরে ধীরে পা খান বাড়াই কত ছল করি
তাহে গুরুজনেরে ডরাই।
বংশীবদনে কহে শুন অনুরাগিণি
পিরিতি অনল না নিভাই।

শুক-শারীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বংশীবদনের কবিত্বের আর একটি নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি এখানে রূপক-প্রতীকের সাহায্যে রাধাকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য গভীরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে।
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ-কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে।
শারী বোলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন শারি আমরা বনপাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বংশীবদনে বলে চাঁদ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ-কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥

বংশীবদনের গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি বাস্তবরসে সমুজ্জ্বল। নিমাই-এর সন্ন্যাসগ্রহণে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কাতরোক্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় :

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ॥

আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত চাতক লইয়া।
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চাহিয়া ॥
আর কি দু-ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথাও নাই ॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ ॥

মুকুন্দ ও বাসুদেব

বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত দুভাইই চৈতন্যের প্রিয় ভক্ত ছিলেন। বাসুদেব নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং মুকুন্দ সাঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। অনুমান হয় দুজনে কিছু কিছু করে পদ রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি সব আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই তাঁদের কবিত্বশক্তির মূল্য নির্ণয় করা আপাতত সম্ভব নহে। তাঁদের যে একটি করে পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে নিম্নে সেগুলি উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

(১) মুকুন্দের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ—

আরে আমার গোরাঙ্গ গোপীনাথ।
যাহার লাগিয়ে গেহ গুরু ছোড়নু
সেহি করল পরমাদ ॥
অপরূপ বেশ কেশ সব মুণ্ডন
পিন্ধন অরুণ কৌপীন।
যো পহু ত্রিভুবন রস-উল্লাসিত
সেহি বেশ সন্ন্যাস প্রবীণ ॥
ঞিহা গুণ সোঙরি রোয়ত শান্তিপুর-নাথ
যব পহুঁ নীলাচলে যাই।
হেরইতে প্রেম-অন্ধ মুকুন্দ মন ভুলল
লগাওত লোক বুঝাই ॥

(২) বাসুদেবের দৃষ্টিতে নটরাজ গোরার অপরূপ রূপ—

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম- বিনোদ নবনাগর
বিহরে নবদ্বীপ মাঝ।
কুটিল কুন্তল গন্ধ পরিমল
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির
দুয়ারে দেয়ই কপাট।
করিবর-কর জিনি বাহুর সুবলনি
দোসরি গজমোতি হারা।
সুমেরু শিখরে যৈজন ঝাঁপিয়া
বহই সুরধুনি-ধারা॥
রাতুল অতুল চরণ যুগল
নখমণি বিধু উজোর।
ভকত-ভ্রমরা সৌরভে মাতল
বাসুদেব দত্ত রহু ভোর।

গোবিন্দ আচার্য

গোবিন্দ আচার্য চৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কিছু সংখ্যক উৎকৃষ্ট পদ লিখে গিয়েছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে একাধিক গোবিন্দের আবির্ভাব হওয়ায় কোন্‌টি কোন্ গোবিন্দের পদ তা নির্ণয় করা একপ্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। যা হোক বৈষ্ণব-পদ সঙ্কলন গ্রন্থে তাঁর নামে যে সমস্ত পদ সংগৃহীত হয়েছে তাদের মধ্য থেকে দু-একটি এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা হল। নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দের সনে কিরূপ লীলা প্রকটন করতেন তারই অতি সুন্দর ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন গোবিন্দ আচার্য :

নাচে শচীনন্দন দেখেন শ্রীসনাতন
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর।

প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাইয়া পড়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর।
নিত্যানন্দমুখ হেরি বলে পহুঁ হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে।
শ্রীবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন পাগল জগজন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ।

শ্রীরাধার রূপানুরাগ বর্ণনায়ও কবি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন :

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ইসত হাসির তরঙ্গহিল্লোলে
মদন মুরুছা পায়।
সে শ্যাম নাগরে কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে।

* * *

মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে।
কপালে চন্দন— ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে।

এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়।

চৈতন্য তিরোধানের পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলী ॥

ভাবৈশ্বর্য ও শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তিকালের পদাবলী সাহিত্য সর্বোৎকৃষ্ট। এযুগে দ্বিজ চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দদাসের মত উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবিগণের আবির্ভাব হয়েছিল। চৈতন্যের প্রেমবারিনিষেকে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য যে বসন্তের অজস্র পত্র পুষ্পের মত মুকুলিত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে এযুগের কবিদের রচনায়।

চণ্ডীদাস সমগ্র পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। ইতিপূর্বে তাঁর কবিকৃতি নিয়ে যে সংশয়-বিতর্ক শুরু হয়েছে তার পরিচয় চণ্ডীদাস-সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখন চণ্ডীদাসকে চৈতন্যের অব্যবহিত পরবর্তিকালের কবি বলার কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে :

দ্বিজ চণ্ডীদাস

(১) চণ্ডীদাসের পদে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদগ্রস্ত জীবনের চিত্র সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—

অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়।

অথবা,

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥

(২) রাধা এখানে নায়িকামাত্র নহেন, তিনি যোগিনী। পূর্বরাগময়ী রাধার অন্তরদশা বর্ণনকালে চণ্ডীদাস তাই বলছেন,—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা॥

(৩) মহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণনাম মহিমা চণ্ডীদাসের পদে অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে। পূর্বরাগময়ী রাধার উক্তিতে তা পরিস্ফুট,—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

অথবা,

কালিয়া-ভূষণ কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল।

(৪) বিশুদ্ধ ভাব ও মার্জিত রুচি—যাকে চৈতন্যপ্রভাবের ফল বলে গণ্য করা হয়, চণ্ডীদাসের পদে তার নিবিড় পরিচয় লাভ করা যায়। রাধার দেহজ বাসনা কামনার উদগ্র প্রকাশ কোথায়ও ঘটেনি ; তিনি বিরল মনের কথাকে সদাই হৃদিমাঝারে সযত্নে রেখে দেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন,—

হিয়ার মাঝরে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা।
যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়ানকোণে।
তবু সে সজনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে।

হায় অভাগিনী　　　পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি　　　পুড়িছে পরাণী
ঠেকিয়া পিরীতি রসে।
অনুক্ষণ মন　　　করে উচাটন
মুখে নাহি সরে কথা।
চণ্ডিদাসের মন　　　অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি। যিনি প্রাণের মধ্যে, মর্মের মধ্যে প্রবেশ করেন তিনি সহজ ভাষায় গভীর ভাব প্রকাশ করতে পারেন। কবি শব্দের অর্থ হল ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ যাঁর দেখা মানুষের চোখের দেখাকে অতিক্রম করে। সাধারণের দৃষ্টিতে বস্তুজগৎ জড়, অচেতন। কোথাও কোন সুন্দর দৃশ্য দেখলে বা মধুর শব্দ শুনলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। এই খুশি হওয়ার ভাবটি বড় জোর 'আঃ' 'উঃ', 'বাঃ', 'সুন্দর', 'চমৎকার', 'অপূর্ব, 'অদ্ভুত' ইত্যাদি কতকগুলি পদের সাহয্যে ব্যক্ত হয়। সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে প্রাণের কোন রহস্য মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। যিনি কবি তিনি কল্পনার সাহায্যে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে সত্য উদ্ধার করে নিয়ে আসেন এবং অন্তর হতে বচন আহরণ করে তিনি :তা দিয়ে আনন্দলোক বিরচন করেন। চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর কবি। মানুষের অন্তরবেদনাকে তিনি সহজ সরল কথায় ব্যক্ত করেছেন বলে বাঙালীর তিনি প্রাণের কবি, কাব্যরসিকের কাছে তিনি ঋষিকবি।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব

কবিগুরুর মতে যিনি সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, তিনি এক ছত্র লেখেন ও পাঠককে দিয়ে দশ ছত্র লিখিয়ে নেন। চণ্ডীদাসের দুএকটি পদ উদ্ধৃত করে একথার তাৎপর্য নিরূপণ করা যেতে পারে। যেমন,—

এ ঘোর রজনী　　　মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে　　　বঁধুয়া তিতিজে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥১॥

সই কি আর বলিব তোরে।
বহু পুন্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে ॥২॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ॥৩॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে ॥৪॥

—এই পদের প্রথম স্তবকে রাধা ঘোর দুর্যোগের রাত্রিতে শ্যাম-বঁধুয়াকে দেখে নিদারুণ অন্তরবেদনা অনুভব করেছেন। দ্বিতীয় স্তবকে আবার রাধার সুখের উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। দুঃখের পরে হঠাৎ কবি সুখের কথা বললেন কেন? ইহার উত্তর, কবি পাঠককে সব কথা খুলে বলবেন না। এক কথা বলে তিনি পাঠককে দিয়ে এখানে দশকথা বলিয়ে নিয়েছেন। রাধার অন্তরের মধ্যে দুঃখ-সুখের দ্বন্দ্ব চলছে। শ্যামকে ভিজতে দেখে তাঁর দুঃখ, শ্যামকে ভিজতে দেখে তাঁর সুখ। রাধাহৃদয়ের এই তরঙ্গভঙ্গ কবি প্রথম দুই স্তবকের মধ্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয় চতুর্থ স্তবকে ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। রাধা সুখে-দুঃখে একেবারে আকুল হয়ে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন, শ্যাম-বঁধুয়া যেমন তাঁর জন্য দুঃখ পেয়েছেন, তিনিও তেমনি ঘরে অনল ভেজিয়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় করে ততোধিক দুঃখ বরণ করে নেবেন।

'আরেকটি দৃষ্টান্ত—

সই, কেমন ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া নাচায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥

যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥

রাধা এই অভিশাপ—'আমার অন্তর যেমতি করিছে তেমতি হউক সে' দিলেন কেন? এই একটি কথার মধ্যে চণ্ডীদাস অনেক কথা বলেছেন। পাঠককে সেসব কথা বুঝে নিতে হবে। রাধা যে দুঃখ পেয়েছেন তার তুলনা জগতে নেই। কাজেই তাঁকে বলতে হল—'আমার অন্তর যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।' রাধার অন্তরের অবস্থাটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারা যায় এই অভিশাপ বাণী থেকে।

কবিগুরু বলেছেন,—চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। দুঃখকে বরণ করে নিতে গেলে যে মানসিক স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন চণ্ডীদাসের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় আছে। মিলনে তাঁর উল্লাস নেই কারণ মিলনজাত সুখ মোহ সৃষ্টি করে প্রেমের দৃষ্টিকে অবরোধ করে রাখে। একমাত্র দুঃখের অভিঘাতে প্রেমকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। চণ্ডীদাস শতবার করে বলেছেন,—'যার যত জালা তার ততই পিরীতি'। পিরীতি-রতনই জগতের সার। চণ্ডীদাস বলেন,—

পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা?

দুঃখের পথে পিরীতির তূর্য বাজে। পিরীতির সাধনা বড় কঠিন সাধনা। চণ্ডীদাসের রাধা লজ্জা-শঙ্কা ত্যাগ করে রাত্রিদিনে কেবল পিরীতির সাধনা করেন, কিন্তু তবুও তিনি ইহার হদিস পান না। শ্যামকে তিনি তাই বলেন,—

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥

শুধু ইহাই নয়। পিরীতির জন্য তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। শ্যামকে তিনি সেকথা জানিয়ে দিচ্ছেন,—

বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

তাই বলে রাধা পিরীতির জন্য কেবল শ্যামের মুখ চেয়ে তাঁর করুণার উপর নির্ভর করে থাকেন না। ইহার জন্য তিনি কঠোর দুঃখের তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। চণ্ডীদাস তার ইঙ্গিত দিয়েছেন,—

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পরিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি-সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি-আশ॥

এতক্ষণ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। এবার চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ লীলার কোন্ কোন্ পর্যায়ের পদরচনায় কিরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে।

পূর্বরাগ, অনুরাগ ও আত্মনিবেদনের পদরচনায় চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণকে দেখার পর রাধার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। অন্তরের বেদনা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করতে পারছেন না। বিরলে বসে অবিরত কৃষ্ণের ধ্যান করে চলেছেন। জগতের মধ্যে যেখানে কৃষ্ণসদৃশকে খুঁজে পাচ্ছেন সেখানে তিনি নয়নপাখীকে বেঁধে রাখছেন। পূর্বরাগময়ী রাধার এই চিত্রখানি চণ্ডীদাস অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন :

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ-পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী-পারা॥

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠি করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

—এই পদে রাধার যে নির্বাক মনের মর্মের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই। কবি এখানে রাধাকে যোগিনী সাজিয়েছেন। কিন্তু সকলের অগোচরে তিনি নিজেই যে কতকাল যোগী সেজে এই পদটি রচনা করার জন্য তপস্যা করেছেন তা যিনি কবি তিনিই সেকথা বুঝবেন। চণ্ডীদাস সত্যই কবিতাপস।

পূর্বরাগময়ী রাধার অন্তর ব্যাকুলতা চণ্ডীদাসের পদে চমৎকার ফুটে উঠেছে :

জলদবরণ দলিত অঞ্জন
উদয়িছে সুধাময়।
নয়ন চকোর পিতে উতরোল
নিমিখ নাহিক সয়॥

সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে॥

কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনী
দোলে গলে বনমাল।
মধুর লোভেতে ভ্রমরা বুলয়ে
বেড়িয়া তহি রসাল॥

দুইটি নয়ান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে॥
চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সে জন ভুলিল
কি তার কুলবিচার॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনাতেও কবি অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই শ্রেণীর পদে কবি কেবল কৃষ্ণের বিমুগ্ধ চঞ্চল চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করেননি সেই সঙ্গে লাবণ্যময়ী রাধার অপরূপ রূপও অঙ্কিত করেছেন:

তড়িতবরণী হরিণ নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন্ বা রাজে॥
সই কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ॥

* * *

হৃদয়ে আছিল বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন মন্দিরে শয়ন করে যে
সে যেনে নাগর কে॥
হিয়ার মালা যৌবনের ডালা
পসারি পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া
তাহাতে বৈসাল হেন॥

অধরসুধা পড়িছে জুদা
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমনি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি ॥

পিরীতি-ফাঁদে পড়ে মানুষ দয়িতকে জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বলে মনে করে। তাকে নিয়ে মানুষের কত কল্পনা। তাকে ঘিরে কত আশা-সান্ত্বনার মেঘ জমে ওঠে মানুষের চিত্তে। দয়িত যে একমাত্র বন্ধু একথা বোঝানর জন্য কত কৌশলই না তাকে অবলম্বন করতে হয়। মানবচিত্তের এই অবস্থা চণ্ডীদাস অনুরাগময়ী রাধার উপর আরোপ করেছেন। রাধাকে তাই দেখি অন্তর-ব্যথাকে তিনি করুণভাবে কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করেছেন,—

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গুঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায় ॥

কালা-রূপে মুগ্ধা রাধার চিত্তদশা কবি মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন অনুরাগময়ী রাধা সখীর কাছে দুঃখ জানাচ্ছেন এই বলে,—

কাল-জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি ॥
আলো আলো সই মুঞি গণিলুঁ নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥
মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল ॥

চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥

আত্মনিবেদনের পদে রাধার কৃষ্ণপ্রেমের সম্যক্ স্ফূর্তি ঘটেছে। মর্ত-প্রেম অধ্যাত্মচেতনার রঙে কিরূপ অপূর্ব মুরতি ধারণ করতে পারে চণ্ডীদাসের মহতী কবিকল্পনাতে তা এখানে সম্ভব হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে রাধা বলছেন,—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে ত্রকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণ নাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

আত্মনিবেদনের ভাবটি অপর একটি পদে আরো সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। চণ্ডীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি তারই পরিচয় আছে এই পদে :

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্যসম
তোহারি চরণ খানি ॥

—এ কেবল প্রেমময়ী রাধার হৃদয় বাণী নয়, মানবাত্মার শাশ্বত বাণী। চণ্ডীদাস নিরাভরণ ভাষায় ইহা প্রকাশ করে ভক্ত, পাঠক সকলেরই প্রাণমন কেড়ে নিয়েছেন।

বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় যে-সমস্ত কবি বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে বৈষ্ণবসমাজ ও সাধারণ পাঠকসমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন জ্ঞানদাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রসের নিরাভরণ প্রকাশ ঘটিয়ে চণ্ডীদাস প্রতিভার একটা বিস্ময়কর নিদর্শন রেখে গিয়েছেন এবং তাঁরই ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস রূপ ও রসের যথাযথ মিশ্রণ ঘটিয়ে যে কাব্য মূরতি গঠন করে গেছেন তা অন্যত্র দুর্লভ। চণ্ডীদাসের মধ্যে অনুভূতির

জ্ঞানদাস

গাঢ়তা আছে। জ্ঞানদাসের পদে গাঢ়তা ততটা নেই। এই অভাবটুকু তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সৃষ্টি করে অনেকটা পূরণ করে নিয়েছেন। চণ্ডীদাসের রাধা তদ্গতচিত্ত হয়ে বলেন,—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥

আর জ্ঞানদাসের রাধা বলেন,—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥

—এই স্তবকে দেখা যাচ্ছে, রাধিকার মনের মধ্যে একটু দ্বিধা ভাব রয়ে গিয়েছে। 'হেন মনে করি' এই পর্বটির মধ্যে তা প্রকাশিত। চণ্ডীদাসের রাধার মত তিনি 'দেহ মন আদি' কৃষ্ণকে নিঃসংশয়ে সমর্পণ করতে পারেননি। ইহাতে বোঝা যাচ্ছে, চণ্ডীদাসে ভবব্যাকুলতা যতটা গভীর, জ্ঞানদাসে ততটা নয়।

চণ্ডীদাসের রাধা বলেন,—

পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু-মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥

জ্ঞানদাসের রাধা বলেন,—

অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥

—এই স্তবকে দেখা যাচ্ছে, অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা দিয়ে রাধাকে তাঁর প্রেম যে অনন্যসাধারণ তা কৃষ্ণকে বোঝাতে হচ্ছে। আর, চণ্ডীদাসের রাধা কোন বাচবিচার না করে হেলায় তনু-মন ঢেলে দিয়েছেন কৃষ্ণের চরণে।

তুলনায় চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম যে জ্ঞানদাসের রাধার চেয়ে গাঢ়তর তা অনুভূত হচ্ছে।

চণ্ডীদাসের রাধা বলেন,—

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

জ্ঞানদাসের রাধা বলেন,—

নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

—এখানে রাধা কৃষ্ণের কাছে নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, চান্দা ইত্যাদি রূপের আরোপের দ্বারা তাঁর প্রেম ব্যক্ত করছেন। চণ্ডীদাসের রাধার এসব বাহ্যরূপের কোন প্রয়োজনই হয়নি। বঁধুর জন্য তিনি কলঙ্ককে কণ্ঠের হার করে নিয়েছেন। প্রেমকে সম্যকরূপে প্রকাশ করার ভাষা বুঝি এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি নিত্যানন্দের ভক্ত ছিলেন এবং নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবীদেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরামদাস প্রভৃতির সঙ্গে তিনি খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। গৌরলীলা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা—এই উভয় বিষয়ে জ্ঞানদাস পদরচনা করেন। রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলীই তাঁর প্রতিভার যোগ্য ধারক ও বাহক। তাহলেও গৌরলীলা বর্ণনায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে গৌরাঙ্গরতন রাজে
প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন আভা জগত হইল লোভা
পাপ তম লুকাল তুরিতে॥

আয় দেখি গিয়া গোরা চাঁদে।
এ চাঁদবদনের আগে গগনের চাঁদ কি লাগে
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে ॥
পায়িলে চাঁদের সুধা দূরে নাকি যায় ক্ষুধা
তাই তারে বলে সুধাকর।
এ চাঁদের নামে সুধা পানে যায় ভবক্ষুধা
হয় জীব অজর অমর ॥
গোরামুখ সুধাকরে হরিনাম সুধা ঝরে
জ্ঞানদাস সে অমৃত চাখি।
এড়াবে সংসার শঙ্কা গোরানামে মারি ডঙ্কা
শমন কিঙ্করে দিবে ফাঁকি ॥

জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার সম্যক স্ফূর্তি ঘটেছে রাধাকৃষ্ণলীলার অনুরাগ পর্যায়ের পদাবলীতে। যেমন,—

আলো মুঞি কেন গেলুঁ যমুনার জলে।
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে পরাণ পুতুলি রৈল বান্ধা ॥
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোঁড়া ॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী হইয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক ॥

আত্মনিবেদনের পদেও জ্ঞানদাসের কবিত্বশক্তির নিবিড় পরিচয় লাভ করা যায়। এই শ্রেণীর একটি পদ—'বঁধু তোমার গরবে গরবিণী আমি' পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির মত জ্ঞানদাস চিত্ররূপ ও ধ্বনি সৃষ্টিতে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন :

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাদুরীবোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঝাঁ ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥

গোবিন্দদাস ছিলেন জ্ঞানদাসের সমসাময়িক। শ্রীখণ্ডের মাতুলালয়ে কবি জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় গোবিন্দদাস মাতুলালয়েই লালিত-পালিত হন। তাঁর মাতামহ দামোদর সেন পণ্ডিত ও ধনী ছিলেন। দামোদর শক্তির উপাসনা করতেন। তাঁর প্রভাবে পড়ে প্রথম জীবনে গোবিন্দদাসও শাক্ত হয়ে যান। সম্ভবত তিনি শাক্ত পদও রচনা করেছিলেন। পরে অধিক বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের সংস্পর্শে এসে গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব হয়েই তিনি পদাবলী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অসামান্য কবিযশ অর্জন করে 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হন।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

গোবিন্দদাস কেবল ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। সংখ্যা ও গুণের দিক থেকে তাঁর পদাবলী অতুলনীয়। জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, গোবিন্দদাস তেমনি বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। কবি বল্লভ দাসের একটি পদ থেকে আমরা জানতে পারি,—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

বৈষ্ণবসমাজে গোবিন্দদাস দ্বিতীয় বিদ্যাপতিরূপে খ্যাত। এখন উভয়ের কবিত্বগুণ আলোচনা করে দেখা যাক কথাটা কতদূর সত্য। গোবিন্দদাস

ও বিদ্যাপতি দুজনেই বিদগ্ধ কবি। অলংকার শাস্ত্রে উভয়ের পাণ্ডিত্য ছিল। তবে গোবিন্দদাসের মাওনিকতার মূলে একটা আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যবোধ ছিল। উভয়ের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে। গোবিন্দদাসের রচনায় দৃঢ়পিনদ্ধ ভাব বিদ্যমান। যুক্তবর্ণের বহুল প্রয়োগ, অনুপ্রাসাদি অলংকার সৃষ্টি ও দীর্ঘসমাস ব্যবহারের দরুন তাঁর রচনা হীরককাঠিন্য লাভ করেছে। যেমন,—'চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর', 'কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন শিখই ভুজগ গুরু পাশে', 'ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত' ইত্যাদি। বিদ্যাপতির রচনা তরল। তিনি রূপক, অতিশয়োক্তি সমাসোক্তি, অর্থান্তরন্যাসাদি অলংকার ব্যবহার করেছেন, তথাপি তাঁর রচনায় গোবিন্দদাসের সেই হীরককাঠিন্য নেই। বিদ্যাপতি কবি আর গোবিন্দদাস একাধারে ভক্ত, কবি ও দার্শনিক। গোবিন্দদাসের কবিদৃষ্টি তাই তত্ত্ব-দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিদ্যাপতির রাধা উচ্চাঙ্গের নায়িকার মত ভাববিলাসিনী, খরদীপ্তিময়ী। আর গোবিন্দদাসের রাধা যোগিনী। তিনি মাধবের উদ্দেশ্যে অভিসারের জন্য মন্দিরে যামিনী জেগে সাধনা করেন :

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

বিদ্যাপতির রাধা চলেন হৃদয়ধর্মের পথে। তিনি তাই বলেন,—

হাথক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সবরস গেহক সার॥

গোবিন্দদাসের রাধা চলেন দার্শনিকতার পথে। তিনি তাই বলেন,—

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥

* * *

যে সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ॥

যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তুছ ঠাম ॥

রাধার অন্তরে বিরহ এবং মৃত্যুর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে তিনি শেষে মৃত্যুই কামনা করেন। আবার তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, পঞ্চভূতে গড়া দেহ যদি মৃত্যুর পর পঞ্চভূতেই মিশে যায় তাহলে কৃষ্ণের সঙ্গসুখ তিনি লাভ করবেন কিভাবে? তখন রাধা মনে কামনা করলেন,—যে-স্থান দিয়ে কৃষ্ণ গমনাগমন করেন, তাঁর দেহের ক্ষিতি-অংশ যেন সেখানকার মাটি হয়ে যায়; যে দর্পণে কৃষ্ণ মুখ দেখেন, তাঁর দেহের তেজ-অংশ যেন তারই জ্যোতি হয়ে বিরাজ করে; কৃষ্ণ যে সরোবরে স্নান করেন, তাঁর অপ্-অংশ যেন তারই বারিতে পরিণত হয়; কৃষ্ণ যে পাখাটি ব্যবহার করেন, তাঁর মরুৎ-অংশ যেন তারই বাতাস হয়ে দেখা দেয়; কৃষ্ণ যে আকাশে বিচরণ করেন, তাঁর ব্যোম-অংশ যেন সেই আকাশ হয়ে বিরাজ করে।

গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গবিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণলীলার অভিসার পর্যায়ের পদরচনায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রূপবিলাস ও মণ্ডনকলার দিক হতে তাঁর পদাবলী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদিক থেকে তাঁর সমকক্ষ কবি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই।

গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ জীবনের অপরূপ চিত্র গোবিন্দ দাস অঙ্কন করেছেন। যেমন,—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে[১]
পুলক-মুকুল-অবলম্ব[২]।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব[৩] ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী-তীরে উজোর[৪] ॥

১। মেঘের বিরল বর্ষণে; ২। রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদগম হতে; ৩। নানাপ্রকার ভাব ফুটে উঠে। ৪। উজ্জ্বল;

চঞ্চল চরণ- কমল-তলে ঝঙ্করু
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর[১] ॥
অবিরত প্রেম— রতন-ফল-বিতরণে
অখিল-মনোরথ পূর[২]।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর[৩] ॥

অথবা,

চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল
জিতল গোর-তনু-লাবণিরে।
উন্নত গীম[৪] সীম নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙনিরে[৫] ॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগকাল
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন রে ॥
বিপুল পুলককুল— আকুল কলেবর
গরগর[৬] অন্তর প্রেমভরে।
লহু[৭] লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজ রসে নাচত[৮] নয়ন ঢুলায়ত
গাওত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি।

অনুরাগের পদরচনায়ও গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়:

১। অজ্ঞান; ২। তাঁর; ৩। দূরে পড়ে আছে; ৪। গ্রীবা; ৫। ভঙ্গি; ৬। গদগদ। ৭। মৃদু; ৮। আপনার প্রেমে আপনি নাচছেন;

রূপে ভরল দিঠি[1] সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরি পুরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ[2]॥
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণগুণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম[3]॥
গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহিঁ এক মনোরথ যদি হয় অনুরত
পুছত গোবিন্দদাস॥

রাধাকৃষ্ণ লীলার অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তির চরম স্ফূর্তি ঘটেছে। গোবিন্দদাস যত বড় কবি তার চেয়েও বড় ভক্ত তিনি। এজন্য রাধার বেদনার সঙ্গে কবি নিজের অন্তর বেদনা যুক্ত করে দিতে পারেননি। তাঁর রাধাকে তাই প্রেমোন্মাদিনী নায়িকা বলে মনে হয় না। তাঁকে আমরা হৃদয় কুটীরে নিদ্রাতন্দ্রাহতা নবীন তপস্বিনীরূপে দেখতে পাই।

চিত্ররূপ সৃষ্টিতে গোবিন্দদাস যে কিরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর অভিসার বিষয়ক পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুটি পদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল:

(১) কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি[4]।
গাগরি-বারি ঢারি করি পাছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

১। দৃষ্টি। ২। ধর্মের কণামাত্র; ৩। স্থান। ৪। পদের নূপুর বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করে।

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ— গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।
কর-যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী[১]
তিমির-পয়ানক আশে[২]।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু-পাশে[৩] ॥
গুরুজন-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দ দাস পরমাণ।

(২) মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি জাত[৪] ॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার[৫]।
হেরইতে উচকই[৬] লোচনতার ॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার[৭]।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥[৮]

বলরাম দাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তিনি

১। রমণী (রাধা) ২। অন্ধকারে ভ্রমণ করা শিক্ষার আশায়; ৩। সাপের ওঝার নিকট; ৪। কানে শুনলে মর্ম জ্বলে যায়; ৫। বিস্তৃত; ৬। চমকে ওঠে; ৭। এখন কি আর বিচার চলে? ৮। যে বাণ ছুটে গেছে তাকে কি আর যত্ন করে নিবারণ করা যায়?

সম্ভবত, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বা তা'র কিছু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে খেতুরীতে যে বৈষ্ণব সম্মেলন আহূত হয়েছিল, তাতে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির সঙ্গে বলরাম দাসও উপস্থিত ছিলেন। চৈতন্য নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ রচনা করে বলরাম প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তবে বাৎসল্যরসের পদরচনায় তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং এই শ্রেণীর পদরচনায় তাঁর সমকক্ষ কবি বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই।

বলরাম দাস

বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সমস্যার মত বলরাম-সমস্যাও বেশ জটিল। বলরামের ভণিতায় একাধিক কবি পদরচনা করে গিয়েছেন। কেহ দুজন, কেহ পাঁচজন, কেহ আবার উনিশজন পর্যন্ত বলরামের সন্ধান পেয়েছেন। নিত্যানন্দের এক ভক্তের নাম বলরাম দাস। তিনি বাংলা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। বলরাম বসুর ভণিতায় আর একজন পদকর্তারও কিছু পদ পাওয়া গিয়েছে। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবীরও এক শিষ্যের নাম বলরাম দাস। অনুমান হচ্ছে, তিনি 'প্রেমবিলাস' ছাড়া কিছু পদও রচনা করেছিলেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজের বলরাম দাস নামে এক শিষ্যও ব্রজবুলিতে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। আর একজন কবি 'দীন বলরাম'—এই ভণিতায় কিছু পদ রচনা করে গিয়েছেন। ইঁহাদের মত আরো অনেক কবি নাকি বলরামের ভণিতায় পদ রচনা করেছিলেন। এখন এসব গণ্ডগোলের মধ্যে না গিয়ে যে বলরাম দাস বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা তাঁর সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা যাক।

বলরাম দাস দু'শর কাছাকাছি পদ রচনা করেছিলেন। নিবিড় আন্তরিকতা ও সারল্যের ভাব তাঁর রচনাতে অধিক লক্ষিত হয়। তাঁর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলীতে গোবিন্দদাসের ছন্দ ও শব্দ-ঝঙ্কার সৃষ্টির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়:

নাচত গৌর সুনাগর মনিয়া।
খঞ্জন খঞ্জন পদযুগ রঞ্জন
রণরণি মঞ্জির মঞ্জুল ধ্বনিয়া॥
সহজই কাঞ্চন কাঁতি কলেবর
হেরইতে জগ-জন-মন—মোহনিয়া।

তহিঁ কত কোটি মদনমন মুরছল
অরুণ কিরণ কিয়ে অম্বর বলিয়া ॥
রাই প্রেমভর গমন সুমন্থর
গর গর অন্তর পড়ই ধরণিয়া।
ঘন ঘন কম্প স্বেদ পুলকাবলি
ঘন ঘন হুঙ্কার ঘন গরজনিয়া ॥
জগ মগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখণিয়া।
প্রেমক সায়রে ভুবন মজা ওই
লোচন কোণে নিরখণিয়া ॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি লোর সেচনিয়া।
হরি হরি বোলি রোই কত বিলপই
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনিয়া ॥

বলরাম দাস অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কৃষ্ণের বাল্যলীলা, রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অনুরাগ ও মিলন, অভিসার ও সম্ভোগ, রসোদ্গার, নৌকাবিলাস, দানলীলা ইত্যাদি বিবিধ পর্যায়ের পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনার অধিকাংশ বড়ই ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় বলরাম দাস অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। প্রাণের গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাতে গিয়ে নন্দ-রাণী যে কাতরোক্তি করেছেন তা অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী :

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব ॥

কবিরঞ্জন ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। তিনি কখন 'ছোট বিদ্যাপতি'র ভণিতায় কখন শুধু বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং কখনও স্বনামে অর্থাৎ কবিরঞ্জনের ভণিতায় পদ রচনা করতেন। বিদ্যাপতির ভণিতায় পদ রচনা করার জন্য তাঁর অনেক পদ বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে মিশে গেছে। তাছাড়া মৈথিল কবিরও উপাধি ছিল কবিরঞ্জন। ফলে বিদ্যাপতি-সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। কাজেই তাঁর ভণিতায় যে সব খাঁটি বাংলা পদ পাওয়া গেছে সেগুলি কবিরঞ্জনেরই রচনা বলে মনে হয়। কবিরঞ্জন ব্রজবুলিতেও অনেক পদ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর আক্ষেপানুরাগের একটি পদ উদ্ধৃত করা হল:

কবিরঞ্জন

পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ লাগি দুখ নাহি ওর ॥
বড় অভিলাষে ভজিলুঁ বর নাহ।
দৈবে বিমুখ ভেল কি কহব কাহ ॥
দরশন দুলহ দুলহ নব নেহ।
বিরহে বিকল মন জীবন সন্দেহ ॥
অপরূপ রূপ মধুর রসলীলা।
সকল নাগরিগণ কষণ কশিলা ॥
অনুচিত কাজ সহজে মধু ভেলা।
সোঙরি সো তনু নব যৌবন গেলা ॥
মরমক দুখ কহিতে হয় লাজ।
দারুণ দৈব কয়ল কোন কাজ ॥
রসিক শিরোমণি নাগর কান।
কাহে হেন ভেল কবিরঞ্জন ভাণ ॥

রায় শেখরকে নিয়ে আর এক সমস্যা। শেখর, রায় শেখর এবং কবিশেখর

এই তিনপ্রকার ভণিতায় দু'শ'র উপর পদ পাওয়া গিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' সঙ্কলন গ্রন্থে শেখর, রায়শেখর ও কবিশেখর—এই তিন প্রকার ভণিতার পদগুলি পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বৈষ্ণব পদাবলী' নামক বিশাল সঙ্কলন গ্রন্থে শেখর, রায়শেখর এবং কবিশেখরের ভণিতার পদগুলি রায়শেখরের (কবিশেখর) রচনারূপে গৃহীত হয়েছে। ইহাতে মনে হচ্ছে, রায়শেখর কখন রায়শেখর, কখন শুধু শেখর, আবার কখন কবিশেখরের ভণিতায় পদ রচনা করেন। আসলে কবি একজন, সময় বিশেষে ভণিতাকে কেবল পালটে নিয়েছেন এইমাত্র। তবে এই অভিমত সন্দেহাতীত নয়।

রায় শেখর

রায়শেখর গৌরলীলা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়ে বাংলা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। তবে রাধাকৃষ্ণলীলা পদাবলীতে তাঁর কবিত্বশক্তির অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁর বর্ষাভিসারের একটি পদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সোঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥

তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারব
জিবন মরু আগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিনি বিথার।।

গোবিন্দদাস কবিরাজ ও গোবিন্দ চক্রবর্তী দুজনে একই সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং অনেকস্থলে উভয়ের ভণিতা এক হওয়ায় কোন্‌টি কোন্‌ কবির লেখা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। গোবিন্দ চক্রবর্তী গৌরলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা অনুসরণে পদ রচনা করেছিলেন। নিম্নে এই উভয় পর্যায়ের একটি করে পদ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

গোবিন্দ চক্রবর্তী

গৌরলীলাবিষয়ক—

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ঘন ঘন বলে হরি।
খেনে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ
খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী।
যাবক বরণ কটির বসন
শোভাকরে গোরা গায়।
কখন কখন যমুনা বলিয়া
সুরধুনী তীরে ধায়।
তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই
ঝন ঝন করতাল।
নয়ন অম্বুজে বহে সুরধুনী
গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দ কন্দ গৌরচন্দ্র
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দ দাসিয়া করত আশ
ও পদপঙ্কজ ছায়া।

শ্রীকৃষ্ণের ভাবোল্লাস—

শুন শুন বিনোদিনী রাই।
তোঁহা বিনু কারু নই তোঁহারি দোহাই।

তুয়া দরশন লাগি সদা প্রাণ কান্দে।
ধৈরজ ধরিতে নারি হেরি মুখ চান্দে॥
অখিল সম্পদ মোর তুয়া মুখশশী।
মুরলীতে তুয়া নাম গাই অহনিশি॥
গোলোক ছাড়িয়া আইলাম সুখের বিলাস।
তুয়া দরশন লাগি বৃন্দাবনে বাস॥
জগতে জানয়ে তুয়া অনুগত কান।
গোবিন্দ দাসিয়া তাথে আছে পরমাণ॥

লোচন দাস

গৌর-নাগরী ভাবের প্রবর্তক, নরহরি দাসের ভক্তশিষ্য লোচন দাস বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্যমঙ্গল শীর্ষক জীবনীকাব্য প্রণেতা হিসেবে অধিকতর পরিচিত হলেও, পদাবলী রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। গৌর-নাগরী ভাবের পদে নাগরীর বাসনা-কামনা চমৎকার ফুটে উঠেছে:

এক নাগরী, হেসে বলে, শুনগো মরম সই।
মরম জানিস, রসিক বটিস তেঁই সে তোরে কই॥
তো বিনে গো, রসের কথা, কইবো কার ঠাঁই।
এমন রসের, মানুষ মোরা, কভু দেখি নাই॥
কিবা জলদ, ঝলক মতি, নাশায় নোলক দোলে।
স্থির হৈতে নারি গোরার হাসির হিল্লোলে॥
হঠাৎ কারে দেখতে গেলাম, এমন কে তা জানে।
অনুরাগের ডুরি দিয়ে, মনকে ধৈরে টানে॥
অঙ্গঘটা, রূপের ছটা, পথে চলে যায়।
গৌররূপের ধমক দেখে, চমক্ লাগে গায়॥
গা থর থর করে মোর, অঙ্গ সকল কাঁপে।
নাসার নোলক রূপের ছটা, হিয়ার মাঝে ঝাঁপে॥

অনন্ত দাস

চৈতন্যযুগের পদকর্তা হিসেবে অনন্ত দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। 'পদকল্পতরু'তে ইঁহার ভণিতায় বত্রিশটি এবং সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে ইঁহার ভণিতায় বারটি পদ পাওয়া গিয়েছে। অনন্ত রায় এবং অনন্ত আচার্য নামে আরো

দুজন কবির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের কারো সঙ্গে অনন্ত দাসের কোন যোগ নেই। অনন্ত চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেন। অনন্ত দাস যে যথার্থ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন তা নিম্নোদ্ধৃত পদটি থেকে বোঝা যাবে :

কি পেখলুঁ বরজ- রাজ-কুলনন্দন
রূপে রহল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান ॥
একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন-আভরণ
কিরণহি ভুবন উজোর।
দরশনে লোচন লোরে আগোরল
না চিহ্নলুঁ কাল কি গোর ॥
সহজে দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জ-দল
তাহে কত ফুল-শর সাজে।
দিঠি মোর পরশিতে ও হাসি অলখিতে
শেল রহল হৃদি-মাঝে ॥
সরস কপোল লোল মণি-কুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর-ভাস।
ও রূপ-লাবণি দিঠি ভরি না পেখলুঁ
দুখিয়া অনন্ত দাস ॥

নরোত্তম দাস

শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস এবং শ্যামানন্দ—এই তিনজনের প্রচেষ্টায় স্তিমিতপ্রায় বৈষ্ণবধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে নরোত্তম দাসের আবির্ভাব ঘটে। অল্প বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তারপর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে নরোত্তম শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে নরোত্তম জন্মভূমি খেতুরীতে ছয়টি দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে ইহা খেতুরীর মহোৎসব নামে প্রসিদ্ধ। সে সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে যাঁরা বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই এই

উৎসবে যোগদান করেছিলেন। পালাবদ্ধ কীর্তনগানের রীতি-প্রবর্তন এই উৎসবের একটি অবিস্মরণীয় অবদান।

গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদরচনায় নরোত্তম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নরোত্তম ছিলেন ভক্তকবি। তাঁর পদে ভক্ত প্রাণের আকুলতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যেমন,—

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব যুগলপিরীতি॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রহু আশ।
নরোত্তমদাস মনে এই অভিলাষ॥

রাধাকৃষ্ণলীলার প্রার্থনা পর্যায়ের পদে নরোত্তমের কবিপ্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটেছে। ভক্তের আকূতি এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে:

হেরি হরি আর কবে এমন দশা হবে।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া তাহে দিব গুঞ্জা-বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতাম্বর বাস অঙ্গে পরাইব সখা সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব আর॥
দুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।
রতনের জরি আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
দিব তাহে মালতী গাঁথিয়া॥

হেন রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ-সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস।

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্য

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্যযুগকে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এসময় পদাবলী সাহিত্য সমুদ্রের গভীরতা ও বিশালতা দুইই লাভ করেছিল। বিষয়-বৈচিত্র্য, ভাবৈশ্বর্য, ছন্দ-অলংকারের নিপুণ প্রয়োগের দিক থেকে এযুগের সাহিত্য অতুলনীয়। চৈতন্যোত্তর যুগে (১৭শ—১৮শ শতক) বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে। বিষয়বস্তু নিতান্ত গতানুগতিক হয়ে পড়ে; ভাবের গভীরতা কমে গিয়ে বাক্‌চাতুর্য ও কষ্টকল্পনা দেখা দেয়। এযুগে বৈষ্ণব ধর্মও তার জাতীয় ভাবধারার সর্বব্যাপী প্রসারতা হারিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নেয়। বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য। কাজেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই দুর্নীতি, অনাচার, দলাদলি দেখা দিতে থাকে, বৈষ্ণব সাহিত্যও ততই শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়তে থাকে। চৈতন্যোত্তর যুগকে তাই অবক্ষয়ের যুগ বলে গণ্য করা চলে।

চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ, হরিবল্লভ, নরহরি চক্রবর্তী, জগদানন্দ, রাধামোহন, দীনবন্ধু, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কবিত্বশক্তিতে ইঁহারা কিঞ্চিৎ ন্যূন হলেও বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে ইঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে গিয়েছেন। এজন্য বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম স্মরণীয়।

ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ

প্রখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম দাস কবিরাজ গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনায় উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। গোবিন্দদাসের মত তিনিও ব্রজবুলিতে পদ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর পূর্বরাগ বিষয়ক একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

নয়নক নীর থির নাহি বান্ধই
ঘন ঘন মেটসি তাই।

সচকিত লোচনে জলদ নেহারসি
চান্দসি হাত বাঢ়াই ॥
খেনে ঘর বাহির করসি নিরন্তর
খেনে খেনে দশ দিশ হেরি।
ময়ূর ময়ূরী সনে হাসি সম্ভাষসি
কণ্ঠ হেরসি ফেরি ফেরি ॥
কেলিকদম্ব পুনহিঁ পুন হেরসি
ঘন ঘন তেজসি শ্বাস।
কালিন্দী নামে রোই উতরোলসি
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥

ছন্দ ও ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে ঘনশ্যাম বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন :

ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝমকল
ঝিঁ ঝিঁ ঝনকত ঝাঁঝিয়া।
ডিণ্ডিমায়িত মণ্ডুকীরব
মোর নটত সাজিয়া ॥
রে ঘন ঘননহ গহন দুরগহ
গগনে ঘন ঘন গর্জিয়া।
আওয়ে রতিপতি মত্তগজবর
বিরহিণীগণ তর্জিয়া ॥
হানে তনু মন পলকে পলকন
ঝলকে দামিনী কাঁতিয়া।
খরধার খড়গ উখাড়ি ঝাঁকত
বীররসভরে মাতিয়া ॥
অরবিন্দ নহ পরজীত সংহর
অসম শর বরিখন্তিয়া।
নন্দ নন্দন চরণে ভণ ঘন
শ্যামদাস নমন্তিয়া ॥

হরিবল্লভ ব্রজবুলিতে গৌরলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা উভয় বিষয়েই পদরচনা করেন। চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের রচনা বড়ই ক্লান্তিকর। হরিবল্লভ ইহার ব্যতিক্রম নহেন। তবে গৌরমহিমা কীর্তনে কবি নৈপুণ্যপ্রদর্শন করেছেন:

হরিবল্লভ

দেখ দেখ সোই মুরতিময় মেহ।
কাঞ্চন কাঁতি সুধা জিন মধুরিম
নয়ন চষক ভরি লেহ॥
শ্যামল বরণ মধুররস ঔষধি
পূরব যো গোকুল মাহ।
উপজল জগত যুবতী উমতাওল
যো সৌরভ পরবাহ॥
যো রস বরজ গোরী কুচমণ্ডল
মণ্ডনবর করি রাখি।
তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেমসুরশাখী॥
সকল ভুবন সুখ কীর্তন সম্পদ
মত্ত রহল দিন রাতি।
ভবদব কোন কোন কলিকল্মষ
যাঁহা হরিবল্লভ ভাঁতি॥

নরহরি চক্রবর্তী চৈতন্যোত্তর যুগের শক্তিশালী কবিদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা করেন। নরহরির কবিপ্রতিভার নিদর্শন স্বরূপ পূর্বরাগ পর্যায়ের একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

নরহরি চক্রবর্তী

শুন শুন ওগো পরাণ সজনি
বলিয়ে মরম বেথা।
রাখিবে গোপনে না কহিবে আনে
এ অতি লাজের কথা॥
অলপ রজনী কি জানি কি খেনে
শুতিনু অলস দে।

কিবা অপরূপ স্বপনে দেখিনু
না জানি নাগর কে ॥
কিশোর বয়েস রসময় বপু
জলদ জিনিয়া রূপ।
চাঁদ মুখে হাসি খসয়ে অমিয়া
কি নব মদন ভূপ ॥
বরিষয়ে খর তর শর অতি
চঞ্চল লোচন কোণে।
নরহরি রহু নিছনি তাহাতে
যুবতি জীয়ে কি প্রাণে॥

চৈতন্যোত্তর যুগের একজন বিশেষ শক্তিশালী কবি হলেন জগদানন্দ। তিনি বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকটবর্তী জোঁফলাই গ্রামে বাস করতেন। জাগদানন্দ বাংলা ও ব্রজবুলি উভর ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর কবিপ্রতিভা বাংলা পদেই চমৎকার ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে কবি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শ্রীরাধার অভিসার বিষয়ক সেই 'মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ' পদটি পড়লে তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলেই মনে হবে। নিম্নে পদটি উদ্ধৃত করা যাচ্ছে--

জগদানন্দ

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুর পুঞ্জ
মালতীফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জ নয়ন খঞ্জন গতিহারী ॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গ ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কর-কঙ্কণ মৃদু ঝংকৃত মনুহারী।
নাচত যুগ ভ্রূ-ভুজঙ্গ
কালিদমন-দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥

দশন কুন্দ কুসুম নিন্দু
বদন জিতল শরদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহ-দীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিকভূপ ভুলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতিবৃন্দ
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হসনা নন্দ-নন্দন-সুখকারী।
মণিমানিক নখবিরাজ
কনক-নূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থল-জলরুহ-চরণক বলিহারি।

"সুন্দর কুসুমসমূহ ফুটিয়াছে। মধুকবদল গুন গুন ধ্বনি করিতেছে। গজ-গতিবিনিন্দিত গতিতে মনোহরা ব্রজকুলরমণীগণ অভিসারে যাইতেছে। তাহাদের কেশরাশি জলভরা মেঘকে লজ্জা দেয়। সেই কেশকলাপ মালতীফুলে সুশোভিত। তাহাদের অঞ্জনরঞ্জিত কমল নয়ন খঞ্জনের নৃত্যকে নিন্দা করে। তাহাদের দেহ স্বর্ণকান্তির মত উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ-বিলাস পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে। কিঙ্কিণীর সঙ্গে করকঙ্কণ মনোহর মৃদু ঝঙ্কার তুলিতেছে। কালীয়দমন কৃষ্ণকে দমন করিবার কৌতুকে তাহাদের ভুরু-ভুজঙ্গ নাচিতেছে। (শ্রীরাধার) সকল সঙ্গিনীই নীল শাড়ী পরিয়াছেন। তাহাদের দশনপংক্তি কুন্দকুসুমকে নিন্দা করে। বদন শারদচন্দ্রকে জয় করিয়াছে। পথশ্রমে প্রেমসিন্ধু প্যারীর বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতেছে। তাহার ললিত অধরে (মৃদু) হাসি মিশাইয়া রহিয়াছে। দেব দীপ্তি অন্ধকার নাশ করিতেছে। রূপ দেখিয়া রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভুলিলেন। (শ্রীরাধার রূপ) দেখিয়া স্বর্গের যুবতীবৃন্দ বিস্মিত হইয়াছে। তাহারা মন্দ মন্দ হাসিয়া নন্দ নন্দনকে অভিনন্দিত করিতেছে। অথবা তাদের মৃদু মৃদু হাসি নন্দন কাননকেও নূতন সুখের আস্বাদন দান করিতেছে। শ্রীরাধার পদনখরে কত মণিমাণিক্য বিরাজ করিতেছে। তাহাতে সোনার নূপুর মধুর মধুর বাজিতেছে। জগদানন্দ বলিতেছেন ঐ স্থলপদ্ম বিনিন্দিত চরণের বলিহারি যাই।"[১]

১। বৈষ্ণব পদাবলী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

চৈতন্যোত্তর যুগের আর একজন বিশেষ শক্তিশালী কবি হচ্ছেন রাধামোহন। তিনি ছিলেন একাধারে ভক্ত ও কবি। তাঁর প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলিতে বৈষ্ণবোচিত বিনয়গুণের সম্যক প্রকাশ ঘটেছে। দীন অভাজনের মত সকরুণ ভাবে কবি বৈষ্ণব গোস্বামীদের কাছে কৃপাভিক্ষা করেছেন এবং করুণা সাগরের কাছে নাম সংকীর্তনে রুচি ও প্রেমধন প্রার্থনা করেছেন :

রাধামোহন

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥
শ্রীগুরু চরণ আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য॥
তোমা সভার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয়।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়।
বাঞ্ছাকল্পতরু হও করুণা সাগর।
এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥
নাম-সঙ্কীর্তনে রুচি আর প্রেম ধন।
এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ॥

রাধামোহন বাংলা ছাড়া ব্রজবুলিতেও পদ রচনা করেন। গৌরাঙ্গ লীলা ও রাধাকৃষ্ণ লীলা উভয়ই তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। তবে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তাঁর কবিত্বশক্তির নিবিড় পরিচয় পওয়া যায়। দিব্যোন্মাদগ্রস্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের জীবনচিত্রখানি সীমিত পরিসরের মধ্যে কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে :

আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব॥
পুন পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়ন কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ॥
পুলক মুকুলবর ভরু সব দেহ।
রাধামোহন কছু না পায়ল থেহ॥

দীনবন্ধু বাংলা ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। তাঁর গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর চেয়ে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলীর কাব্যগুণ বেশী বলে মনে হয়। বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার পূর্বরাগ বর্ণনাতে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে:

দীনবন্ধু

বংশী আর বার বাজে বনে।
শুনি মোর মন করে উচাটন
ভেটিব শ্যামের সনে॥
অবুধ মুরলী রাধা রাধা বলি
বিপিনে সদাই রাজে।
গুরু গরবিত করিলে বেকত
শুনিঞা মরিএ লাজে॥
খলের বদনে থাকিঞা যতনে
মধুর মধুর গায়।
হাসিতে হাসিতে কুলের সহিতে
পরাণ লইতে চায়॥
আমি চিরদিন পরের অধীন
জানিঞা না জানে বাঁশী।
দীনবন্ধু ভণে চল সখী বনে
নিষেধ করিঞা আসি॥

চন্দ্রশেখর তেমন উঁচু দরের কবি ছিলন না। তথাপি কাব্যকলার দিক থেকে তাঁর দু-চারটি পদ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এরূপ একটি পদ (মাথুর পর্যায়ের) এখানে উদ্ধৃত করা হল:

চন্দ্রশেখর

কানুগুণ চিন্তনে নিদ নাহি লোচনে
উদবেগে তনু ভেল খীণ।
কাঞ্চন-বরণ কালি সম ভৈ গেল
বিলাপ করই নিশি-দিন॥
সখিহে দারুণ বিরহ-বিয়াধি।
দিনে দিনে বাঢ়ল রাই তনু জারল
ভেদল অন্তর সাঁধি॥

অতি উনমাদে পুন মোহ যায় ঘন ঘন
মা জানি কি হয়ে পরিণাম।
জীবন মহৌষধি একহি মন্তর
শ্রবণ-বিবরে হরিনাম ॥
ঐছন করি করি কত দিন রাখব
দশমি দশা উপনীত।
চন্দ্রশেখর কহে মধু পুরে সাজহ
আনি মিলাইতে মীত ॥

চৈতন্যোত্তর যুগে অল্প কবিত্বশক্তি নিয়ে আরো অনেক কবি আবির্ভূত হয়েছিলন। ইঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব পদাবলী সহিত্য যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব দাস, শশিশেখর, গদাধর দাস, অকিঞ্চন—ইহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ বৈষ্ণব পদসংগ্রহ গ্রন্থ ॥

পদ সমুদ্র

ষোড়শ শতকের শেষভাগে আউল বাবা মনোহর দাস কর্তৃক 'পদসমুদ্র' সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থে পনের হাজার পদ সংগৃহীত হয়েছিল বলে শুনা যায়। বৈষ্ণবপদসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই সর্বপেক্ষা প্রাচীন। সঙ্কলয়িতা প্রখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু ছিলেন। হুগলী জেলার বদনগঞ্জে তাঁর সমাধি আছে। পদসমুদ্র পুঁথিখানির কোন সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। আনকে ইহার অস্তিত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ক্ষণদাগীত চিন্তামণি

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে হরিবল্লভ বা বল্লভ দাস (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী) কতৃক 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি' সঙ্কলিত হয়। বৈষ্ণবভক্তগণের উপাসনার জন্য গ্রন্থখানি সঙ্কলন করার প্রয়োজন হয়েছিল। তিনশ পনেরটি পদ ইহাতে সংগৃহীত হয়েছে। চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত কোন পদ ইহাতে নাই।

গীত চন্দ্রোদয়

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে ‚‚ ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা ঘনশ্যাম (নরহরি চক্রবর্তী) কর্তৃক 'গীতচন্দ্রোদয়' সঙ্কলিত হয়। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

'পদামৃতসমুদ্র' অষ্টাদশ শতকের প্রথমপাদে প্রখ্যাত পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত হয়। সঙ্কলয়িতা শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র এবং মহারাজ নন্দকুমারের গুরু। এই গ্রন্থে সাতশ ছেচল্লিশটি পদ সংগৃহীত হয়েছে।

পদামৃতসমুদ্র

পদকর্তা বৈষ্ণব দাস কর্তৃক অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে 'পদকল্পতরু' গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হয়। ইহাতে তিন হাজার একশ একটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। অবশ্য মুদ্রিত পুস্তকে তিন হাজার ত্রিশটি পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন) রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণবপদসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাধিক জনপ্রিয়।

পদকল্পতরু

পরবর্তিকালে আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ সঙ্কলনগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন,—গৌরসুন্দর দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'কীর্তনানন্দ'; পদকর্তা দীনবন্ধু দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'সংকীর্তনামৃত'; পদকর্তা নিমানন্দ দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'পদ-রস-সার'; কমলাকান্ত দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'পদ-রত্নাকর'; গৌরমোহন দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'পদকল্পলতিকা'; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয় কর্তৃক সঙ্কলিত 'পদরত্নাবলী'; প্রসাদ দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'পদচিন্তামণিমালা'; পীতাম্বর দাস কর্তৃক সঙ্কলিত 'রসমঞ্জরী'।

বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি

সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বাংলার[১] শতাধিক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন। ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তবে তাঁরা প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী ছিলেন বলে এবং তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন বলে সাধারণ ভাবে তাঁদের বৈষ্ণব কবি বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি বলা হয়। এখন এ অভিধা সত্য কিনা তা একবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

মুসলমান কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা বৈষ্ণবকবি-কল্পিত রাধাকৃষ্ণলীলা হতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈষ্ণবকবির কৃষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সেখানে

১। বাংলা বলতে এখানে বাংলাভাষাভাষী-অধ্যুষিত অঞ্চলকে বোঝান হয়েছে। মুসলমান কবিগণ বর্তমানে আসামের কাছাড়, পূর্বপাকিস্তানের শ্রীহট্ট—কুমিল্লা—ফরিদপুর ময়মনসিংহ—চট্টগ্রাম ও পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ—নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন।

মানুষের কোন স্থান নেই। সেখানে আমরা দেখি, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এবং তাঁর স্বরূপশক্তির সারভূতা হ্লাদিনী শক্তি রাধার সঙ্গে নিত্য লীলা চলছে। জীব সেই লীলার সাক্ষী মাত্র। সে দূর থেকে সেই লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে। শ্রীরাধা এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ ব্যতীত কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করার অধিকার কারো নেই। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের বাসনা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। কিন্তু মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণলীলার কেবল সাক্ষী হয়ে না থেকে নিজেরা রাধার স্থান অধিকার করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। ইহাতে তাঁরা বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী হতে পৃথক হয়ে পড়েছেন। এর একটা কারণ আছে। বাংলার মুসলমান কবিগণ ছিলেন সুফীপন্থী। সুফীমতে প্রেমই হল ঈশ্বরের স্বরূপ এবং এই প্রেম থেকেই আবার জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর নিজপ্রেম আস্বাদনের জন্য নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। জীব হল ঈশ্বরের এই সৃষ্টিলীলার প্রধান অংশীদার। সাধনবলে জীব আত্মস্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের পরিপূর্ণ মিলনই সুফীদের ধর্মের চরম লক্ষ্য। মুসলমান কবিগণ সুফী ধর্মের এই আদর্শের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণকে মিশিয়ে ফেলেছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহের আর্তি তা, কবিদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য প্রেমমাধবের পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহের আর্তিতেই পরিণত হয়েছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের আর দর্শক বা আস্বাদকরূপে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি, রাধার সঙ্গে নিজেদের হৃদয়-আর্তি যোগ করে দিয়ে রাধার স্থান নিজেরাই দখল করে নিয়েছেন। মুসলমান কবিদের পদে রাধার পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহের আর্তিকে তাই রাধার বলে মনে হয় না, তাকে কবির হৃদয়প্রসূত বলেই মনে হয়। মুসলমান কবিদের কয়েকটি ভণিতা লক্ষ্য করলেই একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে :

(১) কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী
আর কি পাইব তব মেলা॥

(২) ছাবাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মর অঙ্গ জ্বলে।
ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া॥

(৩) চাঁদ কাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থিকাতে একশ দুজন মুসলমান কবির পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। এই কবিগণের নাম—অয়াহিদ, অজ্ঞান, আইনদ্দিন, আকবর, আকরআলী, আছদ্দিন, আবঝল, আবদুল বারী, আবদুল মালীক, আবাল ফকির, আবুল হুছন, আমান, আরকুম, আলাওল, আলিমদ্দিন, আলিরাজা, আলী মিঞা, আসরফ, ইরকান, ইরপান, উছমান, উদাসী, উম্মর, এবাদোল্লা, ওহাব (১), ওহাব (২), কবির শেখ, কবীর, কমরআলি, কাঙ্গালী মীর্জা, কালাশা, কালী-প্রসন্ন অর্থাৎ মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন, খতিসা, খলিল, খাতাসা, গয়াজু, গরীব, গোলাম হুছন (১), গোলাম হুছন (২), চাঁদকাজী, চাম্পাগাজী, ছাওয়াল সা, ছৈয়দ আলী, জালালউদ্দী, তন্না, তুফানদ্দিন, দুলা মিঞা, দৈখুরা, নজির, নশীর মামুদ, নাকিত্ত, নাছির, নাছিরদ্দিন, নাছিরমহম্মদ, নিয়ামত (ছৈয়দ), নেমেতহোসেন, ফএজররহমান, ফএজোল্লা, ফজল, ফজলল হক, ফতন, ফতেখান, বক্সাআলী, বদিয়ুদ্দিন, বুরহানী, ভিখন, ভেলাসা, মছনতাজ, মতাহির, মর্ত্তুজা, (১), মর্ত্তুজা (২), মনুঅর, মনোহর, মহম্মদ আলী, মিয়াধন, মুছা, মোছনআলী, মোহাম্মদ (পির), মোহাম্মদ (রাজা), মোহাম্মদ, রউফ, রজব, রহিমুদ্দিন, লালন, লালবেগ, লালমামুদ, শাহনুর, শীতালং, সদাইসাহ, সর্ফতোল্লা, সমসের, সালবেগ, সিরতাজ, সুলতান, সেখলাল, সেরচাঁদ, হবিব, হাছনরজা, হানিফ, হাসমত, হাসিম, হুছন। ইঁহাদের সকলের পরিচয় পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া বর্তমান গ্রন্থে সম্ভব নহে। ইঁহাদের রচিত পদাবলী বিষয়ানুসারে বিভক্ত করে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

মুসলমান কবিদের রচিত পদগুলিকে মোটামুটি পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে,—(১) রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক; (২) দেহতত্ত্ব-বিষয়ক; (৩) ঈশ্বর-বিষয়ক; (৪) লৌকিক প্রেম-বিষয়ক এবং (৫) গৌরাঙ্গ-বিষয়ক।

কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকে মুসলমান কবিদের রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে রাধার অন্তর বেদনার সঙ্গে ভক্তকবির সকরুণ আকূতি যুক্ত হয়ে এক অপরূপ শিল্পমূরতি গড়ে উঠেছে। যেমন, মর্ত্তুজার নিবেদনের একটি পদ,—

শ্যাম বন্ধু চিত—নিবারণ তুমি !
কোন্ শুভদিনে দেখা তোর সনে
পাশরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদবদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিণ্ ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন মরণ-ভরি ॥

অথবা, চাঁদকাজীর বংশীখণ্ডের একটি পদ,—

বাঁশী বাজান জানো না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না ॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরু জনার কাছে।
তুমি নাম ধৈরা বাজাও বাঁশী আমি মৈরি লাজে ॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী এপার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী সে ঝাড়ের লাগি পাও।
জড়ে মূলে উপারিয়া যমুনায় ভাসাও ॥
চাঁদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি ॥

মুসলমান কবিদের কতকগুলি পদে দেহতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। দেহ হল ঘর সব তত্ত্বই (সত্যবস্তু) এই দেহের মধ্যে আছে। রাধা ও কৃষ্ণ তত্ত্ব ত একই। তাঁরা অভিন্নভাবে দেহের মধ্যেই আছেন। কবি উছ্মান বলেন,—

রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন।
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্র দিন॥
কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস।
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ॥

আবার কোন পদে এরূপ দেখা যায়, দেহ-ঘরে জীব হল রাধা এবং পরমাত্মা হল কৃষ্ণ। যেমন, ওহাবের একটি পদে,—

বন্ধুরে হায়রে কঠিন বন্ধু কঠিন তোমার মন রে,
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া রে।
আমি নারী তুমি রে পতি একই গৃহেতে বসতি,
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া॥

কতকগুলি পদে রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ থাকলেও সেখানে ঈশ্বরের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণীর পদগুলিকে তাই ঈশ্বর-বিষয়ক পদ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হাছন উদাসের একটি পদের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল,—

শুন শুন এগো রাধা তুমি জগৎ-রাণী।
রাধা বলিয়ে হিন্দুয়ে ডাকে আমি নাহি মানি॥
আল্লা বিনে কিছু নাই আর সব ফানী।
হাছনরাজা ডাকে তোমায় রহিম ও রব্বানী॥
রহিম ও রব্বানী ডাকে আর ডাকে ছুবহানী।
আল্লা আল্লা বলিয়ে ডাকে একবিনে না জানি॥

মুসলমান কবিদের কতকগুলি পদে লৌকিক প্রেম স্থান পেয়েছে। যেমন, ইরপানের একটি পদ,—

দিবানিশি ঝুরে মরি বন্ধু বিনে রৈতে নারি।
বল সখি উপায় কি করি॥
সখি গো বন্ধু বিনে এ দেহের নাহি কেহ সহকারী।
ওরে বন্ধুয়ার লাগিয়া আমি সদায় করি ইন্তিজারী॥
আর ইন্তিজারি করিতে আমি দুঃখে ভাসি ফিরি।
পাইলে বন্ধুয়ারে আমি রাখিতাম চরণে ধরি॥

ছাবালসা ইরপানে কইন বন্ধু আমার বংশীধারী।
ওরে বাজাইয়া মোহন বাঁশী আমার প্রাণী কৈল চুরী॥

মুসলমান কবিদের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিও খুব সুন্দর। আকবর ভাবাবেশে নৃত্যপর গৌরাঙ্গের চিত্রখানি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন,—

জীউ জীউ মেরে মন-চোর গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥

গৌরলীলা বর্ণনায় লালনও বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন :

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা॥
গোরা হাসে কান্দে ভাবের অন্ত নাই।
সদা দীন-দরদী বলে ছাড়ে হাই॥
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা হয়েছে কি ধনহারা॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে।
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে॥
মরি হায় কি লীলা কলিকালে বেদবিধি চমৎকারা।
সত্য—ত্রেতা—দ্বাপর—কলি হয়।
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়॥
অধীন লালন বলে ভাবুক হলে সে ভাব জানে তারা॥

বাংলার মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণবকবিদের স্থিরবদ্ধ দৃষ্টি না পেলেও অন্তরের ভক্তিপ্রীতি, বিরহ-আর্তিকে তাঁরা নিবিড়ভাবে প্রকাশিত করে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করে গিয়েছেন। একারণে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের নাম চিরতরে মুদ্রিত থাকবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শাক্তপদাবলী

শক্তিপূজার ইতিহাস॥

শাক্তসাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দুর্গা বা কালী। শাক্তসাধকগণ দেবী দুর্গাকে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিরূপে কল্পনা করেছেন। জগতের মূল কারণ হলেন ঐ শক্তি। সাধকের অন্তরে তিনি মাতৃরূপে বিরাজ করেন। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্ত্রী তিনি। এই মাতৃরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ইহার মধ্যে দুটি মুখ্য ধারার সাক্ষাৎলাভ করা যায়। একটি হল শস্যোৎপাদিনী জীবধারিণী পৃথিবীদেবীর ধারা ও অপরটি পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী পার্বতী উমার ধারা। এখন দুই ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

(১) পৃথিবী-দেবী—মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে-সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকগুলি পাথরের স্ত্রীমূর্তি রয়েছে। এই স্ত্রীমূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি হল মাতৃদেবীর মূর্তি। আবার এই মাতৃমূর্তিগুলির অনেকগুলি হল মাতা পৃথিবীর মূর্তি। "শস্যোৎপাদিনী পৃথিবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা, প্রাণশক্তি ও প্রজনন-শক্তির প্রতীকরূপে তিনি প্রাচীন কাল হইতে পূজিতা।"[১]

পরবর্তিকালের সাহিত্য-পুরাণাদি হতে মাতা পৃথিবীর স্তব-স্তুতি, পূজা-উপাসনার কথা বিশেষভাবে জানা যায়। ঋগ্বেদের মধ্যে বহুস্থলে পিতা 'দ্যৌ'-এর সঙ্গে মাতা পৃথিবী স্তুতা হয়েছেন। বৈদিক ঋষিগণ উদাত্ত কণ্ঠে মাতা পৃথিবীকে প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী বলে স্তব করেছেন। অন্যত্র তাঁরা আবার পিতা দ্যৌ-এর সঙ্গে মাতা পৃথিবীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তাঁরা যেন তাঁদের শস্য দান করেন, অন্ন দান করেন, ধন দান করেন, পাপ থেকে মুক্ত করেন। তাঁদের সুখ-শান্তি-শৌর্য-বীর্য-ঐশ্বর্য-সন্তানাদি দান করেন, তাঁদের শত্রু বিনাশ করেন। "সৃষ্টির ভিতর এই যে একটি সর্বজনীন পিতামাতার পরিকল্পনা দেখিতে

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

পাইলাম, ইহা পরবর্তিকালে আমাদের নানাপ্রকারের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা এবং দার্শনিক সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আমাদের শিব-শক্তির পরিকল্পনাকে জাগাইয়া দিয়াছে। বেদের দ্যাবা-পৃথিবী-রূপ পিতামাতার পরিকল্পনার ভিতরেই শিবশক্তির দার্শনিক তত্ত্বের আভাস রহিয়াছে এমনতর কথা বলিলে অবশ্য একটু বেশি বলা হইল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু অস্পষ্টভাবে একটি 'জগতঃ পিতরৌ'র কল্পনা আমরা এখানেই পাইতেছি, একথা অস্বীকার করিতে পারি না।"[১]

অথর্ব বেদের মধ্যে পৃথিবীকে সন্তানবৎসলা মঙ্গলময়ী মাতৃদেবীরূপে বন্দনা করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও তাঁকে আমরা মাতৃদেবীরূপে দেখতে পাই। মহাকবি বাল্মীকি তাঁর মানসকন্যা সীতাকে ধরার দুলালী বলেছেন। পুরাণাদির মধ্যে পৃথিবীকে দেবী বলা হয়েছে। 'কালিকা-পুরাণে' তিনি জগদ্ধাত্রী। অন্যান্য পুরাণে তাঁকে মহাদেবী বা মহাশক্তি দুর্গার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর পৃথিবী-রূপত্বের পরিচয় অনেক জায়গায় আছে। চণ্ডীর একস্থলে দেবী নিজেকে 'শাকম্ভরী' বলে ঘোষণা করেছেন। শাক অর্থে যদি শস্য বোঝায়, তাহলে যে-দেবী শস্যদ্বারা জগৎ প্রতিপালন করেন তিনি পৃথিবী ছাড়া অন্য কেহ হতে পারেন না।

দুর্গাপূজার মধ্যে মাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশে রয়েছে। পৃথিবী থেকে শস্যদেবী এবং তাঁর পূজা থেকে শস্যপূজার উদ্ভব হয়েছে। দেবীপূজার মধ্যে এই শস্যপূজা নানাভাবে মিশে আছে। দেবীর পূজা শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই শরৎকাল হল দেশে শস্যঋতুর আরম্ভের সময়। তারপর পূজার সময় দেখা যায়, ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধনকালে বিল্বশাখা হয় তাঁর প্রতীক এবং স্নান-প্রতিষ্ঠা-পূজার সময়ে নবপত্রিকা হয় তাঁর প্রতীক। নবপত্রিকা হল শস্যবধূ। একটি কলাগাছের সঙ্গে, হরিদ্রা, কচু, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একসঙ্গে বেঁধে শস্যবধূ নির্মাণ করা হয়। এই শস্যবধূ বা শস্যদেবী ত মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ। সুতরাং শস্যবধূকে দেবীর প্রতীকরূপে পূজা করা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি আমাদের দুর্গাপূজার মধ্যে মাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশে আছে।

(২) পার্বতী উমা—শক্তিপূজার ইতিহাসে পার্বতী উমার ধারাটি প্রাচীন। পরবর্তিকালে ইহার সহিত সতী, দুর্গা-চণ্ডিকা ও কালী বা কালিকার ধারা

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

মিলিত হয় এবং শেষপর্যন্ত কালীই দেবীর অন্য সব রূপকে পিছনে ফেলে শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সর্বেশ্বরী হয়ে ওঠেন। এখন পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাচ্ছে।

পাবর্তী উমার ধারাটিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য প্রথমে 'উমা' ও 'পার্বতী' শব্দ দু'টির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। উমা শব্দের অর্থনির্ণয় করতে গিয়ে কেহ কেহ বলেছেন, 'উ' শব্দের অর্থ শিব এবং 'মা' শব্দের অর্থ শ্রী; শিবের শ্রী বলে পার্বতীর নাম উমা। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গলে' উমার এই অর্থই করেছেন :

উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল যার॥

'মা' শব্দের অর্থ 'মননকারী' গ্রহণ করে কেহ আবার বলেছেন, যিনি শিবকে (পতিরূপে) ধ্যান করেন তিনি উমা।[১] কেহ কেহ (শিবায়নকার রামকৃষ্ণ) উমার হাস্যকর অর্থও করেছেন :

উমা উমা শব্দ হৈল ভূমিষ্ঠের কোলে।
কেহ কেহ তে কারণে উমা উমা বলে॥

কালিদাস উমা শব্দের অভিনব অর্থ করেছেন, মদনভস্মের পর শিবকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা পার্বতী কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হলে মেনকা 'উ—ওহে, মা—আর তপস্যা করো না' এই বাক্য দ্বারা তাঁর তপস্যা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন বলে পার্বতীর নাম হয় উমা। কালিদাসের 'উমা' শব্দের এই ব্যাখ্যা থেকে যে একটি জিনিস আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি তা হল এই, হিমালয়-দুহিতার মূল নাম ছিল পার্বতী; উমা নামটি তাঁর সম্বন্ধে পরে প্রযুক্ত হয়েছে। উমা শব্দের এসব বিচিত্র ব্যাখ্যা সন্দেহাতীত নয়। উমা শব্দটি হয়ত মূলত কোনও সংস্কৃত শব্দই নয়।[২]

পার্বতী শব্দটির মূল অর্থ, পর্বতে আছে বা পর্বত সম্বন্ধীয়। ইহা হতে পরে 'পর্বত-দুহিতা' এই অর্থের বহুল প্রচার হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে পার্বতী পর্বত-কন্যা নহেন, তিনি সেখানে পর্বতবাসিনী। ইহাতে মনে হয়, পার্বতী দেবী মূলে পর্বত-দুহিতা ছিলেন না; তিনি পর্বতবাসিনী দেবী বলেই পার্বতী।

কেনোপনিষদের মধ্যে উমার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উমা যে দেবী

১, ২, ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

দুর্গার প্রাচীন ধারা তাঁকে আমরা বেদের মধ্যে পাই। বেদের দেবীসূক্তের সঙ্গে দুর্গাকে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান কালের দেবীপূজা-বিধানে দেবীসূক্তকে দেবীর প্রাচীন মন্ত্র বলে গ্রহণ করা হয়। দেবীসূক্তটি আসলে অম্ভৃণ ঋষির বাক্-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কন্যার উক্তি। শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে এই সূক্তটির মিল থাকায় শক্তিপূজা ও শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ইহা গৃহীত হয়ে থাকে। বাক্-ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা লাভ করে উপলব্ধি করেছিলেন, বিশ্বচরাচরের মধ্যে যা-কিছু আছে সবই ব্রহ্ম; সুতরাং তিনি নিজেও ব্রহ্ম। এজন্য তিনি বলেছেন,—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

অর্থাৎ আমি রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি; আমি মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। দেবীসূক্তের প্রথমাংশ ইহাই।

ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তের সঙ্গেও দেবীকে যুক্ত করা হয়েছে। সূক্তটির প্রথমাংশ এরূপ,—"আগমনকারিণী দেবী রাত্রী বহুদেশে প্রকাশমানা হইয়া (সবকিছু) বিশেষরূপে দেখিলেন, সকল শ্রী ধারণ করিলেন। অমর্ত্যা দেবী বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপ্ত করিলেন—নীচু এবং উঁচু উভয়ই, এবং জ্যোতিদ্বারা তম নাশ করিলেন। আগমনকারিণী দেবী ভগিনী উষাকে নিরাকৃত করেন; তম অপগত হয়। সেই রাত্রী আজ আমাদের (প্রতি প্রসন্না হউন)—যাঁহার আগমনে আমরা সুখে অবস্থান করি—যেমন বৃক্ষে পক্ষিগণ বসতি করে।"

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে দেবীর স্পষ্ট উল্লেখ সর্বপ্রথম অথর্ববেদেই পাওয়া যায়। ইহার একটি সূক্তে দেবীকে সিংহ-ব্যাঘ্র-সর্পের মধ্যে স্থিতা, অগ্নিতে-ব্রাহ্মণে-সূর্যের নিহিতা, ইন্দ্রের জন্মদাত্রী বলা হয়েছে। অথর্ববেদে যে দেবীকে প্রথম শক্তিময়ী-দীপ্তিময়ী রূপে দেখা গেল, কেনোপনিষদের মধ্যে তাঁকে বহু শোভমানা হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূত হতে দেখি। দার্শনিক দৃষ্টিতে এই উমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী এবং প্রথম জ্যোতীরূপা বলে তিনি স্বর্ণকান্তি, তিনি হৈমবতী। আবার হিমবৎ পর্বতের কন্যা বলেও তিনি হৈমবতী হতে পারেন। ইহাতে অনুমান হয়, কেনোপনিষৎ রচনাকালে হৈমবতী উমার একটি বিশিষ্টা দেবীরূপে প্রসিদ্ধি ছিল।

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে উমার বিশদ পরিচয় নিহিত আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে দেখা যায়, হিমবানের দুই কন্যা—গঙ্গা ও উমা। উমা উগ্র তপস্যায়

ব্রতী হয়েছিলেন বলে, হিমালয় তাঁকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। মহাভারতের মধ্যে উমার আরো নিবিড় পরিচয় লাভ করা যায়। জটাজুট ধারী মহাদেব ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত হয়ে, সিংহচর্মের উত্তরীয় ও সর্পোপবীত ধারণ করে হিমগিরিতটে উপবিষ্ট ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শৈলসুতা পার্বতী সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পরিহাসচ্ছলে প্রিয়তমের নেত্রদ্বয় হস্তদ্বারা সমাচ্ছন্ন করলেন। তারপর মহাদেবের ললাট হতে মার্তণ্ডসদৃশ নেত্র সমুৎপন্ন হয়ে হিমালয়কে দগ্ধ করতে লাগল। পার্বতীর অনুনয়-বিনয়ে মহাদেব আবার প্রীতিপূর্ণ-লোচনে দৃষ্টিপাত করলে হিমালয় পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে। এরপর পার্বতী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাদেব ধর্মরহস্য, তপস্যারহস্য ও মোক্ষরহস্যের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে উমার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষতনয়া সতী পিতৃকৃত অপমান সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন ও পরে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে মহাদেব সতীহারা হয়ে হিমালয়ের সানুদেশে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তারপর উমা মহেশ্বরের তপোভঙ্গ করলেন, তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। দেবসেনাপতি কুমারের সম্ভব হল।

উমা সম্পর্কে এপর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, উমা পর্বত-দুহিতা; তাঁর অপর নাম পার্বতী। তিনি পর্বতবাসিনী, সিংহবাহনা। এই সিংহবাহিনী শৈলসুতা উমা বা পার্বতী শক্তিদেবীর প্রাচীন রূপ এবং এঁর সঙ্গে পরবর্তী কালে অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভবানী প্রভৃতি সব দেবী একত্র হয়ে এক সর্বরূপা মহেশ্বরী দেবীর সৃষ্টি করেছেন।

কালিদাসের কাব্যে দক্ষতনয়া সতীর মেনকা-গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণের কাহিনী থেকে মনে হতে পারে পার্বতী উমার ধারা দেবীপূজার ইতিহাসে প্রাচীন ধারা নয়। কিন্তু সতীর দেহত্যাগের উপাখ্যানের কোন আভাস বৈদিক সাহিত্যে বা রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে নেই। ইহা প্রধানত পুরাণ মূলক বলেই মনে হয়। বেদের মধ্যে অদিতিকে দক্ষ কন্যারূপে পাওয়া যায়। দক্ষের যজ্ঞবেদীরূপে ও দক্ষ-তনয়া কথাটির ব্যবহার বেদে দেখা যায়। দক্ষ-তনয়া কখন সতীনাম গ্রহণ করলেন তা দুর্জ্ঞেয়। মহাভারতের মধ্যে যজ্ঞের উল্লেখ আছে, কিন্তু সতীকাহিনীর কোন আভাস নেই।

দক্ষতনয়া সতী

পুরাণের মধ্যে দক্ষ-কন্যারূপে সতীকে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, গরুড় পুরাণাদির মতে সতী দক্ষের চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে একজন। ভব তাঁর

স্বামী। এই ভব বা শিবপত্নীকে পরে আমরা মহাদেবীরূপে দেখতে পাই।

ভারতের দেবদেবীপূজার ইতিহাসে কিন্তু এই সতীর দেবীরূপে পূজার প্রচলন কোন যুগে তেমন প্রসিদ্ধ নয়। তিনি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের আরাধ্যাও নন। তিনি বহু দেবীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে পূজা লাভ করেন। প্রথমত, কালী, তারা, ভৈরবী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা—এই দশমহাবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, দ্বিতীয়ত একান্ন পীঠের দেবীগণের সঙ্গে এবং তৃতীয়ত পার্বতী উমার ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূজা আরাধনা গ্রহণ করেন। পুরাণের মধ্যে সতীর দশ মহাবিদ্যা বা সতী-অঙ্গে একান্ন পীঠের উৎপত্তির কথা পাওয়া যায় না। এগুলি অর্বাচীন কালের সৃষ্টি বলে মনে হয়। সতীর দশমহাবিদ্যারূপের বর্ণনা 'মহাভাগবতপুরাণ' নামক উপপুরাণে, 'কুব্জিকা তন্ত্রে' নারদপঞ্চরাত্রে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত দেবী-অঙ্গ পতনে পীঠসমূহের উৎপত্তির কথা লক্ষিত হয়।

পার্বতী উমা পরবর্তী কালে দুর্গা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। দুর্গাদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ প্রথম তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ-উপনিষদের মধ্যে (দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ) পাওয়া যায়।

• দুর্গা

দুর্গাকে আমরা দুর্গতিনাশিনী বলেই জানি। তিনি দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, শোক, দুঃখাদি হনন করেন বলে তাঁর নাম দুর্গা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারে দুর্গম ভবসাগরে নৌকাস্বরূপ বলে তিনি দুর্গা; আবার দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেন বলে তিনি দুর্গা। দুর্গা শব্দের এসব ব্যাখ্যা আদৌ সন্তোষজনক নয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দুর্গ রক্ষাকারিণী, দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হলেন দুর্গা। দেবী পুরাণে দুর্গার স্তবে (ত্বংহি দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দুর্গপরাক্রমে।) খিল হরিবংশের মধ্যে (এবং স্তুতা মহাদেবী দুর্গা দুর্গপরক্রমা) ইহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। দুর্গের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীই পরে সর্বশক্তিময়ী দেবীরূপেই পূজিতা হন।

মহাদেবীরূপে পূজালাভের বেলায় পার্বতী উমা খানিকটা পিছিয়ে পড়েন এবং সেক্ষেত্রে মায়ের দুর্গারূপই প্রধান্য লাভ করেছে।[১] এই দেবীপূজা ভারতে কোন সময়ে থেকে শুরু হল তা বলা কঠিন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে

১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

শরৎকালে (শরৎকাল হল দেবতাদের নিদ্রার সময়। সেকারণে শরৎকালে দেবীর বোধনকে অকালবোধন বলা হয়।) দেবীর বোধন করে পূজা করেছিলেন, এই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে ইহার আভাস মাত্র পওয়া যায় না।

মহাভারতের বিরাট পর্বে যুধিষ্ঠির কর্তৃক এবং ভীষ্মপর্বে অর্জুন কতৃক যে দুর্গাস্তব লক্ষ্য করা যায় তাও পরবর্তিকালের প্রক্ষেপ বলেই মনে হয়।

উমার মধ্যে আমরা কন্যা-জায়া-জননীর রূপ লক্ষ্য করি। কিন্তু দেবী যখন অসুরনাশিনী শত্রুমর্দিনী তখন তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী। দেবীর এই অসুর-নাশিনী মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মিশে আছে দেবীর চণ্ডী-রূপ! পরবর্তিকালে উমার ধারার সঙ্গে এই চণ্ডীর ধারা মিশে এক হয়ে গিয়েছে।

চণ্ডী বা চণ্ডিকা

'চণ্ডী' গ্রন্থদ্বারা চণ্ডী বা চণ্ডিকার মাহাত্ম্য প্রচারলাভ করেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য নামক ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই হল প্রসিদ্ধ চণ্ডী গ্রন্থ ইহা শাক্ত। সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ। চণ্ডীতে এক পরমা দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। দেবী, ভগবতী, চণ্ডিকা, আম্বকা দুর্গা, গৌরী কাত্যায়নী, শিবদূতী, শাকম্ভরী, ভীমা, ভ্রামরী, কৌশিকী, কালী, চামুণ্ডা, পার্বতী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে তিনি অভিহিতা হয়েছেন। তবে তাঁর মুখ্য পরিচয় চণ্ডিকা।

'চণ্ডী'র মধ্যে তিনটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করে দেবীর মহিমা প্রচারলাভ করেছে। প্রথম ঘটনাটি হল দেবীর সহায়তায় বিষ্ণু কর্তৃক মধুকৈটভ বধ, দ্বিতীয়টি হল দেবী কর্তৃক মহিষাসুর বধ এবং তৃতীয়টি হল দেবী কর্তৃক শুম্ভ নিশুম্ভ বধ। দেবীর স্বতন্ত্র রূপই চণ্ডীর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথম দুই ঘটনার মধ্যে হিমালয়ের সঙ্গে দেবীর কোন সম্পর্ক লক্ষিত হয় না। কেবল দ্বিতীয় ঘটনাতে দেবতাদের তেজোরাশি হতে দেবীর অবির্ভাবের পর হিমাবানকে দেবীর বাহন সিংহ দিতে দেখা যায়। তৃতীয় ঘটনাতে দেবীকে হিমালয়বাসিনী বলা হয়েছে; কিন্তু সেখানেও হিমালয়ের সঙ্গে দেবীর কোন সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত হয়নি।

চণ্ডীর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঐখানে শিবের সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্কটি নিতান্ত গৌণ। মাধুকৈটভ বধের সময় দেবী জগৎপতির যোগনিদ্রা, হরির মহামায়ারূপে কীর্তিতা হয়েছেন। স্তবে তাঁকে বলা হয়েছে, তিনি স্বাহা, স্বধা, তিনি প্রণবরূপা, সাবিত্রী, দেবজননী, তিনি সৃষ্টি-স্থিতিসংহারিণী, মহাবিদ্যা,

মহামেধা, মহাসুরী তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, কালরাত্রি, মহারাত্রি, তিনি শ্রী, হ্রী, বুদ্ধিরূপিণী, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি ইত্যাদি।

মহিষাসুরনিধনকালে দেবীকে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হতে দেখা যায়। মহিষাসুর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা তাঁকে অসুরবধের কথা চিন্তা করতে বললেন। দেবতাদের কথা শুনে মধুসূদন শম্ভু কোপ করলেন। কোপে প্রথম বিষ্ণুর, পরে শঙ্করের বদন হতে তেজ নির্গত হতে হল। তারপর ইন্দ্রাদি দেবতাদের দেহ হতেও সুবিপুল তেজোরাশি নির্গত হতে লাগল। এই সমুদয় তেজোরাশি একত্র ঘনীভূত হয়ে এক অপরূপ নারী মূর্তি পরিগ্রহ করল। সকল দেবতা সেই তেজোময়ী নারীকে একটি করে অস্ত্র দান করলেন। পিনাকী তাঁকে ত্রিশূল দান করেছিলেন। এই জ্যোতির্ময়ী দেবী হলেন মহিষাসুর-মর্দিনী। এই ঘটনাতেও দেখা গেল পিনাকপাণি শঙ্করের সঙ্গে দেবীর সম্পর্কটি নিতান্তই গৌণ। এখানে তিনি অসুর লাঞ্ছিত দেবগণের মধ্যেই একজন, এর বেশী আর তিনি কিছু নন।

তৃতীয় ঘটনাতে দেখা যায়, দেবী যখন শুম্ভাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁর সাহায্যার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক ইন্দ্রাদি দেবগণের দেহ হতে তাঁদের শক্তিসমূহ নির্গত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা হন। সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে শিব দেবীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন দেবী যেন তাঁর প্রতি প্রীতিবশত সকল দেবশক্তিকে নিয়ে অসুর নিধন করেন। দেবীও শিবকে তাঁর দূতত্ব স্বীকার করে নিয়ে শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট তাঁকে যেতে বলেন। শিবকে এভাবে দৌতকার্যে নিযুক্ত করে দেবী জগতে 'শিবদূতী' নামে অভিহিতা হন। এখানেও যে শিবকে পাওয়া গেল, তিনি, চিরপরিচিত মহেশ্বর নন, তিনি দেবতাদেরই একজন। দেবীর দৌত-কার্যে নিযুক্ত হয়ে তাঁর গৌণ রূপটি আরো এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। 'চণ্ডীর' এসকল ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে, চণ্ডীর ধারা পার্বতী উমার ধারা হতে ভিন্ন অন্য একটি ধারা। পরে এই দুই ধারা মিশে এক হয়ে যায়।

দেবীপূজার ইতিহাসের প্রাচীন ধারা পার্বতী উমার সহিত পরবর্তী কালে যে সকল ধারা এসে মিলিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হল কালিকা বা কালীর ধারা। শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে পার্বতী

উষা, সতী, দুর্গা ও চণ্ডিকা দেবীর এই সব কয়টি রূপকে পিছনে ফেলে কালিকা বা কালীই শেষপর্যন্ত সর্বেশ্বরী হয়ে ওঠেন। কালিকা দেবী কেমন করে মহাদেবীর সঙ্গে মিলে গেলেন পুরাণের মধ্যে তা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

কালিকা বা কালী

বেদের রাত্রিসূক্তকে অবলম্বন করে পরবর্তিকালে যে অন্ধকার রূপিণী রাত্রিদেবীর ধারণা গড়ে ওঠে, তাঁর সঙ্গে কালিকার যোগ কেহ কেহ কল্পনা করে থাকেন। ইহা ছাড়া বৈদিক কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী নির্ঋতি দেবীর সঙ্গে কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী কালিকা দেবীর সাদৃশ্যও কেহ কেহ অনুভব করেছেন।

কালী নামটির প্রথম উল্লেখ 'মুণ্ডক উপনিষদে' দেখা যায়। সেখানে কালী আহুতি-গ্রহণকারিণী অগ্নিজিহ্বা মাত্র। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বেও কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণ্ডবশিবিরে প্রবিষ্ট হয়ে অশ্বত্থামা যখন নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করছিলেন সে সময় তাঁরা ভয়ঙ্করী কালীদেবী দেখতে পেয়েছিলেন। মহাভারতের এই ঘটনা পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ হতে পারে।

কালিদাস কুমার সম্ভব কাব্যে কালীর উল্লেখ করেছেন। মহাদেব যখন উমাকে বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন তখন কৈলাস পর্বতের মাতৃকাগণ তাঁর অনুগমন করেছিলেন। কনকপ্রভা মাতৃকাগণের পশ্চাতে ছিলেন কপালাভরণা কালী। কালিদাসের কালীর দাস নামটি দেখে মনে হয় দেবী কালী তাঁর সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

কালীদাসের পর সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এক রক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'খিল হরিবংশে'র মধ্যে শবর-পুলিন্দাদি কর্তৃক পূজিত এক মদ্যমাংসপ্রিয়া দেবীর কথা জানা যায়। ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে নরমাংস দিয়ে পূজিত, এক ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনিই ভয়ঙ্করী 'চামুণ্ডা'। এই দেবী কৃষ্ণবর্ণা উগ্রা। পরবর্তিকালে এই চামুণ্ডা কালীর সহিত মিলে এক হয়ে যান। 'চণ্ডী'র মধ্যে দেখা যায়, এই কালী ও চামুণ্ডা আবার মহাদেবীর সঙ্গে এক হয়ে গেছেন।

'চণ্ডী'র মধ্যে আছে দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য যখন হিমালয়বাসিনী দেবীর নিকট উপস্থিত হন তখন তাঁর শরীরকোষ হতে এক দেবীর সমুদ্ভব ঘটে। শরীরকোষ নিঃসৃতা বলে ইহার নাম কৌশিকী। দেহ হতে কৌশিকী বহির্গত হয়ে গেলে পরে দেবী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান। এজন্য তিনি কালিকা নামে

অভিহিতা হন। আবার অন্যত্র দেখা যায়, শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণকে দেখে দেবী কোপপ্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁর বদন কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। তাঁর ললাট থেকে দ্রুত এক অসিপাশধারিণী কালী বিনিষ্ক্রান্তা হলেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, নরমালাবিভূষণা লোলজিহ্বা-হেতু ভীষণা, রক্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্টা।

দেবী ললাট হতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়েই কালী অসুরগণকে বিনাশ করতে লাগলেন, তাদের সৈন্যগণকে ভক্ষণ করতে লাগলেন। গজারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী সকলকেই তিনি চর্বণ করতে লাগলেন। দেবী তারপর চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করে তাদের ছিন্ন মুণ্ডদ্বয়কে হস্তে ধারণ করে দেবী চণ্ডিকার নিকটে উপস্থিত হলেন এবং অট্টহাস্য করে বললেন, চণ্ড-মুণ্ড পশুদ্বয়কে তিনি তাঁকে উপহার দিলেন, দেবী যেন তারপর শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন। চণ্ডিকা তখন বললেন, কালী যেহেতু চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন শির এনেছেন, সেহেতু তিনি চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হবেন।

চণ্ড বা মুণ্ড থেকে কখন চামুণ্ডা শব্দ হতে পারে না। পুরাণকার আসলে কালী ও চামুণ্ডাকে মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, সেজন্য তিনি দেবীকে প্রথমে কালী এবং তারপর আবার কালীকে চণ্ডমুণ্ডা-হন্ত্রী চামুণ্ডা নামে অভিহিত করেছেন।

রক্তবীজ নিধনকালেও দেখা যায় কালী চণ্ডিকাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। চণ্ডিকা শূলদ্বারা রক্তবীজের দেহকে আহত করলে কালী মুখ দিয়ে তার রক্ত লেহন করে নেন। কালী-চামুণ্ডার মুখে পতিত রক্ত হতে যত অসুর উদ্ভূত হতে লাগল, কালী-চামুণ্ডা তাদের সকলকে ভক্ষণ করলেন। 'চণ্ডী'তে এভাবে কালী-চামুণ্ডার রক্তলোলুপতা প্রকাশ পেল।

পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে কালী বা কালিকার যে বিবর্তন দেখা যায় তার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করার মত বস্তু হল কালীর সঙ্গে শিবের যোগ। কালী শিবারূঢ়া, তাঁর এক পদ হরহৃদে ন্যস্ত। ভক্ত সাধকের দিক থেকে এই তত্ত্বের নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে, কালী শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া; অসুরনিধনান্তে দেবী অসুর-শব পদদলিত করেছেন, সেই কারণে তিনি শবারূঢ়া—এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। সাধক রামপ্রসাদের গানে এই সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান :

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে॥

দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে॥

পরবর্তিকালের দার্শনিক চিন্তাধারায় শক্তিবিহনে শিবের শবতাপ্রাপ্তির তত্ত্ব খুব প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। শিব তাই শবের স্থান গ্রহণ করেন এবং শবারূঢ়া দেবীও শিবারূঢ়া হয়ে যান।

কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারের মধ্যে কালীরূপের যে বর্ণনা নিহিত আছে বাংলা দেশের মাতৃপূজায় সেই রূপই গৃহীত হয়েছে। দেবী করালবদনা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা। বামদিকের অধোহস্তে ছিন্নশির, উর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণ দিকের অধোহস্তে অভয়, উর্ধ্বহস্তে বর। দেবী শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী। মুণ্ডমালা দেবীর কণ্ঠহার, শবশিশু তাঁর কর্ণভূষণ। তিনি শ্মশান-গৃহবাসিনী। দেবি ত্রিনয়ণী, উন্নতদন্তা। কেশদাম তাঁর দক্ষিণব্যাপী-আলুলায়িত। শবরূপ শিবের হৃদিদেশে তিনি সংস্থিতা।

বাংলাদেশ শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল। পূজার দিক থেকে দেখা যায় কালীপূজার চেয়ে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসব হিসেবে বাংলাদেশে দুর্গাপূজাই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। এত জাঁকজমক করে আর অন্য কোন পূজা বাংলা দেশে হয় না। তবে সাধনার দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যায়, সপ্তদশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে কালীই হলেন সর্বেশ্বরী।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা ঠিক কোন সময় থেকে প্রচলিত হয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রচিত কতকগুলি দুর্গাপূজা বিধিবিষয়ক গ্রন্থ—বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫—১৪৮০) 'ক্রিয়াচিন্তামণি' ও 'বাসন্তীপূজা প্রকরণ' বাঙালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দনের (১৫০০—১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' ('দুর্গোৎসবতত্ত্ব' নামক প্রকরণ) থেকে অনুমান করা যায়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলা দেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত আছে। বর্তমানে আমরা যে দুর্গাপূজা করি তা সম্ভবত ষোড়শ শতক থেকে প্রচলিত হয়। শুনা যায়, আকবরের রাজত্বকালে

উদয় নারায়ণের পৌত্র রাজা কংসনারায়ণ নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করে দুর্গাপূজা করেছিলেন।

কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে কালীপূজাবিধিবিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হয়। এদিক থেকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-সঙ্কলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণানন্দ ষোড়শ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ তাঁর 'তন্ত্রসার' গ্রন্থকে পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলে মনে করেন। তন্ত্রসাধনার ক্রিয়াকলাপ বিধিসংক্রান্ত গ্রন্থের প্রণেতারূপে সর্বানন্দের বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি ষোড়শ শতকের প্রথম বা মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী' ও 'তারারহস্য' নামক দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা। সর্বানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ (ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক) কালীসাধকের আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করে 'শ্যামারহস্য' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমানে দীপালী-উৎসবের দিনে যে বাৎসরিক কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার বিধিবিধান সম্ভবত কাশীনাথের 'কালীসপর্যাবিধি (১৭৬৮ খ্রীঃ) গ্রন্থে সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

শুনা যায়, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা দেশে প্রথম কালীপূজার প্রবর্তন করেন। তাঁর পৌত্র ঈশানচন্দ্র নাকি সহস্র সহস্র মণ নৈবেদ্য, সহস্র সহস্র বস্ত্রখণ্ড ও নানাবিধ উপচারে কালীর পূজা করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে বাংলাদেশে কালীকে অবলম্বন করে তন্ত্রসাধনা শুরু হয়। তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, সর্বানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালের প্রখ্যাত তান্ত্রিক সাধক বামাক্ষেপা প্রায় একশ বছর আগে বীরভূম জেলার তারাপীঠের নিকট আটলাগ্রামে আবির্ভূত হন।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শক্তিসাধকরূপে যিনি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তিনি হলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি আবির্ভূত হন। শাক্তপদাবলী সাহিত্যের তিনি স্রষ্টা। তাঁর পর সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাধক শাক্তগান রচনা করেন। পরম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বাঙালীর শক্তিসাধনাকে বিশ্ববিখ্যাত করে যান।

শাক্তপদাবলীর বিষয় বিভাগ।

শাক্তপদাবলীর বিষয়কে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

(১) ভগবতীর লীলা; (২) শক্তিতত্ত্ব এবং (৩) শক্তি সাধনতত্ত্ব। শক্তি দেবীর পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণে 'ভগবতীর' লীলার অংশ পরিকল্পিত হয়েছে। হিমালয় ও তদীয় পত্নী মেনকা সুকঠোর তপস্যা করে জগজ্জননীকে কন্যারূপে লাভ করেন। কন্যার নাম হল উমা। স্নেহের দুলালী অপরূপ রূপবতী, চঞ্চলা উমা দেখতে দেখতে আষ্টমবর্ষে পদার্পণ করলেন। নারদের পরামর্শে তাঁকে যোগীশ্বর মহাদেবের পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হল। উমা 'পঞ্চতপা' (চতুর্দিকে অগ্নি ও উপরে সূর্য এই পঞ্চ উত্তাপের মধ্যে যিনি তপস্যা করেন) হয়ে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলেন। উমার কঠিন তপশ্চর্যা দেখে মা মেনকা অবাক হয়ে গেলেন। নারদের নির্দেশে হিমালয় মহাদেবের হস্তে অষ্টমবর্ষীয়া উমাকে সমর্পণ করে অশেষ পুণ্য অর্জন করলেন। এই বিবাহে মেনকা কিন্তু খুশি হতে পারলেন না। কারণ মহাদেব একে ভিখারী, তার উপর আবার অতি বৃদ্ধ। রাজনন্দিনী উমা কেমন করে এই জামাইকে নিয়ে ঘর করবে সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন মেনকা। বিবাহের পর যথারীতি মহাদেব গৌরীকে নিয়ে নিজধাম কৈলাসে চলে গেলেন। মেনকার দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। বৎসরান্তে উমা মাত্র তিনদিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন। এই দিনকটির জন্য মা মেনকা কত ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করে থাকেন। কন্যার পিতৃভবনে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিরহতুরা জননীর শোক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তারপর আবার মিলনজনিত আনন্দে তাঁর হৃদয়খানি পূর্ণ হয়ে যায়। উমার পতিগৃহে যাত্রার সময় হলে মা মেনকার মর্মস্পর্শী দুঃখার্তির আর সীমা থাকে না। শাক্তকবিগণ এই পৌরাণিক কাহিনীটিকে অবলম্বন করে এক অপূর্ব গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

ভগবতীর লীলার আবার তিনটি পর্যায়—বাল্যলীলা, অগমনী ও বিজয়া। বাল্যলীলা অংশে উমার অভিমান বা চঞ্চল স্বভাব শাক্ত কবিগণ বাস্তবরসে সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। অভিমানিনী উমার রূপটি সাধক কবি রামপ্রসাদের গানে চমৎকার ফুটে উঠেছে:

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥

মায়ের চঞ্চল স্বভাবখানি রাধিকাপ্রসন্নের গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে:

আর জাগাস নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
কত করে' উমা এই ঘুমাল।
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে;
সন্ধ্যা বেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে—
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল।

কৈলাস হতে পার্বতীর পিতৃগৃহে আগমনের ঘটনা নিয়ে শাক্ত কবিগণ আগমনী সঙ্গীত রচনা করেছেন। মেনকার কন্যাবিরহ, পর্বতের কৈলাস গমন এবং উমার পিতৃগৃহে আগমনের কথা আগমনী পর্যায়ে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। গোবিন্দ চৌধুরী মেনকার কন্যাবিরহ মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ?
ঐ যে সবাই এসে দাঁড়ায়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই!
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি আমার কৈ শশিমুখী?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মা'খ',
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী?

নির্ঝরিণীর জল, হল নিরমল,
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল,
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল,
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে—
কেবল তারা নেই।
শরতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়,
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই!

কন্যাবিরহে মেনকার প্রাণসংশয় উপস্থিত হল। তিনি গিরিরাজকে উমাকে আনার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। গিরিরাজ মেনকার কথায় হরিষে-বিষাদে প্রমোদে-প্রমাদে ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে ধীরে চললেন হরপুরে। সাধক কমলাকান্ত গিরিরাজের কৈলাসযাত্রার এই চিত্রখানি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন :

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদে প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে॥
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব,
আজি তনু জুড়াইব আনন্দ-সমীরে।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি কি কব রাণীরে॥
দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেম-নীরে।
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমারে আনিতে হবে ঘরে॥

পিতাকে দেখে উমার জনক-ভবনে আসার জন্য প্রাণ আনচান করতে লাগল। তিনি করুণভাবে শিবের অনুমতি ভিক্ষা চাইছেন :

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর,
যাইতে জনক-ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে॥

হরের জীবনধন ; প্রাণের উমাকে ফিরে পেয়ে মেনকার আনন্দের আর সীমা নেই। আনন্দবিহ্বলচিত্তে তিনি গিরিরাজকে বলছেন,—

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো?
স্তবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো।
উমা-শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে আঁখি মন জুড়াইল।

'বিজয়া' পর্যায়ে উমার পতিগৃহে যাত্রার বিষয় অবলম্বনে মেনকার মর্মান্তিক দুঃখার্তি বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতে কন্যাশোকাতুরা মেনকার হৃদয়ের কথাটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে :

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়!
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে উমা-ধনে মা হয়ে দিব বিদায়!
হয়েছিল বড় সুখ, যার কথা শুনে ফাটে বুক,
মাগো, তোমরা বলে কয়ে বুঝাইয়ে ক্ষান্ত কর প্রাণ-উমায়।
ছ-মাস ন-মাস নয়, এসে দশ দিনতো থাকতে হয়,—
মাগো, সে দেশেতে দশমী হ'লে কি হবে আমার দশায়।
উমা হইল সন্তানের মাতা, যার কেমন প্রাণ বুঝলে না তা,
ওগো, পরের যে ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কাঁদলে তার কি দায়!

শক্তিতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীতে দেবীর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। শাক্তসাধকগণের নিকট দেবী দুর্গা হলেন পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিরূপিণী। জগতের মূল পরম-কারণ তিনি। সাধকগণ জগতের মূল পরম-কারণকে আবার মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন। ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মকে যেখানে অব্যক্ত, নিরুপাধি, গুণাতীত, অচিন্ত্যরূপে কল্পনা করেন, তাঁকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তা বলে জ্ঞান করেন, শাক্ত সাধকগণ সেখানে তাঁকে জননীরূপে, মাতৃরূপে সন্দর্শন করেন। শাক্তসাধকগণের মতে এই জগজ্জননীও অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ, নিরুপাধি; তিনি নিত্য, চিৎস্বরূপা। আবার তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্ত্রী। সাধকের চক্ষে তিনি ইচ্ছাময়ী, লীলাময়ী। তাঁর তত্ত্ব বোঝা ভার। কবি তাই বলেন,—

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব প্রসবিনী,
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।
তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্যহেতু চিৎ-বিমুখী
চিদানন্দে পিছে রাখি চিন্তানন্দে উন্মাদিনী।

ত্যজ্য করি নির্বিকারে, মহৎ হতে অন্ধকারে,
সৃষ্টি কর সবিকারে, বিকাররূপিণী।
সেই হতে তিন শক্তি, তিন কার্যে এক মুক্তি,
তিনে এক হয়ে মুক্তি রসিকে দিও জননী॥

ভক্তচক্ষে কখন তিনি 'সর্বময়ী সর্বমঙ্গলা সুন্দরী,'—

কে বলে আ মরি! তোমায় দিগম্বরী,
শবাসনা বিবসনা ভয়ঙ্করী।
জ্ঞান-নেত্রে আমি চেয়ে দেখি, তুমি
সর্বময়ী সর্বমঙ্গলা সুন্দরী।
বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী
পালন করি বিশ্ব, নাম বিশ্বম্ভরী॥
অসীম অম্বরে সম্বরিতে নারে; (জননী গো)
তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী।
অসুর সংহারে উদ্যত অশনি,
ভক্ত-সাধকের হৃদে প্রশান্তরূপিণী।

আবার কখন তিনি মুক্তকেশী, ভয়ঙ্করী, তিমিরবরণী বামা:—

রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥
কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নবীন ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥
বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি।
ত্থাখ, শব-ছলে চরণতলে, আশুতোষ পড়িল আসি॥

শাক্ত-কবিগণের শক্তিসাধনতত্ত্ববিষয়ক পদের মধ্যে শক্তিকে লাভ করার গুহ্য সাধনতন্ত্রের ইঙ্গিত রয়েছে। শক্তিসাধনার ব্যাপারে সাধকগণ বাহ্য পূজা ও সহস্র বিধিনিষেধের ধার ধারেননি। তাঁরা দেবীর মনোময় প্রতিমা গড়ে হৃদিপদ্মাসনে বসিয়ে মনে মনে তাঁকে ধ্যান করেন। সাধককবির কণ্ঠে তাই শুনতে পাই,—

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥

ঝাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে না রে জগৎজনে॥
ধাতু-পাষাণ-মাটির মূর্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গাড়ি বসাও হৃদিপদ্মাসনে॥

সাধকগণ শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে দেহকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। শক্তি জীবদেহেতে বাস করেন। দেহকে চরম সাধ্য জ্ঞান করে তাই তাঁরা দেহটিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দেহস্থ বহু নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিনটি নাড়ী প্রধান। ইহাদের মধ্যে সুষুম্নাতে ছটি চক্র আছে: মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞা। এই ষট্‌চক্রের উপরেই ব্রহ্মরন্ধ্রে একটি সহস্রদল পদ্ম অধোমুখী হয়ে বিরাজ করছে। এই পদ্মেই পরম শিব অবস্থিত। মূলাধারে সার্ধত্রিবলয়াকারে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় রয়েছেন। এই সুষুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে ষট্‌চক্রের মধ্য দিয়ে সহস্রারে পরম শিবের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই জীব এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি লাভ করে। শিব-শক্তির মিলনজাতি এই আনন্দামৃতকে সাধকগণ বলেন 'সামরস্য'। এই সামরস্য লাভ করাই সাধকের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছালে যত বিষয়মধু, কামাদি কুসুমসকল জীবের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়; সুখ-দুঃখ সব একাকার হয়ে গিয়ে সাধকের চিত্তে তখন আনন্দসাগর উথলে ওঠে:

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ, সুখদুঃখ সমান হোল আনন্দসাগর উথলে॥

শাক্তপদাবলীর অনেক স্থলে সাধকগণ সাধনতত্ত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমন,—

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন, ষট্‌চক্র-রথমধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ-দেশান্তরে॥
জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশ কুশী মারে।
সে যে সময়-শিব নাড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে॥

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে।
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার দু'অক্ষরে॥

অথবা,

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥

শাক্তপদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য॥

সাহিত্যসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন দুটি বস্তুর—একটি অনুভূতি, অপরটি কল্পনা। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি মেলে মানুষ যখন অন্তরের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ময় অনুভব করে তখন তার মনে নিবিড় ভাবের উদয় হয়। এই ভাব অনুভূতিপ্রসূত। অনুভূতি যত গভীর হয়, ভাব ততই গাঢ় হয়। এই নিগূঢ় ভাব নিয়ে মানুষ কখন স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তাকে প্রকাশ করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যে শক্তিদ্বারা মানুষ তার অনুভূত ভাবরাশিকে প্রকাশ করে তারই নাম কল্পনা। কল্পনাশক্তি প্রখর হলে ভাবটাও সহজ-সুন্দর হয়ে প্রকাশিত হয়। সাধক ও কবি উভয়ের মধ্যেই এই অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি নিহিত থাকে। কেবল উভয়ের প্রকৃতি ভিন্ন। সাধক চান অন্তরের অনুভূত ভাবসত্যকে কল্পনাদ্বারা ভক্তের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করে তাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে; আর, কবি চান অন্তরের ভাবকে অন্যের কাছে সুন্দর করে প্রকাশ করে অন্যের আনন্দদান করতে। সাধকের অবলম্বন হল তত্ত্ব-উপদেশ-বাণী এবং কবির অবলম্বন হল ছন্দ-অলংকার, ধ্বনি-সুর, ভাষা-ভাব। সাধকের

ধর্ম ও সাহিত্য

সাধনা মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সাধনা, আর কবির সাধনা অভিনব সৃষ্টির। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, সাধক ও কবি ভাবের জগতে উভয়ে এক, কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী। এজন্য ধর্ম ও সাহিত্য ঠিক এক জিনিস নয়। তবে ধর্মীয় ভাব যদি নিছক তত্ত্বকথার বাহন না হয়ে অপূর্ব ছন্দ-অলংকারে, ধ্বনি-সুরে ঝংকৃত হয়ে ওঠে তাহলে তা সাহিত্যপদবাচ্য হয়। শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রে আমরা ইহাই দেখতে পাই। সাধকের অন্তরের বাসনা-কামনা, আনন্দ-বিরহ এখানে অপূর্ব প্রকাশগরিমা লাভ করেছে। শাক্তপদাবলী তাই ধর্মসঙ্গীত হয়েও, তা কাব্য হতে পেরেছে।

যাঁর মায়ায় অসার সংসারচক্র নিরবধি ঘূর্ণিত হচ্ছে, বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে যিনি মহাশক্তিরূপে বিরাজ করছেন তাঁর রূপ কেমন তা ভেবে যখন সাধক বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন তখন পাঠকের হৃদয়ও উদ্বেল হয়ে ওঠে। সাধক কবি রামপ্রসাদের গানে ইহার নিদর্শন পাওয়া যাবে :

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালরূপ হল।

কাল বড় অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখিলে,
হৃদয়-পদ্ম করে আলো।
রূপে কালী নামে কালী
কাল হইতে অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে,
অন্যরূপ লাগে না ভালো।

মুমুক্ষু চিত্তের ব্যাকুলতা শাক্তপদাবলীতে চমৎকার ফুটে উঠেছে :

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা,
ভুলেছ কি রাজ-মহিষী।
তারা, কত দিনে কাটবে আমার,
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি।

অথবা,

কোথায় গো মা ভবদারা, ভবার্ণবে ডুবে মরি।
দয়া করে দাও মা তারা, তোমার ঐ চরণ তরী॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা, দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী॥

অসহায় চিত্তের করুণ উক্তি শাক্তপদাবলীতে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥

ভক্তের চিত্তবিরহ সুন্দর ফুটে উঠেছে শাক্তকবিতার মধ্যে :

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি-দড়া॥
সময় থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥

গীতিকবিতার মধ্যে কবির আত্মপ্রকাশের (self expression) ব্যাকুলতা এবং প্রগাঢ় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ (spontaneous overflow of powerful feelings) বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শাক্তপদাবলীর ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদগুলিতে সাধককবির আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়। সাধককবিগণ এখানে দেবতাকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে নিজের দুঃখ-বেদনা তাঁর কাছে জানিয়েছেন। জগৎজননীর স্বরূপ-উপলব্ধির পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কখন তাঁরা বলেন,—

গীতিকবিতা ও শাক্তপদাবলী

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ি)!
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে॥

আবার কখন দুঃখ-জ্বালায় জ্বলে শ্যামা মার কাছে তাঁরা চরম শান্তির আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন :

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিস্ নে ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী বোলে।

আকুলভাবে তাঁরা মনের বাসনা জানিয়েছেন শ্যামা মাকে :

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।
অন্তিম কালে জিহবা যেন বলতে পায় মা কালী কালী ॥
হৃদয়-মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ।

কবিচিত্তের নিগূঢ় অনুভূতির পরিচয়ও শাক্তপদে আছে। যেমন,—

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

* * *

জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে,
শিব-যুক্তি মতন চাইলে।

অথবা,

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা[১] যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের[২] যাগ যজ্ঞ—ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গাপায় ॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ।

১। শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রাণবায়ু। ২। কবি মদন মাষ্টার।

শাক্ত কবিকুল ॥

অষ্টাদশ শতকে প্রায় শতেক কবি আশ্চর্য সাধনশক্তিবলে হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়ে ভক্তিরত্ন আহরণ করে শাক্তপদাবলী রচনা করেন। কেবলমাত্র ভক্তদল নয়, তৎকালীন রাজা-মহারাজা, জমিদার, অভিজাতশ্রেণী, সাধারণ মানুষ সকলেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আধুনিক কালের মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেন। ইহাতে বোঝা যাবে, শাক্ত সঙ্গীত বাঙালীর জাতীয় জীবনে কিরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। শাক্তপদের শিল্পোৎকর্ষ বৈষ্ণবপদের চেয়ে কিঞ্চিৎ ন্যূন হলেও ভাবসম্পদে ও গীতিরসে ইহা বাঙালী হৃদয়কে জয় করে নিয়েছে।

অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য সাধক-ভক্ত ছাড়া দেশের রাজা-মহারাজা, দেওয়ান, কবিওয়ালা, টপ্পাগায়ক পাঁচালিকার, যাত্রাওয়ালা, অধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিক, নাট্যকার পর্যন্ত শাক্তসঙ্গীত রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। প্রথমে সাধক-ভক্ত কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাচ্ছে।

শাক্তপদাবলী সাহিত্যের আদি গঙ্গোত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামপ্রাসাদ সেন ১৮শ শতকের প্রথম ভাগে হালিসহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শুনা যায় রামপ্রসাদ প্রথম জীবনে জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন।

রামপ্রসাদ

কিন্তু মুহুরীর কাজে আর তাঁর মন বসে না। শ্যামা-মায়ের চিন্তায় সদাই বিভোর হয়ে থাকেন। হিসাবের খাতা কেবল সঙ্গীতে ভরে উঠতে লাগল। 'আমায় দাও মা তবিলদারি' গানটি নাকি এসময়কার রচনা। জমিদার রামপ্রসাদের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কর্মবন্ধন হতে মুক্তি দেন এবং বৃত্তি দিয়ে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন।

দেশে ফিরে রামপ্রসাদ মায়ের চরণে তনু-মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে মধুর সঙ্গীত রচনা করতে আরম্ভ করেন। এসময় তাঁর প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ে। কথিত আছে কৃষ্ণচন্দ্রেরই আজ্ঞায় রামপ্রসাদ কালিকামঙ্গল 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে সভাকবি করতে চেয়েছিলেন। রামপ্রসাদ ইহাতে রাজী হননি। মহারাজ রামপ্রাসাদের কবিত্ব শক্তির নিবিড় পরিচয় পেয়ে তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁকে বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি দান করেন। ষাট বৎসর বয়সে কবি পরলোকগমন করেন।

রামপ্রসাদ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের মত বাঙালীর প্রাণের কথাকে সঙ্গীতের সুরে ব্যক্ত করে বাঙালীর প্রাণ-মন হরণ করে নিয়েছেন। বাংলার ঘরে ঘরে বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে তাই আজও তাঁর গান গীত হচ্ছে। সহজ ভাষায় গভীর ভাবসত্য প্রকাশ করার জন্য রামপ্রসাদ এত বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

শ্যামা মায়ের রূপ বর্ণনায় রামপ্রসাদ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন :

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনু রুচির, সজল ঘন নিন্দিত,
চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীলকমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মঞ্জু মুকুতাফল,
রচিত কিবা শোভা, মরি মরি রে॥
গলিত চিকুর ঘটা, নব জলধর-ছটা,
ঝাঁপল দশ দিশি তিমিরে।

রামপ্রসাদ মূলত ভক্ত। জাগতিক বাসনা-কামনা নিরুদ্ধ করে শ্যামা-মায়ের চরণে স্থানলাভ করা, আকুলভাবে 'মা, মা' বলে ডেকে যত দুঃখ-শোক ভুলে যাওয়াই তাঁর সাধনজীবনের লক্ষ্য। এজন্য তাঁর গানে ভক্তির আবেগ, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা উভয়ই রয়েছে। ভক্তের করুণ আকূতি রামপ্রসাদের গানে চমৎকার ফুটে উঠেছে :

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেওমা আমায় অভয় চরণ,
রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা,
যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু-আরাধিত মন্ত্র,
তাও হারালেন সাধন বিনে॥

প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা হবে
তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে,
স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥

অথবা,

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে,
তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে,
তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে, শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে,
তিমিরে তিমিরহারা ॥

মন হল সকল কাজের গোড়া। মন খাঁটি না হলে ভেদবুদ্ধি জাগে—ভবচক্রে ঘুরে বেড়াতে হয়—বাসনা-কামনার দাস হতে হয়—সংসারে এসে কেবল সং সেজেই থাকতে হয়, সার বোঝা আর হয় না। রামপ্রসাদ এজন্য মনকে আগে ধোলাই করতে বলেছেন :

বাসনাতে দাও আগুন জেলে
স্বভাব হবে পারপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ-বালাই
মনের ময়লা, ফেল কাটি ॥
কালীদহের কূলে চল,
সে জলে ধোপ ধরবে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি ॥

রামপ্রসাদের গানে তৎকালীন সমাজের দুঃখ-ক্লান্ত, নিপীড়িত জন-জীবনের মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে। গরীব মানুষ যারা তারা অভাবের তাড়নায় খাজনা দিতে পারে না। তাদের সম্পত্তি সব নিলামে উঠে যায়। দুঃখের ডিগ্রীজারির আসামী বলে প্যায়দা যমদূতের মত তাদের ঘরে এসে উপস্থিত হয়ে নির্মমভাবে পীড়ন করে তাদের টানতে টানতে কাঠগড়ায় নিয়ে হাজির করে। জমিদার একে বিপক্ষে, তার স্বপক্ষে উকিল নিযুক্ত করার ক্ষমতা নেই। হুজুরের যে উকিল সে এমনভাবে 'সওয়াল বন্দী' করে তাতে নিঃস্ব প্রজার হার হয়ে যায় সহজেই। ফলে সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, দীর্ঘদিন ধরে তখন তাকে দুঃসহ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। শ্যামামায়ের কাছে কাবর তাই অভিযোগ,—

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন অবিচারে আমার পরে,
করলে দুঃখের ডিক্রী জারী॥
এক আসামী ছয়টা প্যায়দা,
বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে
বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐযে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি
তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে,
কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে,
বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকীল যে জনা,
ডিসমিসে তার আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী,
যেরূপে মা আমি হারি॥
পালাইতে স্থান নাই মা,
বল কিবা উপায় করি।

ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ,
তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি।

অন্যত্র—

মায়ের এমনি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তারি কপালে বিপদ ঘটে।
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা,
দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানী হবে মা,
নিস্তার হবে মা এ সঙ্কটে
সাওয়াল জবাব করব কি মা,
বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।

সমাজের ঘোর অন্যায়ের প্রতি সাধককবির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষের মর্মের বেদনা যত উদ্ধার করে শ্যামা-মায়ের কাছে নিবেদন করেছেন :

দুটো দুঃখের কথা কই।
দুটো দুঃখের কথা কই গো তারা,
মনের কথা কই॥
কে বলে তোমারে তারা দীন-দয়াময়ী।
কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী রথী জয়ী।
আর কারো ভাগ্য মজুর খাটা।
শাকে অন্ন মিলে কই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়,
আমার ইচ্ছা তেম্নি রই।
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কেহ নই॥
কারো অঙ্গে শাল—দোশালা ভাতে চিনি দই।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি
ধানে ভরা খই।

কেউ মা বেড়ায় পাল্কী চড়ে,
আমি বোঝা বই।
মা গো আমি কি তোর পাকা ধানে
দিয়াছি গো মই।
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।
ও মা আমার ইচ্ছা অভয় পদে চরণধূলা হই॥

রামপ্রসাদের কবিপ্রতিভার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে গভীর ভাবরাশি ব্যক্ত করেছেন। এজন্য তাঁর গান অতি সাধারণ নিরক্ষর মানুষের মর্মে গিয়েও প্রবেশ করে। পাশাখেলা, দাবাখেলা, ঘুড়ি ওড়ান, ঘানিটানা, কৃষিকার্য প্রভৃতি রূপকের সাহায্যে তিনি অনায়াসে মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। যেমন,—

(১) ভবে আশা খেলব পাশা,
বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আসা ভাঙ্গা দশা
প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো॥
পোবার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে বার পেয়ে মা গো,
পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ,
আমার খেলাতে না হলো যশ,
এবার বাজী ভোর হইল।
হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া,
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এল॥

(২) এবার বাজী ভোর হলো।
মন কি খেলা খেলাবে বল।
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘরে ভর করে
মন্ত্রীটি বিপাকে মলো॥

ছুটা অশ্ব ছুটা গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে,
ভবে কেন অচল হলো॥
দুখান তরী নিমক ভারি বাদাম তুলি না চলিল,
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে
ঘাটের তরী ঘাটে রলো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল।
ওরে অন্তঃপরে কোণের ঘরে
পিলের কিস্তি মাত হইল।

(৩) শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভব-সংসারে বাজারের মাঝে)
ঐ যে মন ঘুড়ি আশা বায়ু,
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥

(৪) মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছে অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়
ছটা কলুর অনুগত॥

(৫) মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা॥
কালির নামে দাওরে বেড়া,
ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥

গুরু রোপণ করেছেন বীজ,
ভক্তি বারি তাঁয় সেঁচ না।

ওরে একা যদি (মনরে আমার) না পারিস মন,
রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা ॥

শাক্তপদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কালনায় আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর এবং

সাধক কমলাকান্ত

মাতার নাম মহামায়া। পিতার মৃত্যুর পর কমলাকান্ত মাতুলালয় চান্নায় চলে যান। চান্নার প্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে কবি সব সময় পড়ে থাকতেন। কিছুদিন পরে কবি সাধক কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সাধনশক্তিবলে তিনি মায়ের দর্শন লাভ করেছিলেন। দেবী নাকি তাঁকে গোপকন্যার বেশে ও বাগ্দিনীর বেশে দেখা দিয়েছিলেন। ক্রমে সাধক-ভক্তরূপে কমলা-কান্তের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র তাঁর গুণ-মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। শুনা যায়, কমলাকান্ত মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের গুরু ছিলেন। বর্ধমানের নিকটে কোটাল-হাট নামক স্থানে কবির বসবাসের জন্য গৃহ নির্মিত হয়। সাধক কবি সেখানে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে মাতৃসাধনা করতেন। এই আসনেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

জীবদ্দশাতে কমলাকান্ত অশেষ কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মধুর শ্যামসঙ্গীতে তিনি হিংস্র নিষ্ঠুর দস্যু-তস্করের পাষাণহৃদয়কেও বিগলিত করে দিতেন। কথিত আছে, একসময় কবি শিষ্যবাড়ী হতে চান্নায় ফেরার পথে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার গান শুনে দস্যুহৃদয় পরিবর্তিত হয়ে যায়।

কমলাকান্ত অতি উচ্চস্তরের শক্তিসাধক ছিলেন। শক্তি সাধকগণের মতে, শক্তি জীবদেহে বিরাজ করেন। শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তাই তাঁরা দেহকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। দেহেতে সবই আছে। কমলাকান্তের পদে এই দেহসাধনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যেমন,—

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি,—সেও যেন 'মা' বলে ডাকে।

অন্যত্র—

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ-অন্তঃপুরে॥

* * *

তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন-উচাটন হয়ো নারে।
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে॥
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে।
ওরে, বাজিকরে চিন্‌লে না সে তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

দুঃখার্তি বর্ণনায় কমলাকান্ত আসাধরণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। বিজয়ার ডমরুধ্বনি শুনে মা মেনকা যে সকরুণ উক্তি করেছেন তাতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রাণের উমার বিদায়-বাণী শুনে শোকাকুলা মেনকা বলছেন,—

কি হলো নবমী নিশি হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো॥
কি কহিব মনোদুঃখ গৌরীপানে চেয়ে দেখ—
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান॥
ভিখারী ত্রিশূলধারী যা চাহে, তা দিতে পারি;
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত;
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণী গো॥
পরাণ থাকিতে কায় গৌরী কি পাঠানো যায়;
মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন!
কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে—
হর, আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো॥

কমলাকান্তের পদে সরব উচ্ছ্বাস দেখা যায় না; সর্বত্রই একটা সংযত চিত্তের বিনয়-নম্র ভাব পরিলক্ষিত হয়। জগজ্জননীর রূপ বর্ণনায় কবির এই সংযম-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়:

নব জলধর কায়।
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়॥

কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায়॥
অতি সুশীতল চরণযুগল, প্রফুল্ল কমলপ্রায়।
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায়'॥

কমলাকান্ত রাজসভার কবি অথচ আশ্চর্যের বিষয় রাজসভার উচ্চ আড়ম্বর, উচ্ছৃংখল বিলাসকলা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ এঁরা কেউই অশ্লীলতার হাত হতে মুক্তি পাননি। কমলাকান্ত এদিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এমনকি তাঁর পদে গ্রাম্যতা দোষও দেখা যায় না। তিনি ভ্রমর হয়ে নিরন্তর কালীপদনীলকমলের মধুপানে মত্ত ছিলেন। ছন্দ ও অলংকার সৃষ্টিতে কমলাকান্ত বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন :

শুক্না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাকতে গাছে॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে॥
কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা তারা নামে ছেঁচ্‌লে বাঁচে॥

শাক্তপদাবলীর আর একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি হলেন গোবিন্দ চৌধুরী। বগুড়া জেলার সেরপুরের ব্রাহ্মণ-বংশে কবির জন্ম। সমগ্র উত্তর-পূর্ব বঙ্গে তাঁর শাক্ত সঙ্গীতগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গোবিন্দ চৌধুরী একাধারে সাধক, ভক্ত, পণ্ডিত ও কবি। একারণে তাঁর সঙ্গীতগুলি একদিকে যেমন ভক্তজনমানসে ভক্তিরসের উদ্রেক করে, অন্যদিকে তেমনি রসিক পাঠক সমাজের অন্তরকেও পরিতৃপ্ত করে।

গোবিন্দ চৌধুরী

শাক্তসঙ্গীত তত্ত্বমূলক। সেজন্য ইহার প্রতি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি তেমন আকর্ষিত হয় না। গোবিন্দ চৌধুরীর কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁর সঙ্গীতে নিছক তত্ত্বকথাও মানবরস নিষেকে সাহিত্য হয়ে উঠেছে। যেমন,—

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতুলি সনে,
সেই জানে তোর খেলার মর্ম, যে থাকে সদা তোর ধ্যানে॥

রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে,
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হয়ে ;
মিছে পৃথকভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে ॥
ও মা সর্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল,
আবার ভার্যারূপে ব্রহ্মময়ি, তুমি প্রণয়ের খেলা খেল !
তুমি শিশু-মূরতি হয়ে আলো কর সূতিকা-গৃহ,
আবাব খেলিয়ে নানা খেলা অন্তে শ্মশানে লুকাও সেই দেহ,
মিছে মায়া-ভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে ॥
ও মা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী,
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী,
কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প-শয্যায় শয়ন করি,
কেউ বা গাছের তলায় তৃণ-শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী—
সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে ॥

প্রাচীন যুগের সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান বড়ই সঙ্কীর্ণ। প্রকৃতি দেবী সেখানে ক্বচিৎ স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। শাক্তপদাবলীতে মাঝে মাঝে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করি। সাধক কবি গোবিন্দ চৌধুরীর সঙ্গীতে প্রকৃতির অসীম রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উমা র রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। নিরাভরণা উমাকে দেখে মেনকা দুঃখ করাতে উমা তাঁকে যে-কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন তারই মধ্যে প্রকৃতির অসীম রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখা যায়। সঙ্গীতটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

নাই আভরণ এমন কথা, মুখে এনো না মা আর।
আমিই শুধু করতে পারি অলঙ্কারের অহঙ্কার ॥
এ জগৎ বটে মা আমার অলঙ্কার—সাজানো থাল,
প্রাতর্মধ্য—সায়ংকালে পরিয়ে দেন স্বয়ং কাল,
আবার নিশাকালে বদলে পরায়, তাতে-আঁধার দুইই দেখায়
বল মা ভবে কার বা আছে, এমন অলঙ্কার ॥
কে বলে মা, তোমার উমার আভরণের অপ্রতুল,
পরি আমি স্থির তড়িতের সুতায় গাঁথা তারার ফুল,
পরে থাকি বলে বলি, ইন্দ্রধনুর একাবলী
তাই বৈজয়ন্তী কি আর পরবে বৈজয়ন্তী হার ॥

* * *

বরাভয় মোর হাতের বলয়, সে তো সবার জানা কথা
আমি করুণার কঙ্কণ পরি মুক্তি-ফলের মুক্তা-গাঁথা,
মায়া-বস্ত্রে কায়া ঢাকি, সতত সঙ্গোপনে থাকি
নিতম্বে নিয়ত পরি সপ্তসিন্ধুর চন্দ্রহার ॥
আমি অষ্ট-সিদ্ধির নূপুর পরি তাতেই বেশী অনুরাগ
পুন্য গন্ধ স্বরূপিণী স্বয়ং শ্রী মোর অঙ্গরাগ,
ব্রহ্মা আমার অলক্তের জল, কেশব আমার চোখের কাজল
কালান্তক তাম্বুল আমি চর্বণ করি বারংবার।
গোবিন্দ দেখেছে মাগো, শুধালেই বলবে সেই ;
বাছা বাছা কালো মেঘের আমলাবাটা কেশে দেই ;
পোহালেই মা বিভাবরী, শিশু সূর্যের সিন্দুর পরি
চাঁদ বেটে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে থাকি অনিবার ॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

সাধক কবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার আলিপুর গ্রামে (মতান্তরে বর্ধমান জেলার মবায়কপুরে) জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর ছিলেন গৃহী সাধক। তাঁর সঙ্গীতে সংসারের দুঃখকাতর মায়াবদ্ধ জীবের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে :

তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল ?
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল।
দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছে বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসনা বড়ই প্রবল ॥
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্বনাশী জানিস কতই ছল ॥
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী ধরে খাই হলাহল।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৮৪২ খ্রীঃ হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে এবং তিনি কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন। কিছুকাল স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করে তিনি তপশ্চর্যায় ব্রতী হন। মহেন্দ্রনাথ 'প্রেমিক' ভণিতায় পদ রচনা করেন। প্রেমিকের পদে ভক্তি রসের নিবিড় পরিচয় পওয়া যায়।

তাঁর যে গানগুলি জন সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে তাদের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত গানটি অন্যতম :

ও মা কালী চিরকালিই সং সাজালি সংসারে।
এ সং-সাজায় নাইকো মজা, সাজা পাই যে অন্তরে ॥
ও মা কভু ভূতল অনিলে, কভু ব্যোম রসাতলে,
কভু বারিধি-সলিলে সাজাও নানা আকারে।
আমি ভ্রমিয়া অশেষ দেশ ধরিলাম অশেষ বেশ,
তবুও না হল শেষ—বলিহারি মা তোমারে।
প্রেমিক বলছে, আমার মন যে পাজি তাইতো প্রলোভনে মজি।
নইলে তোমার এ কারসাজি খাটিত কি বারে বারে।

রামলাল দাসদত্ত সাধককবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি বালিতে আবির্ভূত হন। দৈবাদেশে তিনি কাশী যাত্রা করেন এবং সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। রামলালের ভক্তি ও আন্তরিকতার নিবিড় পরিচয় নিহিত আছে। আকৃতি মূলক গান রচনায় তিনি সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যেমন—

রামলাল দাসদত্ত

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশানে করেছি হৃদি ;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি ॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ও মা চিতা-ভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস্ যদি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে মা পদ তলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি ॥

রাজা-মহারাজাদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় থেকে মীরজাফরের আমল পর্যন্ত তিনি জীবিত থেকে ধর্ম, সঙ্গীত, কাব্য, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে শক্তির উপাসক ছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

শাক্তসঙ্গীত রচনাতেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সুপ্রচলিত একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা—রজ্জুরূপিণী।
না সরে নিঃশ্বাস-পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
চমকিত কি কুহক, আজিত এ তিন লোক।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী ॥
বৈষ্ণব মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ মা বলে ডাকি জননী ॥

মহারাজ নন্দকুমার

বাংলা-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার (১৭০৫—১৭৭৫) একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ও শক্তির উপাসক ছিলেন। বীরভূমের অন্তর্গত ভদ্রপুর গ্রামে নন্দকুমার জন্মগ্রহণ করেন। কর্মব্যপদেশে তাঁকে অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদে কাটাতে হত। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে 'কিরীটেশ্বরী' দেবীর মন্দির সেকালে তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই দেবীর প্রতি মহারাজের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। শুনা যায়, মীরজাফরের মৃত্যুকালে নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত তাঁকে পান করিয়েছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর তাঁবেদারদের চক্রান্তে মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগে মহারাজ নন্দকুমার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ১৭৭৫ খ্রী: ৫ই আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়।

মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গীতে মাতৃপদে শরণ লওয়ার আকুতি চমৎকার ফুটে উঠেছে :

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়।
সব সুখ-সম্পদ, তোমার অভয় পদ,
কেন মন নাহি ডুবে তায় ॥
মতি চঞ্চল অতি দুরিত দুরাশয়,
বিষয়-বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে,
তব কৃপা-লেশ যদি হয়।

শাক্তসঙ্গীত রচনায় মহারাজগণের মত তাঁদের দেওয়ানরাও উৎসাহ দেখিয়ে গিয়েছেন। ইঁহাদের মধ্যে বর্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রের দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) ও ত্রিপুরা রাজ-স্টেটের দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর (১৭৮৫-১৮৫১) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রঘুনাথ রায়ের পদে তাঁর বৈরাগ্যবিধুর মনোভাবের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে :

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল, বল কি করি!
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা-নামের ভেলা ধরি॥

রামদুলাল নন্দী অনন্তরূপিণী মায়ের যথার্থ মূর্তি রচনা করেছেন :

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হওমা রাজী।
মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি॥

রামদুলালের কাছে শ্যামা মা যেমন বিচিত্ররূপিণী, তেমনি তিনি আবার ইচ্ছাময়ী। জগতে সবই তাঁরই ইচ্ছায় সংঘটিত হচ্ছে—এই দৃঢ় বিশ্বাস কবির অন্তরে ছিল। যাকে উদ্দেশ্য করে তাই তিনি বলেছেন,—

সকলি, তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে, 'করি আমি'॥

পঙ্গুরে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি ;
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব-পদ, কারে কর অধোগামী।
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি ;
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি।

কবিওয়ালাদের মধ্যে অনেকে শাক্তপদ রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে হরুঠাকুর (১৭৩৯-১৮১৩), রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮), নীলমণি পাটনী, এ্যাণ্টুনী ফিরিঙ্গীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টপ্পা'-গায়কদের মধ্যে রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) ও রূপচাঁদ পক্ষী শাক্তপদরচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাঁচালিকারদের মধ্যে দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭) ও রসিকচন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৯৩) শাক্তগান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে মদন মাস্টার উৎকৃষ্ট শাক্তসঙ্গীত রচনা করে যান। নাট্যকারদের মধ্যে মনোমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ), হরিশ্চন্দ্র মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) এবং আধুনিক কবিসাহিত্যিকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬), প্যারীমোহন কবিরত্ন, মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪), পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৫১-১৯০২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১২), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৭-১৯৪০), সাধক কবি ভুলুয়া বাবা (১৮৬২-১৯৪১) শাক্তসঙ্গীত রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বাউল-গান

বাংলায় বাউল ॥

বাউল হল বাংলাদেশের এক বিশেষ সাধক-সম্প্রদায়। ইঁহাদের রচিত গান বাউল-গান নামে প্রসিদ্ধ। সমাজ-সংসারের সর্বপ্রকারের বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের কড়াকড়ি নিয়মের বন্ধনমুক্ত হয়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বাউল-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। সর্বসংস্কারমুক্ত সহজজীবন লাভ করাই বাউল সাধনার চরম লক্ষ্য। সহজ হওয়ার জন্য তাঁরা সমাজের ধর্মের সকল রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছেন। ইঁহাদের জীবন অনেকটা তাই উন্মাদের ন্যায় অসামাজিক বলে ইঁহাদের বলা হয় বাউল। বাউলদের পাগল, অসামাজিক যাই বলা হোক না কেন, তাতে তাঁরা আদৌ বিরক্তি বোধ করেন না। বরং নিজেদের পাগল ঘৃণ্য বলে প্রচার করতে তাঁরা খুশিই হন। বাউল গানের ভণিতাতে তাই দেখা যায়, সাধকগণ অকারণে নিজেদের 'ওঁছা', 'বোঁচা', 'নচ্ছার', 'মেড়া', 'ভেড়া' প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে সবিশেষ করে পরিচয় দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় তাঁরা নিজেদের 'ক্ষ্যাপা', 'পাগলা' বলে প্রচার করেছেন।

বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ বলেছেন, বাউল শব্দটি 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে 'ল' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। বায়ু শব্দের অর্থ, যোগশাস্ত্রের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার। যে সম্প্রদায় দেহের স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার সঞ্চয় করে, তাঁরাই বাউল। কেউ 'বায়ু' শব্দের অর্থ 'শ্বাস-প্রশ্বাস' ধরে বলেছেন, যাঁরা শ্বাস-প্রশ্বাস সংরোধ করে দীর্ঘায়ু হওয়ার সাধনা করেন তাঁরা বাউল। কেউ বলেছেন, বাউল শব্দটি 'বাতুল' শব্দ থেকে এসেছে। বাতুল অর্থ—পাগল, উন্মাদ। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন,—"বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতি-পংক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্রভারমুক্ত মানবধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তপুরুষ, তাই সমাজের কোনো বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাঁহাদের ছাড়িবে কেন? তখন তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা

পাগল, আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও। পাগলের তো কোনো দায়িত্ব নাই।' বাউল অর্থ বায়ুগ্রস্ত, অর্থাৎ পাগল। আর তাঁহারা বলেন, 'মনে করিও যেন সামাজিক হিসাবে আমরা মরিয়াই গেছি।' মৃতের কাছে তো কোনো সামাজিক দাবি চলে না। তাই বাউলদের সাধনার আর এক অঙ্গ হইল জ্যান্তে মরা।" বাউল শব্দটি 'বাতুল' থেকে এসেছে—এই মতটি এখন সর্বজনার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাউলরা কোন শাস্ত্র-নিয়ম-বিগ্রহ মানেন না। জীবনের মূলীভূত সহজ সত্যকে লাভ করাই তাঁদের চরম লক্ষ্য। এবিষয়ে তাঁরা সদ্‌গুরুর উপর নির্ভর করে থাকেন। বাউলদের মধ্যে আবার অনেক গোষ্ঠী রয়েছে। ইঁহাদের মধ্যে 'দরবেশী', 'সাঁই', 'খুশিবিশ্বাসী' প্রভৃতি মতের সাধকগণ উল্লেখযোগ্য।

বাউল ধর্ম বেদবাহির্ভূত। বাউলগণ বেদের বিধানকে মেনে নেননি। বেদ-বিধি বলতে তাঁরা অনেকস্থলে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝেছেন। তাঁদের ধারণা, এই আনুষ্ঠানিক ধর্ম কখন প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না, মানবজীবনের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করতে পারে না। বাউল কবি লালন তাই বলেছেন,—

কার বা আমি কে বা আমার,
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার,
উদয় হয় না দিনমণি।

অন্য একটি গানে লালন বলেছেন,—

বেদে কি তার মর্ম জানে।
যেরূপ সাঁইর[১] লীলাখেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষতত্ত্ব ভজনের সার,
বেদ ছাড়া বৈরাগের মানে॥

বাউল ধর্মে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। সাধকগণ কোন শাস্ত্রবিধি মেনে চলেন

১। পরমাত্মা বা ভগবান।

না। জীবনের মূলীভূত সহজ সত্যকে লাভ করার জন্য তাঁরা গুরুর উপর নির্ভর করেন। গুরুর কৃপা ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোন গতি নেই। গুরুপদে শরণ লওয়ার গভীর আকুতি বাউলের গানে সুন্দর ফুটে উঠেছে। একটি গানে লালন বলছেন,—

গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার
লও গো সুপথে।
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধব কি মতে॥
* * *
যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন
যেমন বাজায় বাতে তেমন,
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে।

গোবিন্দ একটি গানে বলেছেন,—

আমার যায় না দুখের দিন, হয় না সুদিন,
আমি কিরূপে পাব শ্রীগুরুর চরণ।
হারায়ে গুরু-বস্তু-ধন
(আমার) দিনে দিনে দেহ-তরী
পাপেতে হতেছে ভারী,
ভবপারে যাইতে নারি,
কি করি এখন।
হল না রে মোর সাধন করা,
কি গুণে সাঁই দেবে ধরা,
হারাইয়াছি গুরুর বস্তু-ধন।

বাউল ধর্মে দেহ-গৌরবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানুষের দেহ হল ভাণ্ডস্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু বস্তু আছে তার সবই আছে এই দেহ-ভাণ্ডের মধ্যে। বাউল কবি লালন তাই বলেছেন,—

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ না রে মন ভেবে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস্ কেন হাঁপায়ে।

রাধাশ্যাম বলেছেন,—

আগে দেহের খবর জান গে রে মন,
তত্ত্ব না জেনে কি হয় সাধন।
দেহে সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল
চৌদ্দ ভুবন কর ভ্রমণ।
দেখ না খুঁজে, কোথায় বিরাজে
তোর পরমগুরু আত্মারাম।

নবদ্বীপ দাস বলেছেন,—

সচেতনের আপনি মূলাধার,
আমি কে, কে জানতে পারলে
পাবি রে নিস্তার।
এই ভাণ্ডের ভিতর কত ব্রহ্মাণ্ড,
খুঁজছিস্ অনাহুত জীবনভর।
এই চৌদ্দ পোয়া দেহেরি ভিতর।
স্থূল-সূক্ষ্ম জীব বহুতর,
ঘরের ভিতর করে আছে ঘর।

কালাচাঁদ পাগল বলেছেন,—

মানবদেহ কল্পভূমি
যত্ন করলে রত্ন ফলে।
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে
শুভযোগে চাষ করিলে।

মানবদেহস্থিত পরমতত্ত্ব বা আত্মাকে বাউল 'মনের মানুষ' বলেছেন। এই মনের মানুষকে জানাই বাউলের চরম লক্ষ্য। বাউল তাই গেয়েছেন,—

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

বাউলগুরু লালন বলেছেন,—

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।

জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায়
আলোকে বসে।

পাঞ্জ শাহ্ বলেছেন—

আজব কারখানা বোঝা সাধ্য কার
সাঁই করে লীলা ভবের পরে।
এই মনুষে রঙ্গে-রসে বিরাজ করে সাঁই আমার॥

* * *

পাঞ্জ বলে, মানবলীলা করেছেন সাঁই চমৎকার।
মানুষ ভজে, মানুষ ধর, মন, যাবি তুই ভব-পার।

স্বরূপ-সাধন বাউল ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রূপ বলতে বোঝায়, বস্তুর বাইরের আকার। রূপের অভ্যন্তরে বস্তুর যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে স্বরূপ বলা যেতে পারে। বাউলের সাধনা হল রূপ হতে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া, প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে পরিণত করে তার মধ্যে মনের মানুষকে নিবিড় করে জানা। রেজো খ্যাপা তাঁর গানে বলেছেন,—

ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন,
তবে করগে যা স্বরূপ সাধন।
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ
স্বরূপ দেহে হয় মিলন।
রূপের দেহে স্বরূপের স্থিতি,
স্বরূপেতে রসের মানুষ করেন বসতি,
রসের মানুষ ধরবি যদি
রাগের পথে কর গমন।

পাঞ্জ শাহ্ বলেছেন,—

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে
পাবি ওরে মন পাগলা।
যে ভাবে আল্লা তালা বিষমলীলা
ত্রিজগতে করছে খেলা॥

কত জন জপে মালা তুলসী-তলা,
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কতজন হরি বলি মারে তালি
নেচে গেয়ে হয় মাতেলা॥
কতজন হয় উদাসী, তীর্থবাসী,
মক্কাতে দিয়াছে মেলা।
কেউ মসজিদে বসে তার উদ্দেশে
সদায় করে আল্লা আল্লা॥
স্বরূপে মানুষ মিশে, স্বরূপ-দেশে
বোবায় কালায় নিত্যলীলা।
স্বরূপে ভাবনা জেনে চামর কিনে
হচ্ছে কত গাজীর চেলা॥

বাউল-গানের সাহিত্যিক মূল্য।

বাউল-গান বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভাষার সরলতা, ভাবের গভীরতা, সুরের দরদ ইহাকে সহনীয় মর্যাদা দান করেছেন। তত্ত্বপ্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও অপূর্ব প্রকাশশক্তির গুণে ইহা সাহিত্য হয়ে উঠেছে। ইহাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্যরস, তেমনি ভক্তিরস মিশেছে। সাঁইপন্থী বাউল লালন ফকিরের গানে ইহার পরিচয় পাওয়া যাবে :

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই।
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই।
চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলাম তারে,
চিনব তারে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে চিনতে যদি পাই।
সমঝে সবে সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পারো
লালন কয় নিজ মোকাম ঢোঁড়, সাঁই বহুদূরে নাই॥

তত্ত্বকথা স্পষ্টভাবে বলতে গিয়ে বাউল সাধকগণ অনেকসময় রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। রূপকচিত্রগুলি কবিকল্পনার দিব্যপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শীষমহল, মাছধরা, ধানভানা, নৌকা বাওয়া প্রভৃতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ চিত্রের সাহায্যে তাঁরা সাধনজীবনের রহস্যকথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন,

(১) শীষমহলের ছবি—

(আট) কুঠারি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
(তার) উপর আছে সদর কোঠা আয়না-মহল তার।
খাঁচার মাঝে অচিন পাখী ক্যামনে আসে যায় ৮

(২) নৌকা বাওয়ার ছবি—

(আরে) মন মাঝি, তোর বৈঠা নে রে
(আর) বাইতে পারলাম না।
(আমি) জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা,
(তরী) ভাইটায় বই আর উজায় না।
(ওরে) জাজি রসি[১] যতই কষি হাইলেতে জল মানে না।
(নায়ের) তলী খসা গুরা[২] ভাঙ্গা
(নাও) গাবগায়ানি[৩] মানে না।

(৩) মাছ ধরার ছবি—

(যদি হয়) ভাবুক জেলে
(ধর্ম মাছ) ধরতে পারে
(গুরু ভাব) ভক্তি-জালে।
(সদা সু-) সঙ্গে থাকে
(পড়ে না) মায়ার ফাঁকে
(চলে সে) ফাঁকে ফাঁকে
(গুরুর ঐ) কৃপা বলে॥

(৪) ধান-ভানার চিত্র—

(ওগো) সুখের ধান ভানা।
কর প্রেমের ভানা কুটা কষ্ট তোমার থাকবে না।

১। দড়াদড়ি; ২। গোড়া; ৩। জলরোধক প্রলেপ।

(তোমার) দেহ ঢেঁকশালে
(অনুরাগ) ঢেঁকি বসালে
(আবার) ভজন সাধন দুটো পাড়ুই দুদিকে দিলে
(ঢেকি) চলরে ও সে টলবে না।

বাউল গানে গভীরতম ঈশ্বরপ্রেমের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় পরিব্যক্ত হয়েছে :

ধন্য আমি বাঁশিতে তোর
আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাইরে কোন দুখ।
ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশি
আমি তোমার ফুঁক।
ভাল মন্দ রন্ধ্রে বাজি,
বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি
তোমার মনের সাধ।
একেবারেই ফুরাই যদি
কোন দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলেম বাজি
আর কি আমি চাই।

বাউল কবিকুল॥

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত বাউল গানের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসলেও বহুকাল পর্যন্ত ইহা ভদ্রজনসমাজে অপরিচিত ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ইহার প্রতি শিক্ষিত ভদ্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাউল গানের তিনি প্রথম সংগ্রাহক। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তিকালে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, মৌলবী মহম্মদ মনসুরউদ্দিন ও ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য বাউল গান সংগ্রহে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ডাঃ ভট্টাচার্যের সংকলন গ্রন্থখানিই সর্ববৃহৎ।

এপর্যন্ত বহু বাউল কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে লালন শাহ, পাঞ্জশাহ, পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, হাউড়ে গোসাঁই, রেজোখ্যাপা, রসীদ, গোসাঁই গোপাল, চণ্ডীদাস গোসাঁই, লালশশী, এরকান শাহ, অনন্ত বাউল, মদন বাউল, গঙ্গারাম বাউল, বিশা ভুঞিমালী, জগা কৈবর্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাউল গানের সবশ্রেষ্ঠ কবি লালন শাহ ১৭৭৪ খ্রীঃ কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন; পরে সিরাজ সাঁই নামক এক মুসলমান ফকিরের কাছে বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বসন্তরোগে লালনের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে লালনের ১৬০টি গান সংগৃহীত হয়েছে। লালন উচ্চ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন।

বাউল গান রচনায় পাঞ্জ শাহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাউল সাহিত্যে লালনের পরেই তাঁর স্থান। পাঞ্জ শাহ ১২৫৮ সালে যশোহর জেলার শৈলকুপা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি হেরাজতুল্লা খোন্দকারের নিকট বাউল ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

হাউড়ে গোসাঁই (মতিলাল সান্যাল) বর্ধমানের মেড়তলা গ্রামের উচ্চ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব—এই উভয় গুণেরই তিনি অধিকারী ছিলেন।

প্রেমিক কবি যাদুবিন্দু বর্ধমান জেলার পাঁচলোকি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রকৃত নাম যাদব ; ইন্দু বা বিন্দু হল তাঁর সাধন সন্দিনীর নাম। উভয়ের নাম একত্র মিলিত হয়ে যাদুবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

বাউল কবিদের মধ্যে কেউ একটা বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। গান রচনায় কোন একজন কবির প্রচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তাঁদের একতারাতে বাঙালীর সরল প্রাণের সহজ সুরটি বেজে উঠেছে, ইহার জন্য তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ মঙ্গলকাব্যের ধারা ॥

প্রথম অধ্যায় : মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ (ভারতচন্দ্রের কাল) পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে বাংলাদেশে দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজা-প্রচার ও ভক্তকাহিনী অবলম্বনে যে একশ্রেণীর বিশেষ ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য রচিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে তাহা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ—'কল্যাণ'। সুতরাং মঙ্গলকাব্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি,—যে কাব্য ভক্তিসহকারে পড়লে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে তাহাই মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যায়, সেখানে দেবতার স্তব-স্তুতি ও ভক্তবৎসল পূজারীর দেবানুগ্রহে আত্মিক ও জাগতিক ঐশ্বর্যলাভ মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। দেবতা এবং মানুষ উভয়েরই স্বার্থ জড়িত রয়েছে মঙ্গলকাব্যে। দেবতার মহিমা প্রচারের জন্য যেমন কাব্যগুলির সৃষ্টি, তেমনই বাস্তব জীবনকে বিপন্মুক্ত করার জন্য ভক্তের দেবমাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করানও ছিল কাব্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধু কল্যাণ অর্থেই 'মঙ্গল' শব্দটি গৃহীত হয়নি। কেহ বলেন, মঙ্গল অর্থ—'বিজয়'। যে কাব্যে দেবতার বিজয় কীর্তিত হয়েছে তাহাই মঙ্গলকাব্য। কেহ বলেন, এক মঙ্গলবারে কাব্যপাঠ আরম্ভ হয়ে অন্য মঙ্গলবারে শেষ হওয়ার জন্য মঙ্গলকাব্য নাম হয়েছে। আবার কেহ বলেন, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়,—যে গান মঙ্গল-সুরে গাওয়া হয়,—যে গান 'যাত্রা' বা মেলায় গাওয়া হয়, তাকেই মঙ্গল-কাব্য বলা হয়ে থাকে। মঙ্গলকাব্যের নামকরণ সম্পর্কে সমালোচকগণের ভিন্ন মতামত থাকা সত্ত্বেও, "যে কাব্য রচনা, পাঠ ও শ্রবণ করলে জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, তাহাই মঙ্গলকাব্য"—সংজ্ঞাটি খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা

মঙ্গলকাব্যের প্রবীণ ঐতিহাসিক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে—

'মঙ্গল' শব্দটি প্রথমে বিবাহ-অর্থে দ্রাবিড় ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে এবং ইহার ফলে প্রাচীন বাংলায় বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই মঙ্গলরাগ নামে অভিহিত করা হয় ;—পরে অর্থসংকোচের প্রভাবে ইহা দেব-দেবীর বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং অতঃপর বাংলায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক রচনা মাত্রই 'মঙ্গল' নামে পরিচিতি লাভ করে। দেব-মহিমা প্রচারক গীত এই অর্থে 'মঙ্গল' শব্দটি এদেশে সর্বপ্রথম কবি জয়দেব গোস্বামীর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কাব্যের একস্থলে কবি বলেছেন,—"শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি।" ইহা ছাড়া প্রখ্যাত চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে লীলাকাহিনী অর্থে 'মঙ্গল' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন,—

মঙ্গল নামের উৎপত্তি

'প্রভু কন গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে 'মঙ্গল' শব্দটি বিবাহাদি অনুষ্ঠানে গীত গান এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শিবদুর্গার বিবাহ-বর্ণন প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

'নানা মঙ্গল নাট গীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥'

'মঙ্গল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ডাঃ ভট্টাচার্যের অভিমতকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তামিল ভাষায় বিবাহ-অর্থে প্রযুক্ত 'মঙ্গলে'র সঙ্গে বাংলা মঙ্গলকাব্যের কোনো সম্পর্ক নেই। মঙ্গল শব্দের সঙ্গে বিবাহ-অর্থের চেয়ে কল্যাণ-অর্থের সাদৃশ্য বেশী। দেব-দেবীর কৃপাপ্রার্থী একশ্রেণীর বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য মধ্যযুগে যে সকল আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলি 'মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত হয়।

বৌদ্ধ ও অন্যান্য নিরীশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের সংঘাতের ফলে পুরাণের উদ্ভব ঘটে। মঙ্গলকাব্যে ইহার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পুরাণের ভিত্তি আখ্যানভাগ, মঙ্গলকাব্যের ভিত্তিও তাই। পুরাণের আখ্যানের মধ্যে কোনো বিশেষ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রচার যেমন প্রকট, মঙ্গলকাব্যেরও তেমনি এক বিশেষ দেবতার লীলামাহাত্ম্য-প্রচার প্রধান অবলম্বন। তবে এবিষয়ে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পুরাণের নায়ক দেবতা, তার আচরণ একান্তভাবে দৈবিক—মর্ত্যপরিচয় সেখানে অনুপস্থিত।

পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, তার আচার-আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে মর্ত্যের ধূলিমাটির ছাপ সুস্পষ্ট। পুরাণের দেবতাকে মঙ্গলকাব্যের দেবতার মতো দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্য দিয়ে—মানুষের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাকে জয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয় না।

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ঐহিক বাসনা-কামনা ও সুখ-শান্তি অনুসরণ করে বাংলার স্ত্রীসমাজে একপ্রকার ধর্মীয় অলৌকিক গল্প-কাহিনীর উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশে তা মেয়েলী ব্রতকথারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। মঙ্গলকাব্যের উপর এই ছড়াজাতীয় ব্রতকথার সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। অন্তঃপুরিকাগণ বিশেষ কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্রতকথা গান বা আবৃত্তি করে লৌকিক দেব-দেবীর নিকট কৃপা-অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন। আজও শিক্ষিত নারীসমাজে ইহার প্রচলন আছে। বাংলা মঙ্গলকাব্য ব্রতকথার সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে আশ্রয় করে বৃহত্তর সমাজ-মানসের বাহন বৃহৎ কাব্যের রূপ ধারণ করেছে। যেমন, মনসামঙ্গল কাব্য। ইহা বৃহত্তর কাব্যে পরিণতি লাভের পূর্বে—'এক সওদাগর ও তার সাত পুত্রবধূর কথা' নামে ব্রতকথারূপে বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। এমন কি ইহার সন্ধান উত্তর-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলেও পাওয়া গিয়েছে।

কাহিনী ছাড়া মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যেও ব্রতকথার প্রভাব রয়েছে। অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরাশ্রিতা নারী যেমন দেবানুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে নিজের অসহায় অবস্থার মধ্যে ঐহিক সুখ-শান্তি লাভের চেষ্টা করেছে, একদিন তুর্কী-আক্রান্ত আত্মবিস্মৃত দিশাহারা বাঙালী সমাজ তেমনি এক নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে একান্তভাবে দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে আত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল খুঁজে খুঁজে ফেরে। একারণে ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে।

সাদৃশ্য ছাড়া, ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে। দেবতার পূজার সময় মঙ্গলগানের অনুষ্ঠান না করলেও চলতে পারে, কিন্তু ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি না করলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না। মঙ্গলকাব্য পুরুষসমাজ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রচারিত; আর ব্রতকথা নারীসমাজ কর্তৃক সৃষ্ট ও প্রচারিত। মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্র বৃহত্তর সমাজ; ব্রতকথার

ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিজীবন। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি কোনো বিশেষ ব্যক্তিজীবনকে অনুসরণ করে সৃজিত যেমন, রাজা বীরসিংহ, রাজা চন্দ্রকেতু, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারি শীল ইত্যাদি); ব্রতকথার চরিত্রগুলির সেরূপ কোনো বিশেষ পরিচয় নেই। তাদের নির্বিশেষ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে মাত্র (যেমন, এক রাজা, এক সদাগর, এক বামুন ইত্যাদি)। ব্রতকথাগুলি ছড়ার মতো মৌখিক ধারা (oral tradition) রক্ষা করে চলেছে, মঙ্গলকাব্যগুলি লিখিত সাহিত্যের সদ্গতি লাভ করেছে।

ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কিছু কিছু অনৈক্য থাকলেও পল্লীর বাংলার এই ছোট ছোট ব্রতকথা সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের মতো বৃহৎ সাহিত্যের উদ্ভব ঘটায়। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত প্রণিধানযোগ্য —"পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লী-সাহিত্য, ফুল ধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলির মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।"

পাঁচালী শব্দের অর্থ গান। মধ্যযুগে আখ্যানমূলক পদ্যরচনাকে পাচালী বলা হত। এই অর্থে ব্রতকথার লিখিত পদ্যরূপকে বলা হয় পাঁচালী। ব্রতকথা যখন মৌখিক আবৃত্তি করা হয় তখন তার বাহন গদ্য; কিন্তু লেখ্যরূপ গ্রহণ করার সময় উহা পদ্যের ছন্দোবন্ধে বাঁধা পড়ে যায় তার কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল পদ্য।

পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্য

মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত তিনটি পাঁচালী সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ত্রিনাথের পাঁচালী বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। চরিত্রপরিকল্পনার দিক থেকে ব্রতকথার সঙ্গে পাচালীর তফাত এই যে, ব্রতকথার দেবতা প্রধানত স্ত্রী-জাতীয়া এবং

পাঁচালীর দেবতাদের সকলেই পুরুষ। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ, শনি, ত্রিনাথ (মীননাথ, গৌরাঙ্গনাথ ও জালন্ধরীনাথ) ইহারা সকলেই পুরুষ।

মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পাঁচালীর মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে। মুসলমান রাজশক্তির প্রকোপে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে মানুষ দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং তার প্রভাবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী কাব্য সৃষ্টি হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রায় চারশ বছর ধরে বাংলা আখ্যায়িকামূলক কাব্যরচনার যে ধারা প্রবর্তন করে, পাঁচালীগুলি সেই ধারারই একটি ক্ষুদ্র শাখা বিশেষ।

মঙ্গলকাব্যের পটভূমি ও বিষয়বস্তু

মুসলমান শাসনাধীন বাংলাদেশে হিন্দুসমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটে। মুসলমান ধর্মমতের সঙ্গে স্থানীয় লৌকিক ধর্মমতগুলির আদর্শগত বিরোধ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, অল্পকালের মধ্যে দুই সমাজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুসলমান রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপটে মুসলমান ধর্মমতের সম্মুখীন হওয়া তৎকালীন হিন্দুসমাজের পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কাজেই নিরুপায় হয়ে হিন্দুসমাজের আপামর জনসাধারণ তাদের ঐহিক জীবনের দুঃখদুর্দশার নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি দেবতার কল্পনা করে বসল। কি ব্যক্তিজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে যখনই সে কোনো দুঃখ-বিড়ম্বনা, অত্যাচার-নিপীড়ন ভোগ করেছে, তখনই তার মনে এই ভাব জেগেছে—সকলই দৈবেরই ইচ্ছা। এই অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের ফলে ক্রমে সমগ্র হিন্দুসমাজ করষোড়ে ভক্তিভরে দেবতার স্তুতিগান আরম্ভ করে দিল। দীর্ঘ তিন-চার শ' বছর ধরে চলল ইহারই একটানা গতানুগতিক ধারা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখ-ক্লেশকে ভাঙ্গাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ—কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না।"

বাংলাদেশ অনার্য-অধ্যুষিত এবং বাঙালী মিশ্র জাতি।

আর্য আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে কৃষিজীবী শ্রেণীর আদিম অধিবাসী বাস করত। চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধব্যবসায় ইত্যাদি ছিল তাদের বৃত্তি ও উপজীবিকা। আর্য আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তার সকল ক্রিয়াকর্ম, আচার-ধর্ম, বৃত্তি-উপজীবিকা পরিবর্তন করতে শুরু করল। আর্যসংস্কৃতিতে দীক্ষা গ্রহণ করে তারা পুরোপুরি আর্য হওয়ার চেষ্টায় রইল। ক্রমে আর্যের নিকট হতে স্মৃতি—মীমাংসা-দর্শন অনুশীলন করে এবং পুরোহিত-যাজকসম্প্রদায়ের চেষ্টায় বাঙালী আর্যভাবাপন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু পুরুষসমাজ এবং অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীসমাজ সহজে কুলাচার ও গার্হস্থ্য বৈশিষ্ট্য, ব্রত-উপাসনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে পারল না। তখন তারা নিজেদের লৌকিক দেবতার সহিত পৌরাণিক দেবতার মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন ধর্ম ও নতুন দেবতা সৃষ্টি করে আর্যসমাজে অনুপ্রবেশ করল। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা এই পর্বের সৃষ্ট নতুন দেবতা। পরবর্তিকালে এই দেবতারা সংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে আর্যমণ্ডপে স্থান পেয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের স্বভাবের নীচতা, রুক্ষতা, নির্মমতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, অকৃতজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা রয়েই গিয়েছিল।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের উদ্ভব-বৃত্তান্ত রহস্যজনক। আত্মবিশ্বাসহীন ধর্মভীরু অসহায় জাতি রাষ্ট্রশক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তির নিকট পর্যুদস্ত হয়ে পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। পারিবারিক জীবনে নানাবিধ দুর্গতি-অমঙ্গল বাধা-বিপত্তি, তার উপর নানা জীবজন্তুর উৎপাত—ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর এবং স্থলে-জলে সর্বত্রই সাপ। কেমন করে এইসব পার্থিব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে—এই চিন্তা-ভাবনাই বাঙালীর মনোলোকে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সমাধানও হলো খুব সহজে। তার বিশ্বাস জন্মাল—মনসা পূজা করলে সর্পাঘাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, চণ্ডীর উপাসনা করলে সমস্ত বিপদ-আপদ কেটে যাবে, দক্ষিণরায়-কালুরায়ের পূজা করলে বাঘ-কুমীরের কাছে প্রাণ হারাতে হবে না, ধর্মঠাকুরকে পূজা করলে বন্ধ্যার সন্তানলাভ ও কুষ্ঠরোগী-অন্ধের সদ্যোরোগমুক্তি ঘটবে। এমনি নিঃসহায় উপদ্রুত অবস্থায় সমাজের নিম্নবর্ণের নারী-পুরুষ সকলে ভয়ে-ভক্তিতে মনসার ভাসান গেয়েছে, চণ্ডীর মঙ্গলগান বেঁধেছে, রঞ্জাবতী-লাউসেনের অদ্ভুত কাহিনী শুনেছে।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু হলো দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্যকীর্তন ও মর্তে

তাঁদের পূজাপ্রচার। কাহিনীর প্রথমাংশে দেখা যায় দেব-দেবীগণ মর্তে নিজপূজা-প্রতিপত্তি প্রচারে উৎসুক হয়ে ছলে-বলে-কৌশলে স্বর্গের দেবকুমার বা নর্তকীকে অভিশাপ দিয়ে মর্তে পাঠালেন। কেহ ব্যাধের ঘরে, কেহ বণিকের ঘরে জন্মাল। তারপর তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দেব-দেবীর স্বপ্নাদেশে বা নির্দেশে পূজাপ্রচারে উদ্যোগী হলো।

দেব-দেবীগণ ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে কখনো বরদান করেছেন, আবার কখনো কখনো প্রতিবন্ধক অবস্থার মধ্যে পড়ে ভক্তের উপর নিদারুণ লাঞ্ছনা ও অত্যাচার চালিয়েছেন। ভক্তেরা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভক্তি-অবনত চিত্তে দেবতার পূজা প্রচার করেছে ততক্ষণ তাদের শাপমুক্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে নাই। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এভাবে মানুষের চরিত্রে তবু মহত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু দেবতার চরিত্রে সাধারণ মানবিক গুণের একান্ত অভাব। এজন্য মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীগণ বিদগ্ধসমাজের নিকট পরিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিভিন্ন দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য ও পূজাপ্রচার অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের মঙ্গলকাব্য রচিত হলেও মঙ্গলকাব্যগুলির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মূল কাহিনী আরম্ভ করার পূর্বে দেবদেবীর বন্দনাগান ও লীলাকাহিনীর উল্লেখ সকল মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়। প্রথমেই গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, তারপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীর তপস্যা, মদন ভস্ম, হরগৌরীর বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, দেব-দেবীর পূজাপ্রচার, স্বর্গচ্যুত দেবদেবীর স্বর্গলাভ—মঙ্গলকাব্যগুলির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

নায়িকার বারমাসী বর্ণনা মঙ্গলকাব্য তথা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রামায়ণ অনুবাদে সীতার বারমাসী, বৈষ্ণব কবিতায় রাধিকার বারমাসী, চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসী, মৈমনসিংহ গীতিকায় মহুয়া-মলুয়ার বারমাসীর পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিতে নায়িকার বারমাসের দুঃখবিরহ অতিশয় মর্মস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। ষড়ঋতুপরিবর্তনের পটভূমিকায় কবিগণ নিপুণভাবে এই দুঃখকথা বিস্তীর্ণ করে বর্ণনা করার দরুণ ইহা বাস্তবরসে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের বারমাসী এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাকপ্রণালীর বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। সুযোগ পেলেই কবিগণ কাব্যের মধ্যে রন্ধনকার্যের বিস্তৃত বর্ণনায় অবতারণা করেছেন। ইহাতে কাব্যরচয়িতার বাস্তবতার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু সাহিত্যগুণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পতিনিন্দার বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিবাহ-সভায় কিংবা অন্যত্র বিবাহিত নারীরা পতিদের অত্যন্ত কদর্য ভাষায় নিন্দা রটনা করেছে। এমন কি যে মনসামঙ্গল কাব্যে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে আধুনিক নরনারীর চক্ষুও অশ্রুসজল হয়ে উঠে, সেখানেও সাধারণ নারীগণ পতিনিন্দা রটিয়ে পতিব্রতাকে নির্লজ্জ ধিক্কারে পদদলিত করেছে।

বিবাহ-আচারের বিশদ বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বাংলার সমাজের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ইহার মধ্যে ধরা পড়েছে। বিবাহ সমাজগঠনের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ইহার সহিত ব্যক্তি ও সমাজজীবনের মঙ্গল-স্বার্থ সমভাবে জড়িত। একারণে মঙ্গলকাব্যে বিবাহের আচারাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বিশ্বকর্মার শিল্পকার্যের কলা-কৌশল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে নানাস্থানে বিবৃত হয়েছে। ইহাও একটি ইহার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির মধ্যে স্থাপত্যশিল্প, নগরনির্মাণকৌশল, নৌশিল্প ও চারুশিল্পের উল্লেখ্য নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু এগুলির বর্ণনার মধ্যে কবিদের শিল্পসৌন্দর্যবোধের আদৌ পরিচয় পাওয়া যায় না।

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আত্মপরিচয় এবং গ্রন্থোৎপত্তির কারণ উল্লেখ করার প্রতি একটা বিশেষ প্রবণতা প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের কবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আত্মপরিচয় অংশে পিতৃপক্ষ-মাতৃপক্ষের নাম-ধাম-বাসস্থান ইত্যাদির উল্লেখ থাকে এবং গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ অংশে—দেবতার স্বপ্নাদেশই যে কাব্যরচনার মুখ্য কারণ সেকথা কবি উল্লেখ করেন। কবিদের এই বিশেষ প্রবণতাকে মঙ্গলকাব্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণরূপে গণ্য করা যায়।

চৌতিশা স্তব মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিপন্ন অবস্থায় নায়ককে করযোড়ে ভক্তিভরে এই স্তব করতে দেখা যায়। ইহাতে ক্রমান্বয়ে ক—ক্ষ পর্যন্ত এই চৌত্রিশটা অক্ষর ব্যবহৃত হয় বলে

ইহাকে চৌত্রিশা বা চৌতিশা স্তব বলা হয়। যেমন, মুকুন্দরামের কালকেতু কর্তৃক চৌতিশা স্তুতির কিয়দংশ—

কালী কপালিনী কান্তা কপোলকুন্তলা।
কালরাত্রি কঞ্জমুখী কত জান কলা॥
কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ।
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস॥
খরতর রাজা বড় যেন খুর-ধার।
খড়্গ খর্পরধারী উর একবার॥

* * *

ক্ষেমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি।
ক্ষেমঙ্করী রক্ষ আমি কি বলিতে পারি॥
মহাবীর এত যদি কৈল স্তুতিবাণী।
কৈলাসে জানিল মাতা হরের ঘরণী॥

যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। মনসা-মঙ্গল কাব্য ছাড়া অন্যত্র এই বর্ণনারসন্ধান পাওয়া যায়। কোনো কোনো কাব্যে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও উহা একান্ত কৃত্রিম ও বৈচিত্র্যহীন।

দেবীর জরতী বা বৃদ্ধার বেশ ধারণ করে নায়ক-নায়িকার ছলনা বা রক্ষা করা, শ্মশানের বীভৎস বর্ণনা এবং কাব্যের উপসংহারে নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণ মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে মঙ্গল-কাব্য 'কোয়ান্টিটি'র দিক থেকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলেও, আদর্শ কাব্যসাহিত্যের 'কোয়ালিটি'র ভাগটি ইহার মধ্যে খুব কমই দেখা যায়।

মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যিক মূল্য

মঙ্গল কাব্যের কবিগণ স্বর্গ-মর্ত্যের বহু লীলা-কাহিনী কাব্যের মধ্যে সংযোজিত করেছেন কিন্তু সেগুলিকে সত্যসুন্দরের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেননি। কাহিনীবিন্যাস, পরিবেশসৃষ্টি, অলৌকিক লীলারহস্য, উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত মানুষের খেদোক্তি আরোপ করে মাঝে মাঝে তাঁরা পাঠকচিত্তকে বিস্ময়ে-কৌতুকে মণ্ডিত করে তুলেছেন। ভয়ে-ভক্তিতে শ্রদ্ধায়-করুণায় অমর্ত্য শ্লোকরাশিকে ভাগীরথীর পাবনীধারায় মুক্ত করে দিয়েছেন। তবুও যেন সাহিত্যরসপিপাসু মন মঙ্গলকাব্য পাঠে তৃপ্ত হয় না। ইহার

কারণ কি? প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলেছেন—সাহিত্য হৃদয়-সংবাদী। অর্থাৎ সাহিত্য এক হৃদয়ের সংবাদ অন্য হৃদয়ে বহন করে আনে। এক হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্যের বাণী অন্যের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে অনাবিল আনন্দে তাকে পূর্ণ করে তোলে। এই হৃদয়বাণী অন্যের কাছে যতখানি সত্যরূপে প্রতিভাত হয় ততখানি ইহা অন্যকে আনন্দদান করতে সমর্থ হয়। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা এরকম কোনো সত্যের সন্ধান পাই না, পঠনকালে তাই অধৈর্য ও অপরিতৃপ্তির ভাব জাগে।

কাহিনীর বিশালতা দেখে কেউ কেউ মঙ্গলকাব্যকে মহাকাব্য বলে ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে যদি কবিকল্পনার গভীরতার প্রকাশ না ঘটে তাহলে কেবল তা বিশাল অবয়বের জন্য মহাকাব্যের গৌরব লাভ করতে পারে না। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যে কবিকল্পনার দৈন্য সহজদৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সুন্দর রসিকতা করে সেকথা বলেছেন—"(মঙ্গলকাব্যের কবির) কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা-পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহার শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।" (গ্রাম্য সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ)।

বীররসই মহাকাব্যের প্রাণ। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ইহার সুর শোনা যায় না। ধর্মমঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে বটে কিন্তু সেখানে অসির ঝঞ্ঝনার সঙ্গে সঙ্গে বীররসের উদ্গম হয়নি। যুদ্ধবর্ণন নিতান্ত গতানুগতিক ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মহাকাব্যের ছন্দ, অলঙ্করণ ও বাক্-বিন্যাসের মধ্যে যে সমুদ্রের গুরু-গম্ভীর কল্লোলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। কাজেই মঙ্গলকাব্যকে মহাকাব্যের গৌরব দান করা যায় না। মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে ইহারা এক একটি বিশেষ দেব-দেবীর লীলামাহাত্ম্য কাহিনী অনুসরণ করে সৃষ্ট হয়েছে। এগুলিকে তাই নিঃসন্দেহে কাহিনীকাব্য আখ্যা দান করা যেতে পারে। যুগে যুগে অন্ধবিশ্বাসী ভক্তসমাজ এই কাহিনীরস আকণ্ঠ পান করে নিজেদের কৃতার্থ বলে মনে করেছে। বাঙালীর মুখে মুখে আজও ইহা রূপকথার গল্পের মতো প্রচলিত আছে।

মঙ্গল-কাব্যগুলিতে বাঙালী সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত না হলেও

শিক্ষা-দীক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান রাজশক্তির প্রকোপে সমাজ-জীবন একরকম স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। বিদ্যাশিক্ষা কতিপয় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। টোলে শিক্ষার কাজ চলত। ব্রাহ্মণই হতেন টোলের অধ্যাপক। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন বিশেষ ছিল না। দেশের মধ্যে বণিকসম্প্রদায়ের বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। পণ্যদ্রব্যের সম্ভার বহন করে তাঁরা সমুদ্র যাত্রা করতেন। সম্ভবত কড়ি দিয়ে বেচা-কেনার রীতি প্রচলিত ছিল।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বাংলার সমাজচিত্র

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধানে সেযুগের বাঙালীর সুরুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বাঙালীরা—

"একখানি কাচিয়া পিন্ধে, আর একখান মাথায় বান্ধে,
আর একখান দিল সর্বগায়।"

মেয়েরা পশ্চিমাদের মতো কাঁচুলি পরত, মেঘডম্বুর-আদি শাড়ী ব্যবহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। মেয়েদের হাতে শাঁখা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার এবং পুরুষদের হাতে বলয়, কানে সোনার কুণ্ডল পরার কথা জানা যায়। মেয়েদের মতো মাথায় লম্বা চুল রাখা তখনকার পুরুষদের পক্ষে ছিল গৌরবের। মনসামঙ্গলের কবি তাই বিবৃত করেছেন,—

"পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।
জ্ঞাতিগণ ধার নিল গাঙ্গুড়ির কূল॥"

নগরের বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাত্রার চিত্রও পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের কাব্যে,—

"নগরে নাগরজনা, কানে লম্বমান সোনা,
বদনে গুবাক হাতে পান।
চন্দনে চর্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু,
তসর রঙ্গন পরিধান॥

সমাজের মধ্যে খল-কপটচারী মানুষের শাস্তিবিধানের জন্য মস্তক মুণ্ডনের রীতি প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে তা উল্লিখিত আছে,—

"দড়ায়্যা হুকুম পায় নাপিতের সুত।
ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত॥

চামতা থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুরদুর॥"

চিরপ্রবঞ্চক স্বর্ণকারদের ছল-চাতুরীর কথা কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে অতীব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। কালকেতু দেবীপ্রদত্ত স্বর্ণ-অঙ্গুরীয়টি যখন মুরারি শীলের নিকট বিক্রয় করতে গিয়েছে তখন কপটচারী স্বর্ণকার নিঃসঙ্কোচে বলেছে,—

"সোণা-রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥"

বিয়েবাসরে মঙ্গলগানের রীতি সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দরিদ্র শিবকন্যা মনসার বিবাহ দিবার উদ্যোগ দেখে চণ্ডী যে কটূক্তি করেছেন তাতে এর পরিচয় পাওয়া যায়:—

"হাসি বলে চণ্ডী আই, "তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
আয়ো আসি মঙ্গল গাইতে তারা চাবে গুয়া খাইতে
আর চাবে তেল-পান-সিন্দুরে।"

সমাজের মধ্যে বহুবিবাহের বিষয়, সতীনের নির্যাতন, বশীকরণ-ঔষধ ইত্যাদির বিচিত্র বিবরণও মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্যের শ্রেণী

মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে মঙ্গল অভিধেয় বিবিধ প্রকারের কাব্যধারার উদ্ভব ঘটে। মোট তিন শ্রেণীর দেবতার লীলা-কাহিনী অনুসরণে মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়। যেমন,—(১) বৈষ্ণব—চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈত-মঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, রসিক-মঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল ইত্যাদি; (২) পৌরাণিক—গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি; (৩) লৌকিক—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কালিকামঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর), শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল। এই তিনশ্রেণীর মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে যথার্থ মঙ্গলকাব্য বলতে বোঝায় লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলিকে। মঙ্গলকাব্যগুলি মূল আর্যেতর ভাবধারার সঙ্গে পৌরাণিক সংস্কারের সমন্বয়ী আদর্শে রচিত হয়। লৌকিক-মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে এই সমন্বয় লক্ষ্য করা

যায়। তাই এগুলিকে যথার্থ মঙ্গলকাব্যের ধারার অনুবর্তী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়াঙ্গের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। সাধারণত ইহা চার অংশে বিভক্ত :—(১) বন্দনা, (২) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, (৩) দেবখণ্ড এবং (৪) নরখণ্ড। বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর মহীমা কীর্তন করা হয়। ইহার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতার বিকৃত রুচির ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়েরও উপাস্যদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। ইহাতে বোঝা যায় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব ঘটে থাকলেও, পরিণতিতে ইহা অসাম্প্রদায়িকতার উদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক বৈচিত্র্য

মঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বিবৃত হয়েছে। এখানে কবিগণ আত্মপরিচয় দান করেছেন এবং তাঁরা যে স্বপ্নাদেশে বা দৈবনির্দেশে কাব্য রচনা করেছেন সে-কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ইহাতে যেমন এই অংশ একদিকে পরবর্তিকালের ঐতিহাসিকদের কাছে কবি-পরিচিতি বিষয়ক মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়ক হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই কবিদের পক্ষে দেবতার দোহাই দিয়ে অলৌকিক গল্পকাহিনীর প্রতি সাধারণ ভক্তপাঠকের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে সুনিবিড় কৌতূহল উদ্রেকে বিশেষ কার্যকরী হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের তৃতীয় অংশ 'দেবখণ্ড'। পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সম্বন্ধ রচনাই এই অংশের সারকথা। এই সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতির তপস্যা, মদন ভস্ম, হরগৌরীর বিবাহ, হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, দেব-দেবীর পূজাপ্রচার ইত্যাদি দেবখণ্ডের লেখ্য বিষয়। এই অংশে শিবের প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয়। পুরাণ ও লোকসমাজের মধ্যে শিব ইতিপূর্বে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সেজন্য পৌরাণিক সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মিলনসেতু রচনার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবচরিত্র বিশেষভাবে কীর্তিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের চতুর্থ অংশে নরখণ্ড এবং আখ্যায়িকার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা-প্রচারের জন্য স্বর্গের কোন

কোন দেবতা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্তে নেমে এলেন, তাঁদের আবার মনুষ্যোচিত দুঃখ-দারিদ্র, লাঞ্ছনা-অবমাননা ভোগ করার পর কিভাবে পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটল সেকথা বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ইহার সহিত নায়িকার বারমাস্যা, পতিনিন্দা, চৌতিশা, রন্ধন-প্রণালী ইত্যাদি আখ্যায়িকা সংযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মনসা-মঙ্গল কাব্য

মনসা-মঙ্গল কাব্যের পটভূমি ॥

লৌকিক মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে মনসা-মঙ্গলই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কালক্রমে তাই ইহা পরবর্তিকালের সকল মঙ্গলকাব্য-গুলিকে প্রভাবিত করে। মনসা-মঙ্গলের মত আর কোন মঙ্গলকাব্য এত অধিক জনপ্রিয়তা ও সর্বব্যাপিনী শক্তির অধিকারী হতে পারেনি। জাতি, ধর্ম ও প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে ইহা বিহার হতে আসাম পর্যন্ত ভারতের এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে।

চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে মনসা-মঙ্গল কাব্য তার সাহিত্যিক রূপ নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তখনই পশ্চিম বাংলা থেকে কয়েকজন মনসা-মঙ্গলের কবি পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। ফলে অনুকূল অবস্থার সুযোগ লাভ করে মনসার কাহিনী পূর্ববঙ্গে, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে, আসামের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে এবং ক্রমে সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিস্তার লাভ করে। এভাবে বাঙালীর একটি নিবদ্ধ ধর্মবোধকে আশ্রয় করে এই কাহিনী জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বত্র প্রচারিত হয় এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই-যে, ইহা কোথায়ও পরিবর্তিত কিংবা আদর্শভ্রষ্ট হয়নি।

সর্পদেবতার পূজা-প্রচারের কাহিনীই মনসা-মঙ্গল কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কাজেই মনসা-মঙ্গলের স্বরূপ আস্বাদনের জন্য সর্পপূজার উৎপত্তি-রহস্য সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যে সর্পের উল্লেখ আছে। তবে তার অর্থ ইন্দ্র-শত্রু বৃত্রাসুর, কোন সরীসৃপ জীব নয়। যজুর্বেদের মধ্যে সর্প বলতে সরীসৃপ

সর্পপূজার উৎপত্তি

জীবকে বোঝান হয়েছে এবং ইহার প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়েছে। অথর্ববেদেই প্রথম সর্পকে অনিষ্টকারী জীব মনে করে তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি মন্ত্র রচিত হয় এবং আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে সর্বপ্রথম সর্পপূজার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহ্যসূত্রের মধ্যে সর্পপূজার যে রীতি ও বলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল অধুনা হিন্দুসমাজে তা নাগপঞ্চমী বলে গৃহীত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় আর্যরা যখন প্রথম ভারতে আসেন, তখন তাঁদের মধ্যে সর্পপূজার প্রচলন ছিল না। ভারতে কিছুকাল বসবাসের পর এদেশের প্রাগার্য জাতির কাছে সর্পপূজায় তাঁদের দীক্ষা হয়। বর্তমানে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে দ্রাবিড়-ভাষাভাষীদের মধ্যে সর্পপূজার সর্বাধিক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গে এর তুলনা চলতে পারে। এর থেকে অনুমান করা যায় দ্রাবিড়-ভাষাভাষীরাই ভারতে সর্বপ্রথম সর্পপূজার প্রচলন করেন এবং ইহাতে তাঁদের কাছে আর্যদের দীক্ষা।

মহাভারতের মধ্যে সর্পকুলের বিশদ পরিচয় আছে। সর্পকুল সেখানে নাগজাতিরূপে খ্যাত। নাগ কথাটি অবশ্য মহাভারতে প্রথমে এক বিশেষ জাতিহিসেবে উল্লিখিত হয়। পরে ইহারা সর্পপূজক ছিল বলে এবং সর্পের অভিজ্ঞান ধারণ করত বলেই ইহাদের উপর সর্পচরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয় এবং তারপর থেকে সর্পের সঙ্গে ইহাদিগকে অভিন্ন করেই দেখা হয়। এমনকি, সর্প মাটির নীচে গর্ত করে থাকে বলে ইহাদিগকে পাতালের অধিবাসী বলেও মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে। নাগগণ আর্যসম্ভূত। কশ্যপ মুনির ঔরসে কদ্রুর গর্ভে তাঁদের জন্ম। এই নাগজাতির অধিপতি হলেন বাসুকি। বাসুকির ভগিনীর নাম জরৎকারু। পরবর্তিকালে জরৎকারু বাংলাদেশে মনসাদেবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান।

অধুনা সমগ্র ভারতে সর্পপূজার তিনটি ধারা প্রচলিত আছে। উত্তর-মধ্য ভারতে নাগরাজ বাসুকির সরীসৃপ মূর্তি, দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্প এবং বাংলাদেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী-দেবতারূপে এক নারীমূর্তি পূজিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের এই স্ত্রী-দেবতাটির নাম মনসা। মনসা ছাড়া ইনি জাঙ্গুলী, বিষহরী ও পদ্মাবতী নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন। তবে জাঙ্গুলী নামটি বর্তমানে অচল।

মনসাপূজার প্রবর্তন

বাংলাদেশে সর্পদেবতা মাতৃরূপিণী। মনে হয়, ইহা কোন মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) অনার্যসমাজ হতে উদ্ভূত হয়েছে। কারণ, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কারগুলির মধ্যে নারীদেবতার পূজার্চনা অন্যতম। বাংলা দেশে আর্যপ্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়নি। কাজেই ইহার সাধারণ সমাজ যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, তা অক্ষুণ্ণই আছে। সেজন্য ইহার প্রধান দেবতারা—দুর্গা, কালী ইত্যাদি সবই স্ত্রীজাতীয়া। আর এই সংস্কারের অনুবর্তী হয়ে বাংলাদেশে সর্পদেবতা মনসাও হয়ে গেলেন স্ত্রীদেবতা।

মনসার উৎপত্তি

বাংলাদেশে সর্পদেবীর আবির্ভাব নতুন নহে। যেখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, সেখানে এই স্ত্রীদেবতা পূজার প্রথা প্রচলিত। বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে খাসি ও জয়ন্তী পর্বতের অধিবাসী খাসিয়া জাতির মধ্যে এক সর্পদেবীর পূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই সর্পদেবীর নাম থেলেন (Thelen)। আগে নরবলি দিয়ে ইহার পূজা করা হত। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে বিহারেও প্রাচীনকালে সর্পদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপ খননকার্যের ফলে সেখানে যে এক সর্পদেবীর মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটাই তার প্রমাণ। মন্দিরের মধ্যে কয়েকটি নারীরূপিণী নাগিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে, বাংলার উভয় প্রান্তের দেশগুলিতে যখন প্রাচীনকাল থেকে সর্পদেবীর পূজার সংস্কার প্রচলিত ছিল, তখন তাদের মধ্যবর্তী এই বাংলাদেশেও প্রাচীনকালে নিশ্চয়ই সর্পদেবীর পূজা করা হত। খাসিয়াদের মত বাঙালীরাও হয়ত একসময়ে সর্পদেবীর কাছে নরবলি দিত; অধুনা পশুবলি তারই স্থান অধিকার করেছে। পণ্ডিতদের মতে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের একটা বিশেষ সংস্কার হল দেবতার কাছে পশুবলি দেওয়া। তাই মনে হয় বাংলাদেশে হয়ত এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির বাস ছিল। কালক্রমে হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির গভীর প্রভাবে তার বাইরের রূপটা পাল্‌টেছে, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিটা প্রায় অক্ষুণ্ণই রয়ে গিয়েছে।

বাংলার মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যে সর্পদেবীর পূজা করা হত তাঁর নাম জানা যায়নি। তবে পরবর্তী যুগে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগে এক সর্পদেবীর উপাসনার কথা জানা গিয়েছে; তাঁর নাম জাঙ্গুলী। জাঙ্গুলী নামটি শুনে মনে হয়, এই দেবী কোন জঙ্গল বা অরণ্যের অধিবাসিনী, অরণ্যচারী কোন জাতি কর্তৃক পূজিতা। বৌদ্ধ তন্ত্রসূত্রগ্রন্থ

জাঙ্গুলী দেবী

'সাধনমালাতে' এই জাঙ্গুলীদেবীর পূজাপদ্ধতি ও তন্ত্রমন্ত্রের বিশদ পরিচয় উল্লিখিত আছে। মহাজ্ঞানী বৌদ্ধদের মতে, ভগবান বুদ্ধ তদীয় শিষ্য আনন্দকে এই দেবীপূজার গোপন মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। 'সাধনমালার' সাধনমন্ত্র হতে জানা যায়, জাঙ্গুলীদেবী সর্বশুক্লা চতুর্ভুজা (কোথায়ও দ্বিভুজা), শুক্লসর্পবিভূষিতা, বিস্তৃত সর্পফণাতলে আসীনা এবং তাঁর দুই হস্তে সর্প, এক হস্তে বীণা ও অপর হস্তে অভয় মুদ্রা। বুদ্ধদেবের সমকালে এই দেবীর পূজা বিশেষ বলবৎ ছিল।

পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালরাজত্বের অবসান এবং সেনরাজত্বের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয় এবং বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। ফলে, বৌদ্ধ-দেবদেবীগণ সমাজচ্যুত হয়ে নতুন নতুন নামে পরিচিত হতে থাকেন।

বিষহরী

বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলী তাঁর বিষনাশকারক গুণের উপরে ভিত্তি করে বিষহরী[১] নামে অভিহিত হলেন। বিষহরী শব্দটি অবশ্য ব্যাকরণসঙ্গত নহে। কারণ, সংস্কৃত 'বিষহর' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে 'বিষহরা' এবং 'বিষহারী' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে 'বিষহারিণী' হওয়াই বিধেয়। যাহোক, এই বিষহরীর সঙ্গে আবার বিষহারী শিবের একটা নিকট সম্বন্ধও গড়ে তোলা হল। বিষহরী হলেন শিবের কন্যা। জাঙ্গুলী নামটি লুপ্ত হলেও, বিষহরী নামটি বাংলা-বিহারে অদ্যাপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে।

বিষহরী নামটির সঙ্গে সঙ্গে অধুনা সর্পদেবীর আর একটি নাম—'মনসা' বিশেষ প্রচারলাভ করেছে। মনসা[২] নামটি, খুব সম্ভব পশ্চিম ভারত থেকে বাংলা-আসামে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বপাঞ্জাবে সর্পদেবতা মনসার দুটি মন্দির আছে—একটি আম্বালা জেলায় ও অপরটি গুরগাঁও জেলায়। উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বার সহরে মনসা পাহাড়ের উপর একটি

মনসা

মনসা-মন্দির আছে। মধ্যপ্রদেশের কোল জাতির মধ্যে 'মন্‌সা দেও' (Mansa deo) নামে এক পুরুষ গৃহদেবতার পূজা প্রচলিত আছে। বিহারের রাঁচি জেলায় দ্রাবিড়-ভাষী আদিম জাতি ওরাওঁ-দের মধ্যে সর্পদেবতা 'মনসা' নামটি শুনতে

পাদটীকা : ১। তুলনীয়—বিষমুখ দেখিয়া মায়ের নাম বিষহরী (বিজয়গুপ্ত)।
২। মনসা শব্দটি সংস্কৃত নহে, অনার্যভাষা-সম্ভূত।

পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া সিংহভূম, হাজারীবাগ, সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে মনসা নামটি বিশেষভাবে পরিচিত। কাজেই, অনুমান হয়, মনসা নামটি উত্তরপ্রদেশ-বিহার অঞ্চলে প্রথমে প্রচারিত হয় এবং তারপর ইহা বাংলা-আসামে প্রসারলাভ করে।

মনসা-পূজা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিক প্রচলিত। বিশেষ করে সাপুড়েদের সঙ্গে এই দেবীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; কারণ সাপখেলা দেখিয়ে জীবিকা অর্জন করাটাই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সাপুড়েরা সারা ভারতে সাঁপখেলা দেখিয়ে থাকে। এই খেলায় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তন্ত্রমন্ত্র ও সর্পৌষধ। প্রাচীনকাল থেকে আসামের কামাখ্যাতীর্থ যোগী ও গুণিন সম্প্রদায়ের নিকট এক পরম সিদ্ধপীঠ বলে বিবেচিত। এই সূত্রেই সাপুড়েরা পশ্চিমভারত থেকে বাংলা ঘুরে আসামে আসতে থাকে এবং ক্রমশ তাদের দ্বারা এই দুই প্রদেশে সর্পদেবতা মনসার নামটি ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করে।

মনসামঙ্গলের কাহিনী ॥

সর্পদেবতা মনসার পূজাপ্রচারের করুণ কাহিনী বর্ণনই মনসামঙ্গল-কাব্যের বিষয়। মনসা শিবের কন্যা, অযোনিসম্ভবা। পদ্মবনে জন্ম বলে তাঁর আর এক নাম পদ্মাবতী। পদ্মবন থেকে শিব মনসাকে কৈলাসে স্বগৃহে নিয়ে আসলেন। কিন্তু সৎ-মা চণ্ডীর সঙ্গে মনসার আর কিছুতেই বনিবনা হয় না। ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, পর্যন্ত ঘটে চলল। চণ্ডীর খোঁচায় একদিন মনসার একচোখ কানা হয়ে গেল। জগদ্গৌরী মনসা হলেন কানি মনসা। শিব মনসাকে জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিয়ে দিলেন। একটি পুত্র (আস্তীক) জন্মানর পর মুনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে চণ্ডীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে পিতৃগৃহও মনসার কাছে অসহ্য বোধ হল। শেষে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে মনসা বনবাসে (জয়ন্তীনগরে) গেলেন। মনসার দুঃখে শিবেরও বৈক্লব্য উপস্থিত হল। তিনি কিছুতেই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। 'নেত্রের জলেতে তখন জন্মিলেক নেতা'। শিব নেতাকে বললেন,—'মনসার প্রিয়পাত্র হইয়া থাক তুমি'। এরপর তিনি মনসাকেও বললেন,—

চাঁদ সওদাগরের কাহিনী

'বুদ্ধিতে প্রবীণ নেতা মোর নেত্রে জন্ম।
তাহারে জিজ্ঞাসি তুমি কৈর সব কর্ম ॥'

মনসা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে জয়ন্তীনগরে এক পুরী নির্মাণ করলেন এবং তারপর

'জয়ন্তীর রাণী হইলেন বিষহরী।
বামেতে বসিল নেতা রজক-কুমারী ॥'

মনসা এবার নেতাকে নিয়ে মর্তে নিজের পূজা প্রচারে উদ্যোগী হলেন।

চাঁদসদাগর একজন শিবের বড় ভক্ত। একদিন তিনি স্বর্গে শিবের পূজার ফুল তুলতে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই বনে মনসা নাগাভরণ-ভূষিতা হয়ে ছিলেন। চাঁদের সাড়া পেয়ে নাগগণ সব ভয়ে পালিয়ে গেল। মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে তখন চাঁদকে অভিশাপ দিলেন, তাঁকে মর্তে গিয়ে জন্মাতে হবে। চাঁদও মনসাকে মনে করিয়ে দিলেন, তিনি না পূজা করলে মর্তলোকে মনসার পূজাও প্রচারিত হবে না।

চাঁদ মর্তে গিয়ে গাঙ্গুর নদীর তীরে চম্পাই গ্রামে বিজয়সাধুর পুত্ররূপে জন্মালেন। পূর্বজন্মের মত তিনি পরম শৈব হয়েই রইলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী সনকাকে মনসাপূজা করতে দেখে তিনি খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং পদাঘাতে মনসাঘট ভেঙ্গে দিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণা মনসা চাঁদের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। মনসার কোপে চাঁদের নন্দনকাননসম গুয়াবাড়ী ধ্বংস হয়ে গেল, রাজ্যের নরনারী সর্পদংশনে প্রাণ হারাতে লাগল। চাঁদ 'মহাজ্ঞান' দ্বারা গুয়াবাড়ীকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু, নেতার শিষ্য, শঙ্কর গারড়ীকে দিয়ে মৃতব্যক্তিদের জীবনদান করলেন। মনসার সকল অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

মনসা কৌশলে শঙ্কর গারড়ীকে বধ করলেন। চাঁদের যেন দক্ষিণ হস্ত খসে পড়ল। কানি মনসা তার উপর আবার ছলনা করে চাঁদের মহাজ্ঞানও হরণ করে নিলেন। তবুও মনসার হিংসানল নির্বাপিত হল না। এরপর তিনি বিষান্ন খাইয়ে চাঁদের ছয় ছয়টি শিশুপুত্রের প্রাণ হরণ করে নিলেন। মনে করলেন বুঝি এবার চাঁদ তাঁর বশে এলেন। অনেক আশা-ভরসা করে মনসা চাঁদের পূজা-ভীক্ষা করলেন; আশ্বাস দিলেন, চাঁদ আবার তাঁর পুত্রদের ফিরে পাবেন, মহাজ্ঞানও লাভ করবেন। কিন্তু চাঁদ ত আর ননীর পুতুল নন যে দুঃখ-শোক-তাপে

সহজেই গলে যাবেন। বরং ফল হল ঠিক তার উল্টো। পূজা করা চুলোয় থাক্, তিনি হেঁতালের লাঠির ঘায়ে কানি মনসার কাঁকাল ভেঙ্গে দিলেন। সনকা স্বামীর পায়ে পড়ে মনসার পূজা দিয়ে পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক মিনতি করল। চাঁদের মন তবুও টলল না; তিনি কোনমতে সান্ত্বনা দিয়ে সনকাকে বিদায় করে দিলেন।

সনকা ঝালুমালুর বাড়ীতে গিয়ে গোপনে মনসা-পূজা করলেন। মনসা সন্তুষ্ট হয়ে সনকাকে পুত্রবর দিলেন। আবার সনকাকে বলেও দিলেন যে চাঁদ যদি মনসাকে পূজা না করেন তাহলে বিবাহের রাত্রিতে সর্পদংশনে পুত্রের মৃত্যু হবে। পুত্রলাভের বুকভরা আশা নিয়ে সনকা গৃহে ফিরে এলেন।

চাঁদ এবার চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্য-যাত্রার উদ্যোগ করলেন, যাত্রাকালে তিনি শিবপূজা করলেন। মনসা এসে চাঁদের কাছে আবার পূজা প্রার্থনা করলেন। চাঁদ আবার মনসাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিলেন। ফলে, মনসার কোপে চাঁদের সব বাণিজ্যতরী জলে ডুবে গেল। অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে ভিক্ষুকের বেশে চাঁদ কোনক্রমে দেশে ফিরলেন।

চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর তখন যৌবনে পদার্পণ করেছে। পুত্রের চাঁদমুখ দেখে চাঁদ সব দুঃখ ভুলে গেলেন। উজানী নগরে সায়বেনের কন্যা লক্ষ্মীরূপা বেহুলার সঙ্গে চাঁদ লখীন্দরের বিয়ে দিলেন। কিন্তু চাঁদের পোড়া কপাল। লোহার বাসরঘরে সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু হল।

প্রথানুসারে লখীন্দরের মৃতদেহ নদীর জলে ভেলাতে করে ভাসিয়ে দেওয়া স্থির হল। বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে মৃতস্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে আত্মিয়-পরিজনবর্গের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ভেলায় ভেসে চলল। নদীর ঘাটে ঘাটে নিত্য-নতুন বিপদ দেখা দিতে থাকল। মনসার আদেশে নেতা কখন ব্যাঘ্ররূপে, কখন চিল পক্ষীরূপে লখীন্দরের শব নিঃশেষ করে ফেলার চেষ্টা করলেন। বেহুলা আত্মাহুতি দিয়ে তীক্ষ্ণ ধীশক্তির সাহায্যে এসব বিপদ থেকে উদ্ধারলাভ করল।

ভেলা ভাসতে ভাসতে শেষে নেতার ঘাটে এসে ঠেকল। নেতা স্বর্গের ধোপানী। বেহুলা দেখল, নেতা কাপড় কাচতে কাচতে তার দুরন্ত ছেলেটিকে

আছাড় দিয়ে মেরে রাখলেন; তারপর যাবার সময় আবার মন্ত্র দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলে ঘরে গেলেন। বেহুলা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে নেতার জীবনদান করার ক্ষমতা আছে।

পরের দিন নেতা ঘাটে আসলে বেহুলা তার পায়ে পড়ে স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে চাইল। তখন নেতা বেহুলাকে আশ্বাস দিল, বেহুলা নৃত্য-গীতে স্বর্গের দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তাঁদের কথায় মনসা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন। নেতার কথামত, স্বামীর অস্থি কয়খানা কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেহুলা স্বর্গে চলল। সেখানে নৃত্য-গীতে বেহুলা দেবতাদের খুশি করল। শিব মনসাকে লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে বললেন। মনসা বেহুলাকে বললেন যে তার শ্বশুর যদি মনসাকে পূজা দেন তাহলে তিনি তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন। বেহুলা তাতে রাজী হল। বেহুলা স্বামীর সঙ্গে ছয় ভাসুরের প্রাণও ভিক্ষা করে নিল এবং শ্বশুরের নিমগ্ন বাণিজ্য-তরীগুলিও মনসাকে ফিরিয়ে দিতে বলল। মনসা চাঁদের পূজা পাওয়ার আশায় এতেও সম্মতি দিলেন।

সাতপুত্র, চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরে পেয়েও চাঁদ প্রথমে কিছুতেই মনসার পূজা করতে সম্মত হলেন না। মনের একগুঁয়ে ভাব—'কণ্ঠে প্রাণী থাকিতে না পূজিব লঘু কাণী' তখনও কাটেনি। বেহুলা কেঁদে-কেটে শ্বশুরের পায়ে পড়ে কোনক্রমে তাঁকে মনসা-পূজা করতে রাজী করাল। চাঁদ অবশেষে পিছন ফিরে বাম হাতে মনসাকে পূজা করলেন। এতেই মনসা খুশি হয়ে চাঁদের সব হারাধন ফিরিয়ে দিলেন। মর্তে মনসার পূজা প্রচারিত হল।

মনসা-মঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনীটি দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। একটি শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী ও অপরটি চাঁদসওদাগরের কাহিনী।

শঙ্কর গারড়ীর কাহিনী

শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীটিই প্রাচীনতর। কিন্তু পরবর্তিকালে চাঁদসওদাগরের কাহিনীটি অধিক জনপ্রিয় হয়ে যাওয়ায় শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীটি ক্ষীণতর হয়ে উহার সহিত মিশে এক হয়ে যায়। মিশ্রণের পরে নেতা মনসার সহচরী এবং শঙ্কর চাঁদের সহচরে পরিণত হন।

মনসা-মঙ্গল কাব্যে শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর যে আভাস পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে শঙ্কর ছিলেন একজন বিষহর বৈদ্য। বাল্যাবধি নেতাকে পূজা করে তিনি নেতার কাছ থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন। নেতা তাঁকে বর দিলেন যে তিনি অজয় অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন। নির্জন সমুদ্রসৈকতে

গিয়ে নেতা শঙ্করকে এক হাঁড়িতে করে কিছু চাল ও একটি জীবন্ত সাপ সিদ্ধ করে খেতে দিলেন এবং তাঁকে সাবধান করে দিলেন, যদি একটি ভাতও পড়ে থাকে তাহলে তাঁর বর সম্পূর্ণ সফল হবে না। কিন্তু কিভাবে পাত্রের নীচে একটি ভাত পড়ে রইল। নেতা শঙ্করকে সেকথা গোপনে জানিয়ে দিলেন।

মহাজ্ঞান লাভের পর শঙ্কর সর্পকুলের বৈরী হলেন। কিন্তু তাঁর পতন ঘটতে বেশী দেরী হল না। একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে শঙ্কর স্ত্রীর কাছে নিজের মৃত্যুর উপায়টি প্রকাশ করে ফেললেন। আড়াল থেকে সর্পদেবী মনসা তা শুনে নিলেন এবং ঐ উপায় অবলম্বন করে তিনি শঙ্করের প্রাণসংহার করলেন।

মনসামঙ্গলের কবিকুল ॥

মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে হরিদত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, দ্বিজবংশীদাস, কালিদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল; ষষ্ঠীবর দত্ত, রামজীবন, জীবনমৈত্র, বিষ্ণুপাল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মনসামঙ্গলের আদি কবি হলেন কানা হরিদত্ত। তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। সম্ভবত, ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে কিংবা চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। তবে তাঁর লেখা কোন পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে হরিদত্তের ভণিতায় দু-একটি পদ পাওয়া গিয়েছে।

কানা হরিদত্ত

মনসামঙ্গলের কোন কোন কবির কাব্যে হরিদত্তের নাম উল্লিখিত আছে। এছাড়া হরিদত্তের রচনার আর কোন নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। একারণে হরিদত্তের কাব্যপ্রতিভা বা তাঁর রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। মনসামঙ্গলের একজন বিখ্যাত কবি বিজয়গুপ্তের পুঁথির 'স্বপ্নাধ্যায়' নামক পালায় (বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৮ সাল) কানা হরিদত্তের নাম অশ্রদ্ধাভরে উল্লিখিত হয়েছে :

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের গীত যত লুপ্ত পাইল কালে।
যোড়াগাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥

কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥

বিজয়গুপ্তের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে,—কানা হরিদত্ত প্রথমে মনসার গীত রচনা করেন; কিন্তু দেবীমাহাত্ম্য সম্পর্কে তিনি সম্যক্ অবহিত ছিলেন না বলে, তাঁর কাব্যে মিত্রাক্ষর ছন্দের কলাকুশলতার যথেষ্ট অভাব থাকায় এবং কাহিনীরচনার অসঙ্গতি ও মাধুর্যহীনতার জন্য তাঁর কাব্য কালক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়।

বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্তের কবিকর্ম সম্পর্কে যে কটূক্তি করেছেন, তা সত্য বলে মনে হয় না। যে সামান্যতম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে হরিদত্তের ভণিতায়, সন্দেহ নিরসনের পক্ষে তা অনেকটা সহায়ক:

ওলা শুনি আস্তের কাহিনী।
মুই হেন সেবকে শরণ লইলাম গো
ঘটে লামি লও ফুলপানী॥
*　　*　　*
চারি চতুর্বেদ পড়ে নিশি জাগরণ করে
পূজা হৈলে ছাগ বলিদান।
কবি কহে হরিদত্ত যে জানে পরম তত্ত্ব
মনসা দেখিল বিদ্যমান॥

—(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯১ পুঁথি)।

তারপর, সর্পসজ্জার বর্ণনা—

বিচিত্র নাগে করে দেবী গলায় সূতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি॥
*　　*　　*
দুই হস্তের সঙ্খ হইল গ্রবল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগ শোভে সুন্দর কিঙ্কিণী॥
*　　*　　*

অমৃত নঞান এড়ি দেবী বিষ নঞানে চায়।
চন্দ্র-সূর্য গিয়া তবে আন্তেতে লুকায় ॥
দর্পণ হাতে করি দেবী বেশ বানায়।
মনসার চরণে লাচাড়ী হরিদত্ত গায় ॥

—(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা প্রাচীন পুঁথি-সংখ্যা কে ২৩৪)।

কবি বিজয়গুপ্ত হরিদত্ত সম্পর্কে কটূক্তি করলেও তাঁর পরবর্তিকালের কবি পুরুষোত্তম হরিদত্তের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন :

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ লাচারীর ছন্দ
কবি পুরুষোত্তম গায় ॥

দাস হরিদত্ত নামক একজন কবির রচিত 'কালিকা-পুরাণে'র তিনখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। ইহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর 'সপ্তশতী'র বাংলা অনুবাদ। কাব্যমধ্যে কবির বৈষ্ণবধর্মপ্রাণতার বিশেষ পরিচয় বিদ্যমান :

যে শুনে তারকবধ কার্ত্তিক নিধন।
তারে পূর্ণ কৃপা হরি করে অনুক্ষণ ॥
মৎস্য কূর্ম বরাহ নরহরি বামন।
পঞ্চ অবতার সত্যে করিলা নারায়ণ ॥

পুরুষোত্তমও কানা হরিদত্তকে 'হরির কিঙ্কর' বলেছেন। তাই কানা হরিদত্ত এবং 'কালিকা-পুরাণে'র দাস হরিদত্তকে একই কবি বলে মনে হয়।

নারায়ণদেব মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এবং বিশেষ করে মনসামঙ্গল-কাব্যের একজন শক্তিশালী কবি। কবির বাস ছিল মৈমনসিংহ জেলার বোরগ্রামে। তাঁর আবির্ভাব কাল সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

নারায়ণ দেব

তবে অনুমান হয়, তিনি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার প্রথম কারণ, নারায়ণদেবের কাব্য বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে আসাম পর্যন্ত ব্যাপক প্রচার ও জনখ্যাতি অর্জন করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের পূর্বেই আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সুর্মা উপত্যকায় ইহার প্রভাব এত গভীর হয়েছিল যে, ইহা অচিরকালের মধ্যে মধ্যযুগীয় অসমীয়া ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে নারায়ণদেবও অসমীয়া ভাষার আদিকবিরূপে সাদরে গৃহীত হন। বিজাতীয়ের

কাছে এত বড় সম্মানলাভ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন কবির ভাগ্যে ঘটেনি।

দ্বিতীয়ত, নারায়ণদেবের বংশধরদের গৃহ থেকে তাঁর একটি পুঁথি ও বংশতালিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। বংশতালিকায় দেখা যায় বর্তমান কাল পর্যন্ত কবির অষ্টাদশ পুরুষ চলছে। চার পুরুষে যদি এক শতক ধরা যায় তাহলে কবির আবির্ভাবকাল এখন থেকে সাড়ে চারশ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

নারায়ণদেবকে নিয়ে অসমীয়া ও বাঙালীদের মধ্যে একদা তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। উভয় পক্ষই নারায়ণদেবকে নিজ নিজ ভাষার কবি বলে দাবি জানান। এখনও যে ইহার একটা মীমাংসা হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। উভয় ভাষাতেই নানান যুক্তি-তথ্য অনুসৃত হয়ে নারায়ণদেবের পুঁথি ছাপা হচ্ছে। আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মঙ্গলদৈ প্রভৃতি জেলায় নারায়ণদেবের বাসস্থান সম্পর্কে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কবিকে শ্রীহট্টের অধিবাসী বলেও অসমীয়াগণ দাবি করেন। কবি আত্মজীবনীতে নিজেকে যে বোরগ্রামের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন, সেই বোরগ্রাম শ্রীহট্টের অন্তর্গত বলে অসমীয়াগণ মনে করেন। কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,—

পূর্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি ॥

কিন্তু রাঢ়দেশ ত্যাগ করে নারায়ণদেব যে পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলার বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কবির পূর্বপুরুষগণ বোরগ্রামে বসবাস করতেন এবং ঐ গ্রামে 'নারায়ণের ভিটা' নামক কবির বাসস্থানের একটা নির্দিষ্ট স্থানও ছিল। কাজেই নারায়ণদেবের উপর অসমীয়াগণের দাবি মেনে নেওয়া যায় না। বোরগ্রাম মৈমনসিংহ জেলার একান্তে অবস্থিত। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ইহার রাজনৈতিক যোগ থাকলেও শ্রীহট্টের সঙ্গে ইহার ভৌগোলিক যোগ ছিল। এজন্য নারায়ণদেবের কাব্য আসামে এত সহজে প্রসারলাভ করেছিল।

কারো কারো মতে, 'সুকবি-বল্লভ' ছিল নারায়ণদেবের উপাধি। নারায়ণদেবের একখানি মুদ্রিত পদ্মাপুরাণে কবি নিজের কবি-খ্যাতির উল্লেখ করে বলেছেন,—'সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্বগুণযুত'। নারায়ণদেবের 'সুকবি-বল্লভ' খ্যাতি-রচয়িতাদের নির্ভর হল এই ভণিতাটি। কিন্তু এই ভণিতাটি অন্য

কোন পুঁথির মধ্যে পাওয়া যায় না; সেকারণে ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। আরো মনে হয়, বল্লভ একজন স্বতন্ত্র কবি কিংবা গায়েন। তিনি নিজের নাম নারায়ণদেবের ভণিতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। যেমন, -'নারায়ণদেবে কয়, সুকবি বল্লভ হয়'। আবার অন্য কবির ভণিতার সঙ্গেও বল্লভ নিজনাম যুক্ত করে দিয়েছেন। যেমন,—'কমল নয়ন কয়, সুকবি বল্লভ হয়'; অথবা 'রামনিধি দেব কয়, সুকবি বল্লভ হয়'। অতএব, বোঝা যাচ্ছে 'সুকবি-বল্লভ' নারায়ণদেবের উপাধি ছিল না; বল্লভ নামে একজন স্বতন্ত্র কবি ছিলেন। সেকারণে, নারায়ণদেবের ভণিতা সবত্র প্রায়—'সুকবি নারায়ণ-দেবের সরস পাঁচালী' এই রূপেই পাওয়া যায়। আর, অসমীয়া ভাষায় সেজন্য তিনি সুকবি নারায়ণ বা শুকনান্নি বা হুকনান্নি নামে পরিচিত।

মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিদের তুলনায় নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ' আকারে-প্রকারে বৃহৎ। গ্রন্থটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের বিষয় কবির আত্মপরিচয়, দেব-বন্দনা ইত্যাদি; দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়—পৌরাণিক আখ্যান-সমূহ এবং তৃতীয় খণ্ডের বিষয়—চাঁদ সওদাগরের কাহিনী। সংস্কৃত কাব্য পুরাণে কবির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকায়, কাব্যমধ্যে পৌরাণিক আখ্যানভাগ আধিপত্য বিস্তার করে। মহাভারত, শৈবপুরাণ ও কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য এই পৌরাণিক আখ্যানভাগের ভিত্তিভূমি। নীরস পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরস কবিত্বের মণিকাঞ্চন যোগ নারায়ণদেবের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য তাঁর কাব্য কেবল পৌরাণিক কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডার বলে নয়, কাব্যরসের আধাররূপেও ভক্ত-পাঠকসমাজে সুবিদিত।

মনসামঙ্গল কাব্য করুণরসের আস্পদ। কবি নারায়ণদেব করুণরস সৃষ্টিতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লোহার বাসরঘরে লখীন্দরের বিলাপোক্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়:

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥

* * *

কত খণ্ড পাপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সেকারণে তোমা ছাড়ি যায় লখিন্দর॥

অথবা, বেহুলা মৃতস্বামীসহ কলার ভেলায় অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে

যে বিলাপোক্তি করেছে, তা করুণরস সৃষ্টির উৎকৃষ্ট নিদর্শন এবং তা সর্বকালের পাঠকচিত্তকে বিহ্বল করে দেয়।

জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে।
ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে ॥
প্রভুরে তুমি আমি দুইজন।
জানে তবে সর্বজন ॥
তুমি যে আমার প্রভু আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার ॥

ব্যঙ্গরচনায়ও নারায়ণদেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ডোমিনী-বেশিনী চণ্ডীর প্রতি শিবের কামাসক্তিকে নিয়ে দেবীর নিদারুণভাবে ব্যঙ্গ বেশ

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকাবেল ॥
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকী মাত্র সার।
তোমার মুখে চাহ আমাক বল করিবার ॥

নারায়ণদেবের সৃজনীশক্তির উল্লেখ্য নিদর্শন হল চাঁদ-চরিত্রটি। সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ইহা যেমন একক ও অনন্যসাধারণ, তেমনি নারায়ণ-দেবের কাব্যে ইহা আপন মহিমায় দীপ্ত-সমুজ্জল, আপন কর্তব্য ও আদর্শ পালনে অটল-অচল, শিল্পকার্যের অন্যত্রদুর্লভ কলানৈপুণ্যে প্রভাস্বর ও অপরাজেয়। অভ্রভেদী পর্বতশীর্ষ যেমন শত-সহস্র অশনিসম্পাত নির্বিবাদে সহ্য করে, নিদারুণভাবে বাত্যাহত হয়েও স্থৈর্য ধারণ করে থাকে, তথাপি শির কখনও নত করে না, সেইরূপ চাঁদও কানি-মনসার কাছে অশেষ দুর্গতি, লাঞ্ছনা-অবমাননা ও শতদুঃখজটে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েও ভুলক্রমে বারেকের তরে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করেননি। চাঁদ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব ইহাই। সাত সাতটি পুত্র প্রাণ হারাল, বাণিজ্যতরী মগ্ন হয়ে গেল, দুঃসহ শোক-সাগরে চাঁদ নিতান্ত অসহায় ও একাকী; তথাপি এর চেয়েও অসহ্য কানির গঞ্জনা:

পুত্র মৈল খোটা যদি দেয় মোরে কানি।
তাহার জতেক গুণ আমি তারে জানি ॥

পদ্মবনে পরিহাস্থ করিল সঙ্করে।
সেই তুরাক্ষর বাণি ঘোষয়ে সংসারে ॥

*　　*　　*

দেব করিয়া বুলিতে লজ্জা নাহি কানি।
একরাত্রি বিহা করি ছাড়ি গেল মুনি।

*　　*　　*

যদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া স্থজিব আমি মরা পুত্রের ধার ॥
জে করি করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিঞা গাঙ্গে ॥

অমৃত্যের কন্যা বেহুলা স্বর্গ থেকে চাঁদের সাতপুত্রের প্রাণের বার্তা বহন করে নিয়ে এল—চাঁদ যদি একবার মনসা-পূজা করেন তাহলে হারানো ধনজন সবই ফিরে পাবেন। কোন্ বাপে না এমন কাজ করে? কিন্তু চাঁদও আর ননীর পুতুল নন যে অল্পে গলে যাবেন। শৈব হয়ে তিনি কোন্ কাজে লঘু কানিকে পূজা করবেন? ধনজনের চেয়ে জীবনের সত্যরক্ষা মহতের পক্ষে বড় কাজ। চাঁদ তাই বেহুলা-সনকার সকরুণ মিনতিকে উড়িয়ে দিলেন:

জানি যাউক যে ধনজন আমার নিছনি।
কণ্ঠে প্রাণী থাকিতে না পূজিব লঘু কাণী ॥
যাবত যে চন্দ্রধর জীয়ম পরাণে।
তাবত না পূজিব আমি দৃঢ় কৈল মনে।

কিন্তু কতক্ষণ আর চাঁদ ধৈর্য ধরবেন। যে আকাশ থেকে বজ্র নামে, সেই আকাশ থেকে আবার বৃষ্টিও ত পড়ে। আত্মীয়-পরিজনের বারু বার অনুরোধ-উপরোধ, শোকাতুরা স্ত্রী-পুত্রবধূদের হাহাধ্বনি চাঁদের পাষাণ প্রাণকে বিগলিত করে দিল। চাঁদ অবশেষে মনসাপূজায় রাজী হলেন; তবে নিজের ধর্মকে একেবারে ত্যাগ করে নয়। তিনি মনসাকে খোলাখুলিভাবে জানালেন:

পিছ দিআ বাম হাতে তোমারে পূজিম ॥
শিবলিঙ্গ আমি পূজি যেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিতে ॥

একটি শর্তেও চাঁদ মনসাকে রাজী করিয়ে নিলেন :

চান্দে বোলে, "তোমা পারি পূজিবারে।
আমার নাম চান্দোয়ার টাঙ্গাও ত উপরে ॥"

মনসাকে পূজা করে চাঁদ যে নিজের পৌরুষ ও আদর্শকে বিসর্জন দেননি তা উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিটি-ই প্রমাণ করে। চাঁদকে দিয়ে পূজা করিয়ে মনসা যতই খুশি হোন না কেন, চাঁদের কাছে যে তাঁর অনেকখানি পরাভব ঘটেছে তাও ধরা পড়েছে চাঁদের উক্ত শর্তে সম্মতিদানে।

মনসামঙ্গলের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি বিজয়গুপ্ত নৃপতি হুসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩ খ্রীঃ—১৫১৯ খ্রীঃ) বর্তমান ছিলেন। বরিশাল জেলার ফুল্লশী গ্রামে কবির জন্ম। খুব সম্ভব তিনি ১৪৯৪ খ্রীঃ কাব্যরচনা করেন। বিজয়গুপ্তের কবিখ্যাতির আওতায় অন্যান্য কবিদের যশ বেশ খানিকটা ম্লান হয়ে গেলেও তাঁর পদ্মাপুরাণকে উঁচুদরের কাব্য বলা যায় না। কাহিনীরচনার শৈথিল্য ও দুর্বলতা এবং গৌণ চরিত্র (শিব-দুর্গা) বিশ্লেষণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ বিজয়গুপ্তের কাব্যের শিল্পগৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে।

বিজয়গুপ্ত

মনসামঙ্গল করুণরসের আকর। সব কবিই অল্পবিস্তর করুণ রস বর্ণনায় উৎসাহ দেখিয়েছেন। বিজয়গুপ্ত কেবল করুণরস বর্ণনায় উল্লেখ্য কৃতিত্ব দেখাননি, সেইসঙ্গে আদিরসকেও পঞ্চমে তুলে গেয়েছেন। এবিষয়ে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যায়। ভারতচন্দ্র যেমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে দৈবচরিত্রকে উপহাস্যের বিষয় করে তুলেছেন, বিজয়গুপ্তও তেমনি আদিরসের নিরাবরণ প্রকাশ ঘটিয়ে দৈবচরিত্রের মহিমাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। যেমন,—

পুষ্পবনে শিবের মনে রতিভাব জাগার বর্ণনাটি :

কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতিরসে করে ঢসমস।
অতি কামে হইয়া ভোল শ্রীফলবৃক্ষে দিল কোল
আচম্বিতে খসিল মহারস ॥

এখানে শিবকে দেবতা বলে মনে হয় না; তিনি এখানে একেবারে কামলোলুপ সাধারণ মানুষ।

তারপর, শিবকন্যা মনসার প্রতি শিবের অশোভনীয় আচরণ :

কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত।
লজ্জায় বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত॥
পদ্মা বলে, "বাপ, তুমি পরম কারণ।
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন॥
দেবের দেবতা তুমি পূজে ত্রিজগতে।
সকল সংসার তুমি জান ভাল মতে॥
আপনি সকল জান মুই বল্‌ব কি ?
বাপ হইয়া না চিনিলা আপনার ঝি।"

শিব এঁখানে বেহায়া লম্পট দুশ্চরিত্র।

বৃদ্ধকালে মানুষের মতি স্থির হয়। কিন্তু শিব, তিনি বার্ধক্যেও পরনারীর সঙ্গে দুষ্ক্রিয়াসক্ত। ডোমিনীর কাছে চণ্ডীর তাই দুঃখ :

চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাহি ওর।
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর॥

বেহুলার নগ্ন সৌন্দর্য বর্ণনায়ও কবি কার্পণ্য করেননি :

চাচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুর নিকটে॥

* * *

অর্ধোত্থিত স্তনদ্বয় শোভে হৃদিপরি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি॥

করুণরস সৃষ্টিতে বিজয়গুপ্ত বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। কবিত্বশক্তির সহজ ও সুন্দর প্রকাশে বর্ণাঢ্য বিষয়গুলি একাধারে হৃদয়গ্রাহী ও বাস্তবরসে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চণ্ডীর দাপটে মনসা যখন জয়ন্তীপর্বতে বাস উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন মনসা পিতৃগৃহ হারানোর দুঃখ প্রকাশ করেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায় :

জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥

যে মনসা সদা হিংসায় উন্মত্তা, পূজা-প্রচার নিয়ে যিনি নিত্যনিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে লিপ্তা, সেই মনসাকে এখানে কত অসহায়ভাবে দীন-ভিখারিণীর মত কাঁদতে দেখি।

বিজয়গুপ্তের লেখনীতে সনকার চিত্রটি সর্বাপেক্ষা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সনকার দুঃখকথা বাঙালী গৃহের পুত্রবিয়োগ-বিধুরা প্রাকৃত জননীর শোকগাথা। তার প্রতিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস, প্রতিটি কাতরোক্তি যেন হৃদয়দ্বারে এসে আঘাত হানে। লৌহবাসরে লখীন্দরের মৃত্যুর পর পুত্র-শোকোন্মাদিনী সনকাকে আলুলায়িতকুন্তলা অশ্রুমুখী মাতৃমূর্তি বলেই মনে হয়:

কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায়॥
দুই হস্তে ধরি রাণী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রাণী বদন-কমলে॥

লখীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার বিলাপও খুবই স্বাভাবিকভাবে কবি বর্ণনা করেছেন। বেহুলার যৌবনবিরহ ভারতের শাশ্বত পতিভক্তি-সংস্কারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। যে বেহুলা কেবল পতিভক্তির পরাকাষ্ঠারূপে বাঙালী-চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে, সেই বেহুলাকে যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল করে তোলা কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। বেহুলা এই বলে বিলাপ করছে:

আম ফলে থোকা থোকা নুইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল॥
সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বান্ধিব।
হারাইলাম প্রাণপতি কোথা যাইয়া পাব॥

লখীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ সনকাকে যে কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন তা নিতান্ত সাধারণ পিতৃহৃদয়ের অসহায় বিলাপোক্তি:

শীতল চন্দন যেন আভের ছায়া।
কার জন্য কান্দ প্রিয়া সকল মিছা মায়া॥
মিছামিছি বলি কেন ডোকর আমার।
যে দেছিল লখীন্দর সে নিল আবার॥

চরিত্রচিত্রণ কালে বিজয়গুপ্ত বাস্তব-সম্ভবের দিকে অধিক দৃষ্টিক্ষেপ করাতে চাঁদের আকাশস্পর্শী পুরুষকার শেষপর্যন্ত ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বেহুলা-লখীন্দর নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর চাঁদ পুত্রবধূশোকান্ধ সাধারণ মানুষের মত বিলাপ করেছেন :

পুত্রবধূ শোকে চান্দ দুঃখ ভাবে মন।
জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন॥
তোমার প্রসাদে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ।
পুত্রবধূ শোকে মোর বদরিছে বুক॥

চাঁদের শোকাতুর অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিজয়গুপ্ত চাঁদকে দিয়ে জোড়-হাতে মনসার স্তব করিয়ে নিয়ে কাব্যের ভরাডুবি করেছেন।

কবি বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক বিপ্রদাস পিপিলাই নামক একজন ব্রাহ্মণ কবির নাম পাওয়া যাচ্ছে। কবির নিবাস বসিরহাট মহকুমার নাদুড্যা গ্রামে। তাঁর ভণিতায় দুখানি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পুঁথি দুটি খণ্ডিত। মনসামঙ্গলের যেটি প্রধান কাহিনী—বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুঁথির ভাষা এবং আধুনিক স্থানের নামোল্লেখ (যেমন.—কুমারহাট, হুগলী, ভাটপাড়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ইছাপুর, রিষড়া, কোন্নগর, এড়েদহ, চিৎপুর, কলিকাতা প্রভৃতি) দেখে মনে হয় বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্য উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হয়ে থাকবে। গ্রন্থমধ্যে অবশ্য কবি নিজের আত্মপরিচয়দান প্রসঙ্গে কাব্যরচনার কাল উল্লেখ করেছেন :

বিপ্রদাস পিপিলাই

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শা গৌড়ের সুলতান॥
হেনকালে রচিত পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পীরিত।

উপরি-উক্ত 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ' হতে জানা যাচ্ছে বিপ্রদাসের কাব্যরচনার কাল ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খ্রীঃ। পুঁথির এই অংশটুকু ছাড়া বিপ্রদাসের কাব্যের প্রাচীনতা (অর্থাৎ ইহা পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের কাব্য) প্রমাণের আর কোন নিদর্শন নেই। পুঁথি-দুইখানির ভাষা আদ্যোপান্ত আধুনিক। তাছাড়া ইহাতে হুগলী,

ভাটপাড়া, পাইকপাড়া, ইছাপুর, কলিকাতা প্রভৃতি যে আধুনিক স্থানের উল্লেখ রয়েছে তাতেই ত বোঝা যায় এই কাব্য কিছুতেই উনিশ শতকের পূর্বে রচিত নহে। বিপ্রদাসের কাব্য আদৌ প্রচারিত হয়নি। কাজেই ইহাতে আধুনিক শব্দ বা স্থানের নাম প্রক্ষিপ্ত হয়েছে এমন অনুমান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আধুনিকতার এই লক্ষণগুলি থেকেই মনে হয় খণ্ডিত পুঁথিদ্বয়ের রচনাকাল নির্দেশক পূর্বোক্ত পদটি প্রক্ষিপ্ত। অতএব বিপ্রদাসের মনসাবিজয় যে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে লিখিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীটি না থাকায় ইহার আকর্ষণ বহুলাংশে কমে গিয়েছে। তবে মনসা ও চাঁদচরিত্র বর্ণনায় কবি কিছুটা বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছেন। হাসান হুসেনের পালায় হিংস্র পিশাচিনী মনসা ভক্তের ভক্তিবারিসিঞ্চনে দয়াবতী করুণাময়ী দেবীতে পরিণত হয়েছেন :

হাসন এতেক যদি করিল স্তবন
মনসা ব্যথিত অতি হইলা তখন।
অধিক বাড়িল দয়া আপন কিঙ্করে
ডাকিয়া বলেন মাতা মধুর সুস্বরে ॥

মনসামঙ্গলের কোন কোন কবি দুঃখ-তাপে ভক্তি-শ্রদ্ধাতে চাঁদের অনমনীয় পৌরুষকে খর্ব করে ফেলেছেন; কিন্তু বিপ্রদাসের মত কোন কবি চাঁদের মস্তকে মনসার পদাঘাত করানর সাহস করেননি। এতে চাঁদের অধঃপতন ঘটেনি, সেই সঙ্গে কবিকর্মেরও অবনতি ঘটেছে। কাব্যশেষে চাঁদ নিতান্ত হীনচেতা ব্যক্তির মত মনসাকে মিনতি করে বললেন :

দেখিয়া চাঁদের স্তুতি তুষ্ট বিষহরি
মাগিল যতেক বর দিলা পূর্ণ করি।
হাসি পদাঘাত কৈলা চাঁদের মস্তকে
অন্তরিক্ষ হইয়া দেবী রহিল কৌতুকে।

দ্বিজ বংশীদাস

চৈতন্যোত্তর যুগের কবি দ্বিজবংশীদাস মৈমনসিংহ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মনসার ভাসান পূর্ববঙ্গে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর কারণ দ্বিজবংশী ছিলেন ভক্তকবি। ভক্তসাধকের দিব্য ভাবদৃষ্টির সঙ্গে স্বভাবকবির বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে দ্বিজবংশীর রচনায়। সুগভীর আন্তরিকতা

ও ভাষার সারল্য জনগণচিত্তকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। সর্বোপরি দ্বিজবংশী গ্রামে গ্রামে কীর্তনের দল নিয়ে মনসার গান গেয়ে বেড়াতেন। দ্বিজবংশীর সহজসিদ্ধির মূলে ইহা একটি কারণ। কবিগুরু বলেছেন, সঙ্গীতে মানুষের হৃদয়ের কথাটা ফাঁস হয়ে পড়ে। কাজেই যিনি অন্তরে বাহিরে বড় ভক্ত তিনি ত সহজেই মানুষের চিত্তকে জয় করে নেবেন। তিনি যে কত বড় কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন তা ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য-সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের লেখা থেকে বোঝা যায়। 'ময়মনসিংহের কবিকথা'তে তিনি উল্লেখ করেছেন—"কবি দ্বিজবংশী ছিলেন পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাণের কবি। প্রায় তিনশত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, আজও ময়মনসিংহবাসী তাহাদের প্রাণের কবিকে ভুলে নাই। ঘরে বাহিরে, মনের মধ্যে, আজও তাঁহাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দিয়া রাখিয়াছে।"

দ্বিজবংশীর আবির্ভাব কাল নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। কবির কাব্যমধ্যে কাল নির্ণায়ক দুটি পদ পাওয়া গিয়েছে :

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার ॥

ইহার দ্বারা বোঝা যায় দ্বিজবংশী ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীঃ মনসার ভাসান রচনা করেন। কিন্তু কবির কাব্যের ভাষা ও উপাদান ইহা সমর্থন করে না। কাব্যের ভাষা আধুনিক। কাব্যের মধ্যে মগ-ফিরিঙ্গিদের সজীব বর্ণনা আছে :

মঘ ফিরিঙ্গি যত বন্দুক পলিতা হাত
একেবারে দশ গুলি ছোটে।
সিলই হাওই দবা স্থানে স্থানে করে শোভা
গণ্ডগোল কালঙ্গিয়া ঠাটে ॥

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পর্তুগীজগণ মুঘল সৈন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়ে দস্যুবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। তারা আরাকানের মগদের সঙ্গে মিশে নিম্নবঙ্গে যথেচ্ছ অত্যাচার শুরু করে। মুঘলসৈন্য আবার অচিরে পর্তুগীজ ও মগদস্যুদের বিধ্বস্ত করে ফেলে। দ্বিজবংশীর কাব্যে মগদস্যুদের বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে মনসার ভাসান রচনা করে থাকবেন। কবির কাব্যে উল্লিখিত কালনির্ণায়ক পূর্বোক্ত পদদুটি প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়।

মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবির কাব্যের কালনির্ণায়ক পদগুলি যেমন একাধিক পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছে, সেরকম দ্বিজবংশীর মুদ্রিত পুঁথি ভিন্ন অন্যত্র উক্ত কালনির্ণায়ক পদগুলি পাওয়া যায়নি।

দ্বিজবংশীর মনসার ভাসান মনসামঙ্গলের গতানুগতিক ধারা থেকে একটু ভিন্নতর। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের উচ্চ আদর্শের ক্ষেত্রে তাঁর কাব্য প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যপ্রভাবের ফলেই ইহা সম্ভবপর হয়েছে। পূর্ববর্তী কবিগণ চাঁদকে পরমশৈব করে তুলেছেন। দ্বিজবংশীর কাব্যে দেখা যায় চাঁদ যেন ঠিক শৈব নন, তিনি চণ্ডীর উপাসক। আর এই চণ্ডী ও মনসাকে তিনি অভেদরূপে দেখেছেন—যা মনসামঙ্গলের একেবারে ঐতিহ্যবিরোধী। চাঁদ উত্তরদেশ থেকে বাণিজ্য করে ঘরে ফিরে সনকাকে মনসাপূজা করতে দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলেছেন :

করজোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্ম-স্বরূপিণী তুমি আদ্যা প্রকৃতি॥
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা॥
তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে॥

চাঁদের এই উদার স্বীকৃতি চৈতন্য পরবর্তী যুগ-চেতনার ফল কিংবা দ্বিজবংশীর অন্ধভক্তির পরিণাম বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। কবি চণ্ডীকে দিয়ে মনসার বিরুদ্ধে চাঁদকে শেষপর্যন্ত উত্তেজিত করালেন। শেষরাতে দেবী চণ্ডী চাঁদকে স্বপ্নে জানালেন :

দুষ্ট দেবী বিষহরী পূর্বজন্মে তব বৈরি
ঘরে আইল দুষ্ট মায়া পাড়ি।
যদ্যপি চাও কল্যাণ কর তার অপমান
মারি দড় হেঁতালের বাড়ি॥

মনসামঙ্গল কাব্য করুণরসের আকর। দ্বিজবংশীর কাব্যে এই করুণরসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বীররস। কবি চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন কঠোরে-কোমলে মিশিয়ে। দ্বিজবংশীর কাব্যরচনা ও চরিত্রচিত্রণের অভিনব বৈশিষ্ট্য ইহাই। সনকাকে মনসাপূজা করতে দেখে যে চাঁদ ভক্তিতে

গলে গিয়েছেন, তিনিই আবার লখীন্দর-হারা হয়ে মনসার প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেছেন :

পুরীর মধ্যে শুনিল বিলাপ কান্দা কাটি।
মার মার ডাক ছাড়ে হাতে লৈয়া লাঠি ॥

সাত সাতটি পুত্র, সাত সাতটি বাণিজ্যতরী হারিয়েও চাঁদ কাতর হয়ে পড়েননি। বীরদর্পে তিনি তাই পুরবাসীদের উদ্দেশ করে বলেছেন :

কিসের ক্রন্দন মোর পুরীর ভিতর।
শুনিয়া বলিবে কানী হৈয়াছি কাতর ॥

পুত্রশোকের মত বড় শোক মানুষের জীবনে নেই। বিস্ময়ের বিষয়, চাঁদের অভ্রভেদী পুরুষকারের কাছে সেই শোক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে পরিণত হয়েছে। স্বগর্বে তাঁকে তাই বলতে শুনি—

শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পূজিব কানী পরাণ থাকিতে ॥
কানীর উচ্ছিষ্ট পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া।
ঢোল মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া ॥

করুণরসসৃষ্টিতে দ্বিজবংশী চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিপদসঙ্কুল জলপথ বেয়ে স্বর্গগমন কালে অভাগী খণ্ডকপালিনী বেহুলা যে সকরুণ উক্তি করেছেন তা বড়ই বেদনাদায়ক :

চান্দর কোঞর প্রভু লক্ষীধর
দেহ হে উত্তর মোরে।
আমি অভাগিণী কিছুই না জানি
ভাসিলু একা সাগরে ॥
তরঙ্গ যে দেখি ভয়ে মুদে আঁখি
কিসে যাই দেবপুরী।
তব অঙ্গ খসি পড়ে রাশি রাশি
কেমনে পরাণ ধরি ॥

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কবি কালিদাস পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত হন। তাঁর কাব্যের মধ্যে বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের অনেক স্থানের নামোল্লেখ আছে। কবি খুব সম্ভব ১৬৯৭ খ্রীঃ কাব্যরচনা শেষ করেন। কবির ভণিতা থেকে বোঝা যায়,

কবি কালিদাস

তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কবি গোলোকনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাব্যরচনা করেন :

গোলোকনাথের পদ-পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা-মঙ্গল কবি কালিদাস ভণে॥

কাহিনী-গ্রন্থন ও চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়ে কালিদাস মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় না দিলেও তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যখানি বেশ সুখপাঠ্য এবং সেজন্য ইহা পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থানেই বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। করুণরস সৃষ্টিতে কালিদাস অল্প-স্বল্প কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, যার নিদর্শন মেলে পতিহারা শোকোচ্ছ্বাস বর্ণনায় :

কান্দে বালি করিয়া বিলাপ।
ললাটে হানিয়া কর অঙ্গ এড়ি অনাদর
উপজিল বিষম সন্তাপ॥
পড়িয়া ভূমির তলে ভাসিল নয়ান জলে
ধৌত হৈল উজ্জ্বল কাজল।
পড়িছে আনন মাঝে যেন দেখি দ্বিজরাজে
শোভিত করয়ে কলেবর॥

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রাঢ়দেশে (মধ্য-পশ্চিম বঙ্গে) কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'কেতকাদাস' ছিল কবির উপাধি। ক্ষেমানন্দের মতে মনসার এক নাম কেতকা। পদ্মপত্রে জন্মগ্রহণ করাতে যেমন মনসার এক নাম পদ্মা, তেমনি কেয়াপাতে জন্ম হওয়ায়, ক্ষেমানন্দের মনসার আর এক নামও কেতকা। কাব্যমধ্যে কবি ইহার পরিচয়ও দিয়েছেন—'কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী'। ক্ষেমানন্দ চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব বিদ্যমান। সেজন্য বৈষ্ণবকবির মত ক্ষেমানন্দ নিজনামের সঙ্গে দাস যুক্ত করে নিয়েছেন। মনসার যে তিনি একজন বড় ভক্ত, তার পরিচয় বহন করে 'কেতকাদাস' উপাধিটি। অনেকে 'কেতকাদাস' পদটি নিয়ে গোলে পড়েছেন। তাঁদের ধারণা কেতকাদাস একজন স্বতন্ত্র কবি। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি দুটি (একটি ক্ষেমানন্দের মায়ের উক্তি, অপরটি কবির ভণিতা) লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে :

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

(১) শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কতেক কহিব বন্দ
খড় কাটিবারে বলে মাতা।

(২) মান্দাস ভাসিল জলে মনসার পদতলে
বিরচিল কেতকার দাস।

মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে ক্ষেমানন্দ অন্যতম। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণি ছিলেন শ্রীচৈতন্য। এযুগের সকল প্রকার কাব্যে তাঁর প্রভাব পড়েছে। ক্ষেমানন্দ চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। কাজেই তাঁর কাব্যেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবে পড়েছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যের মার্জিত ভাষা, পরিশুদ্ধ রুচি, উন্নত নৈতিক ভাব ও উচ্চ চারিত্রিক আদর্শ চৈতন্য প্রভাবের ফলশ্রুতি। ইহা ছাড়া মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরামেরও প্রভাব পড়েছে ক্ষেমানন্দের কাব্যে। কবি মুকুন্দরামের কাব্যরচনার প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেন। সেকারণে, মুকুন্দরামের ভাষা ও চিত্র বহুলাংশে অনুসরণ করার সুযোগ পেয়েছেন ক্ষেমানন্দ।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বর্ণনকুশলী কবি। চাঁদের দুর্গতি বর্ণনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। মনসার কোপে চাঁদের সপ্ত বাণিজ্যতরীর ভরাডুবি হয়েছে। জলে হাবুডুবু খেতে খেতে চাঁদের নিজের অবস্থাও বড় সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। চাঁদের 'চক্ষু রাঙ্গা পেট বড় খাইয়া চুবানি'। মনসা কৃপা করে জলে পদ্ম ভাসিয়ে দিলেন চাঁদের প্রাণ রক্ষার জন্য। কিন্তু,—

চাঁদ বলে, "এই পদ্মে মনসার জন্ম।
হেন পদ্ম পরশিলে অনেক অধর্ম॥"
এত ভাবি চাঁদ বাণ্যা না ছুঁইল ফুল।
জল খায়্যা মরে সাধু নাহি পায় কূল॥

জলে ভাসতে ভাসতে চাঁদ কোনক্রমে তীরে এসে উঠলেন। অঙ্গে বসন নেই। সেইক্ষণে মনসা আবার কুলবধূদের জুটিয়ে নিয়ে চাঁদেরে দরশন দিলেন। তখন—

কুলবধূগণ দেখি সাধু লজ্জা পায়।
বিবসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায়।
সকল রমণী বলে, "ক্ষেপা দিগম্বর।
বিবস্ত্রে বসিয়া কেন, মড়াকানি পর॥"

শ্মশানের কানি সাধু লাজে গিয়া পরে।
ভিক্ষা মাগি খাত্যে গেল নগরে নগরে॥
বাম হাতে হোলা তার ছেঁড়া কাঁথা গায়।
মনসার হাটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়॥

শ্মশানের মড়াকানি দিয়ে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করে চাঁদ নিঃস্ব-রিক্ত সর্বহারা ভিখারীর মত চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষে অতিকষ্টে অনেক খোঁজের পর বন্ধুগৃহে আশ্রয় নিলেন। হায় রে, পোড়া কপাল! যে চেঙ্গমুড়ি কানি চাঁদের চোখের বালি সেও কিনা আবার চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুগৃহেও এসে হাজির হয়েছে! হেঁতালের ঝাড়ি নিয়ে ক্রোধে চাঁদ বন্ধুগৃহের 'মনসার-বারি' ভাঙ্গতে উদ্যত হলেন। ফল হল অত্যন্ত খারাপ। বন্ধু চাঁদকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল।

বিষণ্ণ মনে চাঁদ বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। পথে এক কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেখা। কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে চাঁদকেও সঙ্গে নিল। চাঁদ চন্দন কাঠ কেটে বিরাট বোঝা মাথায় নিয়ে চললেন। চাঁদের এই সামান্য একটু সঙ্গতি দেখেও মনসা স্থির থাকতে পারলেন না। চাঁদকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কাঠের বোঝায় চেপে বসতে তিনি হনুমানকে আদেশ করলেন। হনুমান তৎক্ষণাৎ দেবীর আদেশ পালন করল। গুরুভারে চাঁদ দুঃসহ ব্যথা পেলেন:

কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হাত দিয়া সাধু 'বাপ,' 'বাপ' ডাকে॥
বিষাদ ভাবিয়ে কান্দে চক্ষে পড়ে পানী।
তবু বলে, "দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ি কানী॥"

দুর্গতির শেষ এখানে নয়। ক্ষুধায় আকুল হয়ে চাঁদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন পথের মধ্যে কলাচোপা ও আকের খোসা পড়ে রয়েছে। এক ব্রাহ্মণ পিতৃশ্রাদ্ধ করে ঐগুলি ফেলে রেখে চলে গেছেন। চাঁদ এতই ক্ষুধাতুর হয়ে পড়েছেন যে ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করতে পারলেন না। সরোবরে তাড়াতাড়ি স্নান করে উঠে ঐগুলি খেয়ে গায়ে বল করে নিলেন:

কলাচোপা খায়্যা সাধু গায়ে কৈল বল।
অঞ্জলি ভরিয়া সাধু পান কৈল জল॥

সেজন্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি অসামান্য কবিখ্যাতি অর্জন করেন। পল্লীর কৃষকগণ পর্যন্ত উৎসবে-অনুষ্ঠানে তাঁরই বিভিন্ন পদ গান করে থাকে।

ষষ্ঠীবরের কাব্যের ভাষায়, কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টিতে গ্রাম্যতা দোষ বিদ্যমান। বাংলার যে বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে মনসামঙ্গলের ক্রমবিকাশের ধারাটি প্রবহমান ছিল তার সঙ্গে সুদূর শ্রীহট্টের অধিবাসী ষষ্ঠীবরের কোন যোগ ছিল না। এজন্য তাঁর কাব্য মার্জিত রুচি ও উন্নত শিল্পকলার অধিকারী হতে পারেনি। নিজের সীমিত পরিবেশের মধ্যে থেকে ভাবাদর্শ গ্রহণ করে ষষ্ঠীবর মনসামঙ্গলের কাহিনীর একটা প্রচলিত কাব্যরূপ দেয়েছেন। একারণেই ইহা শ্রীহট্টের আপামর জনসাধারণের কাছে এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

দুঃখ বর্ণনায় ষষ্ঠীবর উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীর পচা মড়ায় প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বেহুলা মনসার কাছে করুণ ভাবে আটমাসের দুঃখকথা নিবেদন করেছেন :

শুন গো, মনুসা মাও গো, মহাদেবের ঝি।
হেন লয় মোর মনে শীতল জল পি॥
বৈশাখ মাসেতে, মাও গো, লখাইয়ে বিয়া করে।
কালরাত্রি খাইল নাগে লোহার বাসরে॥
রামকলা কাটিয়া, দেবী গো, ভেরুয়া সাজাইলু।
ইষ্টমিত্র বাপ তাই ফিরিয়া না চাইলু॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেত, মাও গো, ভাসিনু সাগরে।
দারুণ জ্যৈষ্ঠের খরায় বজ্র ভাঙ্গি পড়ে॥
প্রাণনাথ স্মরি, মাও গো, চক্ষের পড়ে পানী।
শুকনা কাষ্ঠেতে যেন জলন্ত আগুনি॥

মনসামঙ্গলের কাহিনী দুঃখে-কারুণ্যে বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। এজন্য সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে এই কাব্য ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত চট্টগ্রামে রামজীবন বিদ্যাভূষণ নামে একজন মনসামঙ্গল রচয়িতার নাম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রথমেই কাব্যরচনা করেন। ভণিতাতে কবি সেকথা উল্লেখ করেছেন :

রামজীবন

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসা-মঙ্গল রামজীবন রচিত ॥

ইহা হতে বোঝা যায় কবি ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। ভণিতার অনেক স্থলে কবি নামের পরিবর্তে বিদ্যাভূষণ কথাটি ব্যবহার করেছেন। মনে হয়, বিদ্যাভূষণ কবির উপাধি ছিল। রামজীবনের কাব্যে উচ্চ শিল্পবোধের পরিচয় নেই; এজন্য ইহা ব্যাপক প্রচারলাভ করেনি। একমাত্র চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে ইহা প্রচারিত হয়েছিল এবং ঐ অঞ্চলে ইহা 'বিদ্যাভূষণী মনসা' নামে পরিচিত।

জীবন মৈত্র

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের আর একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন জীবন মৈত্র। কবি অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে লাহিড়ীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যমধ্যে কবি কাব্যরচনার কাল সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন—'মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু সমর্পিয়া বুঝহ সনের পরিমাণ' তা থেকে জানা যায় ১১৫১ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৪ খ্রীঃ তিনি কাব্যরচনা করেন।

জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পরিকল্পনায় কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার সঙ্গে উত্তর-বিহারের বেহুলা-বিষহরীর কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। জীবন মৈত্রের কাব্যে বেহুলার নাম বেললি এবং বেহুলার মাতার নাম মেনকা। উত্তর-বিহারের সর্বত্রই বেহুলা-মাতার মেনকা নামটিই সুবিদিত। উত্তর-বিহার থেকে বেহুলা-বিষহরীর যে কাহিনীটি উত্তরবঙ্গে প্রথম প্রবেশ করেছিল, সেই প্রাচীন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে জীবন মৈত্রের কাব্য রচিত হয়।

কাব্যরচনায় জীবন মৈত্র তেমন উল্লেখ্য কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যে কবি সুপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যমধ্যে সেই নীরস পাণ্ডিত্যের অবতারণা করে কবি কাব্যের মধুর কোমলকান্ত ভাবটিকে ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন। মনসামঙ্গল কাব্য কারুণ্যে ভরা। এই করুণ ভাবকে শিল্পরূপ দিতে গেলে প্রয়োজন অকৃত্রিম সহানুভূতি। জীবন মৈত্রের মধ্যে ইহার একান্ত অভাব ছিল বলে করুণরস সৃষ্টিতে তিনি সফল হতে পারেননি। তাছাড়া রুচি-দৃষ্টির দরুন তাঁর

কাব্য অনেকক্ষেত্রে নীতিবিগর্হিত পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। যেমন, পদ্মার চাঁদের ছয়পুত্র বিনাশের চেষ্টায় পদ্মার উদ্দেশে চাঁদের উক্তি :

পদ্মাক গর্জিয়া সাধু কি বোলে বচন।
"কানীর আছিল আশা পাইবে পূজন॥
দূর দুষ্ট, কানি, তোর নাগ নাহি পাঙ।
হাতে নাগ পাইলে তবে ভাল পূজা দেঙ॥
নিজ পতি ছাড়ি ফির পর-পতি চায়া।
পূজা লইতে চাহ, কানি, চেঙ্গ-বেঙ্গ খায়া।
কানীর কারণে আছে এহি হেমতার।
নাগ পাইলে কানীর শুধিব এই ধার॥
ভাল বাঁচি গেল মাগী ধামনা-ভাতারী।"
আকাশে থাকিঞা শুনে জয় বিষহরী॥

বিষ্ণুপাল

কবি বিষ্ণুপাল রচিত মনসামঙ্গল কাব্য বীরভূম জেলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সম্ভবত, কবি বীরভূম জেলারই অধিবাসী এবং অষ্টাদশ শতকের কোন এক সময়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। পল্লীবাসীর অসহায় প্রপীড়িত জীবনের ভাষাচিত্র মনসামঙ্গল কাব্যের উপজীব্য। বিষ্ণুপাল পল্লীকবি। তিনি অতি সহজে পল্লীবাসীর প্রাণের সুরটি মনসামঙ্গল কাব্যে ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। সেকারণে তাঁর কাব্য বীরভূমের জনগণচিত্তকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছে।

বিষ্ণুপালের কাব্যে দেবচরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব লক্ষিত হয়। তাঁর কাব্যে দেবতাও মানুষের মত অসহায়, দুঃখ তাপে কাতর। যে মনসা ক্রূর-হিংস্র-পরায়ণা, জিঘাংসা বৃত্তিতে সদামুখরা, দুর্লংঘ্য শক্তির অধিকারিণী তাঁকেও চাঁদের কাছে একরকম পরাভব স্বীকার করে নিয়ে অসহায়ভাবে দুঃখ করতে হয়েছে পিতার কাছে :

শোন, শোন, বাপা শোন, সদাশিব,
আমার দুঃখের বাণী।
স্বর্গের অনিরুদ্ধ আনিয়া দাও, বাপা,
মর্ত্যে লইব ফুলপানী॥

অন্য দেবতার নিতুই পূজা
আমি তোমার ঝি।
এতদিন আছিলাম পবন ভখিয়া
এবে যে করিব কি ॥

মনসা এখানে ভয়বিহ্বলা আত্মশক্তিহীনা ক্ষুধাতুরা সাধারণ মানবী।

মনসামঙ্গলের স্বরূপ ॥

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ হতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন; কিন্তু সব কবির সম্পূর্ণ পুঁথি আবিষ্কৃত হয়নি। কারো পুঁথির অংশমাত্র, আবার কারো কেবল নামমাত্র পাওয়া গিয়েছে।

পদ-সঙ্কলন

একারণে মনসামঙ্গল কাব্যের সামগ্রিক বিচারে ও প্রত্যেক কবির কাব্যের পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার পথে অনেক বাধা উপস্থিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের গায়েনগণই (traditional musicians) ইহার জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। গায়েনগণ যে অঞ্চলে মনসা-মঙ্গল গান করতেন, সেখানকার বিভিন্ন কবির পদ একত্রিত করে একটি সঙ্কলন সম্পাদন করে নিতেন এবং ইহাতে যে কবির যে অংশ সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত, সেই কবির সেই অংশই সঙ্কলিত হত। এরূপে বহু কবির রচনা একত্রিত হয়ে এক একটি পুঁথি লিখিত হত, কোন বিশেষ কবির কাব্যের আনুপূর্বিক রচনাযুক্ত পুঁথি লিখিত হত না। ফলে প্রাচীন কবিদের সতন্ত্র পুঁথি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং তার অংশমাত্র কেবল গায়েনদের পদসঙ্কলনে রয়ে গিয়েছে।

মনসামঙ্গলকাব্যকে গেয় কাব্য বলা চলতে পারে। ইহা গান করার একাধিক রীতি প্রচলিত আছে। গানের মধ্য দিয়েই ইহার পরিচয়টা জনসাধারণের মধ্যে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দীর্ঘ একমাস কাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ইহার গান চলতে থাকে। আষাঢ় সংক্রান্তির দিন মনসার ঘট স্থাপন করে এক এক দিন মনসামঙ্গলের এক একটি অংশ গান করা হয় এবং শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মনসামঙ্গল গান

নারীই ইহার পাঠিকা, নারীই ইহার শ্রোত্রী। গ্রামের বারোয়ারী তলায় বা চণ্ডীমণ্ডপে বসে একজন গায়েন দোহারের সহযোগিতায়ও এই মঙ্গলগান করে থাকে। অনেক সময় আবার

অভিজ্ঞ পুঁথি পাঠককেও কোন চণ্ডীমণ্ডপে বসে সুর করে করে একমাসে পুঁথি পাঠ শেষ করতে দেখা যায়। বিক্রমপুর-বরিশাল অঞ্চলে এই রীতি প্রচলিত আছে।

বরিশাল জেলায় রয়ানীর দল নামে একপ্রকার গীতি-সম্প্রদায় আছে। রয়ানী শব্দটির অর্থ যাত্রা। ব্যবসায়ী গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে এই রয়ানী দল গঠিত হয়। বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে রয়ানী-দল মনসামঙ্গল গান করে থাকে। এই গান সাতদিন, পাঁচদিন বা আড়াইদিন পর্যন্ত চলে।

মনসামঙ্গলের কাহিনী অবলম্বনে লোক-নাট্যের (Folk drama) উদ্ভব ঘটে। সম্ভবত, ইহা কৃষ্ণযাত্রার অনুসরণে সৃষ্টি হয়ে থাকবে। লোক-নাট্যে মনসামঙ্গলের কাহিনীটি কেবল আনুপূর্বিক বিবৃত হয়, ভাষা গৃহীত হয় না। সেজন্য কাব্যে মনসামঙ্গলের রস যেমন নিবিড় হয়ে ওঠে, লোক-নাট্যে তেমন হয় না।

যাত্রাদলের মত পুতুলনাচের দলও বাংলাদেশে আছে। ভাগীরথী নদীর উভয় তীরে এই পুতুলনাচের প্রচলন আছে। দক্ষ বাজিকর পুতুলের অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে মনসামঙ্গলের কাহিনী ব্যক্ত করে থাকে। ইহাতে মনসামঙ্গলের বিভিন্ন চরিত্রকথা অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণ খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারে।

মেদিনীপুর জেলা হতে শুরু করে বীরভূম জেলা পর্যন্ত বাংলার পশ্চিম সীমান্ত বরাবর পটুয়া নামে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী চিত্রকর আছে। তারা মনসামঙ্গল কাহিনী পটে এঁকে লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দেখায়। মনসামঙ্গলের প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি আবার পটুয়াগণ কণ্ঠসঙ্গীতের মধ্য দিয়েও বর্ণনা করে থাকে। ইহাতে জনগণচিত্ত খুব সহজে বিমুগ্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশের সর্বত্রই বেদিয়ারা সাপ খেলিয়ে জীবিকা অর্জন করে। সাপ খেলা দেখাবার সময় তারা মনসামঙ্গলের কোন কোন অংশ গান করে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গানের মধ্য দিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে বাংলার সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে। তাই এই গানের মধ্য দিয়েই তাকে চিনতে হবে, জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সঙ্গীতেই মানুষের হৃদয়ের কথাটা ফাঁস

হয়ে পড়ে। মনসামঙ্গলে বাঙালী হৃদয়ের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত ব্যথা করুণরসে দানা বেঁধে উঠেছে। গানের সুরে সেই ব্যথা যত গভীরভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে, শিক্ষিত রুচি নিয়ে পঠন-পাঠন কালে তা আর ততখানি উপলব্ধিতে আসে না।

মনসামঙ্গলের কোন বিশেষ কবির কাব্যে ইহার প্রধান চরিত্রগুলি —মনসা, চাঁদ, বেহুলা, সনকা সম্যক স্ফূর্তি লাভ না করলেও সব কাব্যগুলি জোড়া-তাড়া দিয়ে ইহাদের একটা পূর্ণরূপ লক্ষ্য করা যায়। জনসাধারণের চিত্তও কাব্যের খণ্ড-ক্ষুদ্র রূপের প্রতি ততটা আকৃষ্ট হয়নি যতটা হয়েছে ইহার সমগ্র কাহিনীর প্রতি। মনসামঙ্গল আলোচনার উপসংহারে মনসা-পূজা প্রচারের সেই সমগ্র কাহিনীর প্রতি দৃষ্টি রেখে ইহার প্রধান চরিত্রগুলির উপর আলোক সম্পাত করা যাচ্ছে।

চরিত্র বিচার

মনসামঙ্গল কাব্যের ঘটনা-চক্র যাঁর অঙ্গুলিসংকেতে একটা স্থির প্রত্যয়ের দিকে পরিচালিত হয়েছে তিনি হলেন মনসা। মানুষের মনে নীচ স্বার্থপর হিংস্র প্রবৃত্তি জাগলে যে বিকট বীভৎস নিষ্ঠুর ক্রিয়া একের পর এক ঘটতে থাকে তারই সাক্ষাৎলাভ করা যায় মনসার আচরণে। তিনি নিজের পূজা মর্তে জোর করে প্রচারের জন্য জঘন্য বৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন। ডাইনী-পিশাচিনীর মত বিষদাঁত ফুটিয়ে তিনি চাঁদ বেনের সাত সাতটি পুত্রের প্রাণ সংহার করেছেন, চাঁদকে পদে পদে অপমানিত লাঞ্ছিত করেছেন, তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করে ভিখারী সাজিয়েছেন। তথাপি নিজের কৃতকর্মের জন্য তাঁকে কোথাও সহানুভূতি বা সমবেদনা প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। আলাদিনের মায়া প্রদীপের মত তিনি জগতে অসম্ভবকেও সম্ভবে পরিণত করেছেন। কি দুরন্ত অপ্রতিহত শক্তির অধিকারিণীই না তিনি ছিলেন! চাঁদের মত অমন বীর পুরুষকার চরিত্রকেও শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে। কোথা হতে যে তিনি এই দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির অধিকারিণী হলেন তা আমাদের জানা নেই। যিনি চেঙ্গবেঙ্গ খেয়ে জীবনধারণ করেন, হেঁতালের বাড়ীর আঘাতে যাঁর কাঁকাল ভেঙ্গে যায়, সৎ-মাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে যাঁর চোখ কানা হয়ে যায়, তিনিই আবার কোথা থেকে অলৌকিক মায়া-শক্তিবলে লৌহবাসরঘরে লখীন্দরের প্রাণহরণ করেন, পচা মড়ায় প্রাণ

ফিরিয়ে দেন। মনসাকে একারণে মর্তের ধূলিমাটির দুলালী বলে মনে হয় না, মানুষের বিলাস-কল্পনা বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বলোকে যে মেঘরাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয় মনসা সেই রাজ্যের অধিবাসিনী।

মনসামঙ্গলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হল চাঁদ সওদাগরের। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া', চাঁদকে লক্ষ্য করে তেমনি আমরাও বলতে পারি, বাঙালী-চরিত্রের সকল পৌরুষ-মহিমা একীভূত হয়ে চাঁদের দেহটি সৃষ্টি হয়েছে। আজীবন নিদারুণ দুঃখ-অপমান, দুর্গতি-লাঞ্ছনা, শোক-তাপ সহ্য করেও তিনি নিজের ধর্মকে বিসর্জন দেননি, স্থির সঙ্কল্প হতে আদৌ ভ্রষ্ট হননি। এবিষয়ে মহাভারতের একমাত্র ভীষ্মই তাঁর সহিত তুলনীয়। সংসার সমরাঙ্গণে তিনিও ভীষ্মের মত শেষপর্যন্ত মনসার নিক্ষিপ্ত শরের শয্যায় শয়ন করে স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করেছেন। অনেকেই ইহাকে চাঁদের সত্যভ্রষ্ট বলে ভুল করেছেন। যে পুত্রবধূ সংসারের ভোগবিলাসকে বিষকুম্ভের মত হেলায় ত্যাগ করে মৃত স্বামীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করে স্বর্গ থেকে অমৃত বহন করে এনেছে তাকে ভগ্নমনোরথ করতে পারে এমন নির্দয় পুরুষ কি জগৎ সংসারে আছে ?

চাঁদ মনসার দ্বন্দ্বে চাঁদই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছেন। যে হাতে চাঁদ শিবকে পূজা করেন সেই হাতে তিনি মনসাকে পূজা করেননি। মনসার অনেক কাকুতি-মিনতির পর চাঁদ নিজের নামের চাঁদোয়া মনসার মাথার উপর টাঙিয়ে বামহাতে পিছন ফিরে মনসাকে তিনি পূজা করেছেন।

মনসামঙ্গলের আর একটি চরিত্র বেহুলা বাঙালী-মানসে চির-জাগ্রত হয়ে রয়েছে। সীতা-সাবিত্রীর মত বেহুলাও পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা। অচিরকালের মধ্যে তাই সতী বেহুলা বঙ্গনারীর হৃদয় লুট করে নিয়েছে। এমন নারীর কথাও শুনা গিয়েছে, যিনি গলিতকুষ্ঠ রোগী স্বামীকে পর্যন্ত স্কন্ধে বহন করে গণিকা-গৃহে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। কাজেই যে দেশের নারীর কাছে পতিই ধর্ম, পতিই দেবতা, পতিই জীবনের সর্বস্ব, সেই দেশের নারী সতী-সাধ্বী নারী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোথায়ও দেখলে ভক্তি-প্রীতি যে বিগলিতে হয়ে যাবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ? যুগ যুগ ধরে তাই বঙ্গনারী হতভাগিনী বেহুলাকে স্বামীর মড়াদেহ নিয়ে কলার ভেলায় ভাসতে দেখে দূর থেকে চোখের জল ফেলে এসেছে।

সবশেষে সনকার কথা উল্লেখ করতে হয়। এই চরিত্রটিকে বাস্তবের সীমায় নামিয়ে আনতে মনসামঙ্গলের কবিগণ আদৌ কুন্ঠিত হননি। তিনি ধর্মপ্রাণা, পতি-পুত্রের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষিণী, মমতাময়ী মাতৃরূপিণী। স্বামী-পুত্রের মঙ্গলের জন্য তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে গিয়েও মনসা-পূজা করেছেন। প্রাণের পুত্র লখীন্দরের মৃত্যুতে তিনি প্রাকৃত রমণীর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছেন, বেহুলার উপর অকারণ গালি বর্ষণ করেছেন। আবার বেহুলাকে মৃতস্বামী কোলে কলার ভেলায় ভাসতে দেখে তাঁর মাতৃহৃদয়ও আর্তনাদে ফেটে পড়েছে। বেহুলাকে ফিরে আসার জন্য তিনি ব্যাকুল মিনতি জানিয়েছেন। এভাবে দুঃখে-কারুণ্যে, স্নেহে-বাৎসল্যে সনকাচরিত্রটি মনসামঙ্গল কাব্যে বেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় অধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পটভূমি ॥

বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডীর উৎপত্তি রহস্যময়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আদিবাসী-সমাজ, বৌদ্ধ-সমাজ ইত্যাদি ইহার উৎস-ভূমি বলে গৃহীত হয়েছে। এখন এদের মধ্যে কোন্‌টি বিবেচ্য তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন পুরাণ ইহাদের মধ্যে চণ্ডীর উল্লেখ নেই। এমন কি সংস্কৃত অভিধানেও চণ্ডী শব্দটি পাওয়া যায় না। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের পরে যেসব পুরাণ রচিত হয়েছে—'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ,' 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতি কেবল তাদের মধ্যে দেবী চণ্ডীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। চণ্ডী শব্দটি অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকে অর্বাচীন সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছে। কাজেই এসমস্ত দিক লক্ষ্য করে চণ্ডীকে আদিবাসী-সমাজ-সম্ভূত বলে মনে করা চলতে পারে।

চণ্ডীর উৎপত্তি

প্রতিবেশী আদিবাসী-সমাজের সঙ্গে এককালে বাংলার সমাজের নিবিড় যোগ ছিল। সেই সূত্রে আদিবাসী-সমাজের স্ত্রীদেবতা পরিকল্পনা বাংলায়

উচ্চ সমাজেও গৃহীত হয়ে এসেছে। আদিবাসী-সমাজের যে কয়জন দেবতার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের দেবতার সাদৃশ্য আছে একে একে তাঁদের কথা আলোচনা করা যাচ্ছে। প্রথমে চাণ্ডীর কথাই উল্লেখ করা যাক। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ নামক উপজাতি এক শক্তিদেবীর পূজা করে থাকে। ইহার নাম চাণ্ডী। ওরাওঁ যুবকগণই এই দেবীকে পূজা করে। তাদের ধারণা দেবী প্রসন্ন হলে পশুশিকারে ও যুদ্ধ-বিগ্রহে সাফল্য লাভ করা যায়। শিকারের সময় যুবকগণ তাই চাণ্ডীশিলা নিজের কাছে রাখে; তাদের বিশ্বাস, এই শিলা কাছে থাকলে শিকারে ব্যর্থ হওয়ার ভয় থাকে না। প্রতিবছরই মাঘী-পূর্ণিমার দিন চাণ্ডী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাত আটদিন আগে থেকেই পূজার আয়োজন চলতে থাকে। যুবকগণ নিজেদের মধ্যে একজনকে পাহান বা সেইদিনকার অনুষ্ঠানের পুরোহিত নির্বাচিত করে। পাহানযুবক সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে পূজার উপকরণ ও ভোজ্য সামগ্রী সহ চাণ্ডীটাঁড়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তারপর শিলার উপর সিঁদূরের তিনটি ফোঁটা এঁকে কিছু আতপ চাল ছড়িয়ে দেয়। সবশেষে একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়।

চাণ্ডী ও চণ্ডী

উপরি-উক্ত চাণ্ডীর সঙ্গে বাংলা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডীর নিকট সম্পর্ক আছে। চাণ্ডী পশুশিকারে ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি ইচ্ছা করলে বনের সব পশুকে লুকিয়ে রাখতে পারেন; কাজেই তাঁর কৃপা ছাড়া শিকারে সফল হওয়া অসম্ভব। চাণ্ডীদেবী বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকেন বলে ওরাওঁ-সমাজে প্রসিদ্ধি আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধ-কাহিনীতেও দেখা যায় দেবী চণ্ডী ব্যাধ যুবককে প্রথমে স্বর্ণ-গোধিকা, পরে ষোড়শী যুবতীর রূপ গ্রহণ করে ছলনা করেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ওরাওঁ যুবকগণ কর্তৃক পূজিতা চাণ্ডী এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ-পূজিতা চণ্ডী উভয়ই অভিন্ন।

ছোটনাগপুরের মুণ্ডাভাষী মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির মধ্যে চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা নামক এক দেবীপূজার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাকে মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গণ্য করা হয়। বাসস্থানের নিকটে কোনও এক বৃক্ষতলে চাণ্ডীবোঙ্গার শিলা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিকারে যাওয়ার আগে বীরহোড়গণ শিকারের যাবতীয় সরঞ্জাম জাল, দড়ি, কুঠার, লাঠি ইত্যাদি দেবীসন্নিধানে এনে রেখে

চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা

দেয় এবং শিকারে সিদ্ধিলাভের জন্য দেবীর নিকট মোরগ বলি দেয়। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে চণ্ডী-চাণ্ডীর মধ্যে যেটি সাধারণ গুণ—শিকারীর অভীষ্ট পূরণ তা এই চাণ্ডীবোঙ্গারও আছে।

বজ্রতারা

বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে বজ্রতারা নাম্নী এক দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, এই বজ্রতারাই পরে বাংলার লৌকিক দেবী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু 'সাধনমালা'তে বজ্রতারার যে সাধনার কথা উল্লিখিত আছে তাতে বাংলার লৌকিক চণ্ডীর কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না।

বজ্রধাত্বেশ্বরী

তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে বজ্রধাত্বেশ্বরী নাম্নী এক শক্তিদেবীর আরাধনাও প্রচলিত ছিল। 'সাধনমালাতে' দেখা যায় এই দেবীর সঙ্গে সর্প, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি পশুর উল্লেখ আছে। বজ্রধাত্বেশ্বরীর কল্পনা আদিবাসী-সমাজ থেকে উদ্ভূত; কিন্তু ইঁহার সঙ্গে চাণ্ডীর কোন মৌলিক সম্পর্ক ছিল কিনা তা জানা যায় না। ইঁহার সঙ্গে বাংলার লৌকিক চণ্ডীরও কোন সম্পর্ক নেই।

বাসুলী

আনুমানিক ষোড়শ শতকে বাসুলী দেবী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন। কেহ কেহ বলেন, বৌদ্ধদেবী বজ্রধাত্বেশ্বরীই পরবর্তিকালে বাসুলী নামে পরিচিত হন। তাঁদের মতে বজ্রেশ্বরী শব্দ থেকে বাসুলী শব্দের উৎপত্তি, (বজ্রেশ্বরী > বাজসলী > বাসুলী > বাউশলী > বাসুলী। কিন্তু 'সাধনমালা'তে বজ্রেশ্বরী নাম্নী কোন দেবীর উল্লেখ নেই, বজ্রধাত্বেশ্বরীই দেবীর আসল নাম। কাজেই মনে হচ্ছে বাসুলী বজ্রধাত্বেশ্বরী থেকে অন্য কোন ভিন্ন দেবী।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বাসুলী প্রথমে ছিলেন গ্রাম দেবতা; পরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজে স্থান পেয়েছেন। এ অনুমান সত্য। দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলমরী বা বিসল মরী আম্মা নাম্নী এক গ্রামদেবী আছেন। এই বিসলমরীই বাংলার বাসুলী দেবী। কেহ কেহ আবার বিশালাক্ষীর সঙ্গে বাসুলীকে অভিন্ন করে দেখেছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে; বাসুলীর সঙ্গে বিশালাক্ষীর কোন সাদৃশ্য নেই।

চণ্ডী নামে বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীদেবতার মধ্যে কোন এক বিশিষ্ট দেবতা হলেন মঙ্গলচণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে এই মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে। দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী হল কেন সে সম্পর্কে

সংস্কৃত পুরাণে অনেক উক্তি পাওয়া যায়। যথা—'মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা' অর্থাৎ মঙ্গলবিধানে যিনি দক্ষ তিনিই মঙ্গলচণ্ডী; মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পূজিতা হয়েছিলেন, বলে দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী; মঙ্গল নামক রাজা দেবীকে পূজা করেছিলেন, তাই দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গের কবিগণ—দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন প্রভৃতি চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত করেছেন যে, দেবী মঙ্গল নামক এক অসুরকে বধ করাতে তাঁর নাম হয় মঙ্গলচণ্ডী। এই কাহিনী, খুব সম্ভব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহিষাসুর বধের কাহিনীকে অনুসরণ করে রচিত হয়।

মঙ্গলচণ্ডী

বাংলাদেশে কোন্ সময় থেকে চণ্ডীপূজার প্রবর্তন হয় তা নির্ণয় করতে গেলে সাহিত্যিক প্রমাণ ও ভাস্কর্যের প্রমাণ এই উভয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রখ্যাত চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' নবদ্বীপের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

বাংলায় চণ্ডীপূজা

ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

বৃন্দাবন দাসের কাব্যরচনার কাল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি (১৫৪৮ খ্রীঃ)। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ষোড়শ শতকে মঙ্গলচণ্ডীর গীত সমাজে বিশেষ প্রচারলাভ করে।

ষোড়শ শতকের শেষভাগের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবির বন্দনা করেছেন:

মাণিক দত্তেরে বন্দো করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়॥

ইহাতে অনুমিত হয়, মাণিক দত্ত ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে কাব্যরচনা করেন। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে ষোড়শ শতকের প্রথম থেকে সমাজে মঙ্গলচণ্ডীর গীত বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এই গীত রচনার অন্তত দুই-তিন শ' বছর আগেই সমাজে চণ্ডীপূজার প্রবর্তন হয়।

পৌরাণিক চণ্ডীর মূর্তি নির্মাণের একটা আদর্শ ভাস্কর-সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। পরে এই আদর্শের সঙ্গে লৌকিক চণ্ডীর আদর্শ মিশ্রিত

হয়ে যায়। কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত দ্বাদশ শতকে প্রাপ্ত একটি মূর্তিতে দুর্গা ও চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীর একীভূত হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মূর্তিটিতে একটি গোধিকার মূর্তি আছে। ইহা ছাড়া চণ্ডীমূর্তির বিশেষ পরিপল্পনার নিদর্শনও লক্ষিত হয়। রাজশাহীর মান্দোয়েল হতে একাদশ শতকের একটি চণ্ডীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে; ইহাতে গোধিকা মূর্তিটি নেই। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে একটি চণ্ডীমূর্তি নির্মিত হয়েছিল; ইহাতে সিংহের সঙ্গে গজলক্ষ্মীর মত দুটি হস্তীও আছে। ইহাতে অনুমান হয়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্ব থেকে সমাজে দুর্গা ও চণ্ডীর পূজা প্রচলিত হয় এবং ক্রমে এই দুই দেবী পুরাণে ও সাহিত্যে এক হয়ে যান।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি—কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী। কালকেতুর কাহিনীতে দেবী চণ্ডীর ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনীতে মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য-প্রচার বিবৃত হয়েছে। চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী এক দেবতা নয়। চণ্ডী হলেন পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ব্যাধ কর্তৃক পূজিতা; আর মঙ্গলচণ্ডী হলেন নারীর ইষ্টদেবতা, হারাধন ফিরে পাওয়ার দেবতা। চণ্ডী অরণ্য দেবী, মঙ্গলচণ্ডী গৃহদেবী। পরবর্তিকালে পুরাণের প্রভাবে দুই দুই দেবীর কাহিনী একত্র এসে মিলিত হয়েছে।

কালকেতুর কাহিনী

কালকেতুর কাহিনীতে দেবী চণ্ডীর করুণা ব্যাধ কালকেতুর উপর বর্ষিত হয়েছে। কালকেতু শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর। চণ্ডী ছলে-বলে-কৌশলে কালকেতুকে দিয়ে মর্তে নিজের পূজা কেমন করে প্রচার করলেন তা নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে কালকেতুর কাহিনীতে।

ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ছিলেন শিবের পরম ভক্ত। চণ্ডী তাকে দিয়ে মর্তে নিজের পূজাপ্রচার করবেন বলে মনস্থ করলেন। শিবকে গিয়ে তিনি সেকথা খুলে বললেন এবং নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে মর্তে পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। শিব কিছুতেই রাজী হলেন না। চণ্ডী একটু মুশকিলেই পড়ে গেলেন। নীলাম্বর রোজ ফুল তুলে শিবের পূজা করত। চণ্ডী কীটরূপে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। নীলাম্বর দুর্ভাগ্য-বশত সেই ফুল তুলে শিবকে পূজা করল। চণ্ডী ফুলের মধ্য থেকে

বেরিয়ে এসে শিবকে দংশন করলেন। বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে শিব নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন, মর্তে ব্যাধের ঘরে গিয়ে তাকে জন্মাতে হবে। চণ্ডীর ইচ্ছা পূর্ণ হল।

শিবের অভিশাপে নীলাম্বর মর্তে ধর্মব্যাধের পুত্র কালকেতু রূপে জন্মগ্রহণ করল। সেই সঙ্গে নীলাম্বর-পত্নী ছায়াদেবীও স্বামীর অনুগামিনী হয়ে মর্তে ফুল্লরা রূপে অন্য এক ব্যাধগৃহে জন্মগ্রহণ করল। ব্যাধগৃহে কালকেতু দিনে দিনে শালকোঁড়ার মত বেড়ে উঠতে লাগল। বলে সে যেন মত্ত গজপতি, রূপে যেন সে রতিপতি। ক্রীড়াছলে কখন শশারু তাড়িয়ে ধরে, আবার বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে স্কন্ধে ভারবহন করে বীর ঘরে আসে। পুত্রের এই বিক্রম দেখে ধর্মকেতু শুভতিথি শুভবারে গণকঠাকুরকে ডেকে এনে তাকে ধনুর্বিদ্যায় দীক্ষা দিল।

এগার বছর বয়সে কালকেতু ফুল্লরাকে বিয়ে করল। ফুল্লরা যেমন সুন্দরী, তেমনি সুগৃহিণী। কালকেতু শিকার করে আনে, আর ফুল্লরা মাংসের পসরা নিয়ে হাটে বিক্রী করে। এভাবে কোনক্রমে তাঁদের দুঃখের সংসার চলতে থাকে। কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশুরা অধীর হয়ে পড়ল। তারা সকলে মিলে চণ্ডীর কাছে কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। চণ্ডী তাদের অভয় দিলেন। চণ্ডী একদিন ছলনা করে বনের সব পশু লুকিয়ে রাখলেন এবং নিজে স্বর্ণগোধিকার (গো-সাপ) রূপ ধারণ করে কালকেতুর যাত্রাপথে অবস্থান করে রইলেন। কালকেতু পথে যেতে গোধিকাকে দেখে অশুভ লক্ষণ মনে করল। ক্রুদ্ধ হয়ে গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে রাখল এবং প্রতিজ্ঞা করল যদি সারাদিনে কোন শিকার না জোটে তাহলে ঐ গোধিকার মাংসই বাড়ীতে গিয়ে ভক্ষণ করবে। সারাদিন বনে ঘুরে সেদিন আর কালকেতু শিকার সন্ধান করতে পারল না। হতাশ হয়ে গোধিকাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ী ফিরল। স্বামীকে খালি হাতে ফিরতে দেখে ফুল্লরা কেঁদে ফেলল। কালকেতু ফুল্লরাকে গোধিকার মাংস রান্না করতে বলে বাসি মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে চলে গেল। ফুল্লরাও ক্ষুদ ধার করার জন্য পাশের বাড়ীতে গেল।

ইত্যবসরে গোধিকা-রূপিণী চণ্ডী এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর রূপ গ্রহণ করলেন। ফুল্লরা ঘরে ফিরে ত অবাক। কোথা থেকে এল এই

সুন্দরী যুবতী! যুবতী ফুল্লরাকে বললেন,—'আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে, আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজগুণে'। ফুল্লরা বিপদ গণল। সে দেবীকে চলে যাওয়ার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করল, বারমাসের দুঃখ-কথা নিবেদন করল। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কালকেতু গৃহে ফিরে এল। চণ্ডীর লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখে সেও আশ্চর্য হয়ে গেল। কালকেতু দেবীকে ঘর থেকে যাওয়ার জন্য প্রথমে অনুরোধ জানাল; তাতেও যখন কোন ফল হল না, তখন সে ক্রোধান্ধ হয়ে দেবীকে শরবিদ্ধ করতে উদ্যত হল। দেবী এবার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। দম্পতীর চরিত্রোৎকর্ষে দেবী মুগ্ধ হলেন। তিনি কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও একটি আংটি দিলেন। চণ্ডীর আদেশে কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর নির্মাণ করল। কালকেতুর অধস্তন কর্মচারী ভাঁড়ু দত্ত অত্যন্ত শঠ প্রকৃতির মানুষ ছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করে কালকেতুর বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করল। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে কালকেতু কারারুদ্ধ হল। কারাগারে থেকে কালকেতু চণ্ডীর স্তব শুরু করল। দেবী প্রসন্ন হলেন। দেবীর স্বপ্নাদেশে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে সসম্মানে মুক্তি দান করল। কালকেতু আবার সুখে রাজত্ব করতে লাগল। তারপর একদিন কালকেতু মর্তের মায়া কাটিয়ে সস্ত্রীক স্বর্গে ফিরে গেল।

উজানী নগরে ধনপতি সওদাগর নামে এক বণিক ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী—লহনা ও খুল্লনা। খুল্লনা হলেন স্বর্গের অভিশপ্তা অপ্সরা রত্নমালা। ধনপতি কেমন করে খুল্লনাকে বিয়ে করলেন তার একটা চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনীতে।

ধনপতি সদাগরের কাহিনী

ধনপতি একদিন জনার্দন ওঝার সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে পায়রা ওড়াচ্ছিলেন। পায়রাটি শ্যেন পক্ষীর ভয়ে খুল্লনার কাপড়ের আঁচলের মধ্যে আশ্রয় নিল। ধনপতি খুল্লনাকে পায়রাটি ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু খুল্লনা ধনপতিকে খুড়তুত ভগিনীপতি মনে করে একটু রসিকতা করে পায়রাটি নিয়ে চলে গেল। ধনপতি খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। খুল্লনাকে তিনি বিয়ে করলেন। লহনা এতে একটু বিব্রত বোধ করল।

বিয়ের পর ধনপতিকে শুকপক্ষীর স্বর্ণপিঞ্জর আনতে গৌড়ে যেতে

হল। যাওয়ার আগে সওদাগর খুল্লনায় দেখাশুনার ভার লহনার উপরে দিয়ে গেলেন। স্বামীর কথামত লহনা খুল্লনাকে স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগল কিন্তু এই সদ্‌ভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। দুর্বলা নাম্নী এক দাসীর কুপরামর্শে লহনা খুল্লনার উপর নানাপ্রকার নির্যাতন শুরু করল। স্বামীর এক জালচিঠি নিয়ে লহনা খুল্লনাকে দেখাল। তাতে লেখা রয়েছে,—চিঠি পাওয়ার পর খুল্লনাকে ছাগল চরাতে হবে, ঢেঁকিশালে গিয়ে শয়ন করতে হবে, আধপেটা আহার করতে হবে, ছেঁড়া কাপড় পরতে হবে। ব্যাপারটা খুল্লনার কাছে আজগুবী বলেই মনে হল। সে বুঝতে পারল চিঠিটা তাঁর স্বামীর লেখা নয়। কিন্তু ঝগড়া-বিবাদে লহনার কাছে পেরে না উঠে খুল্লনাকে চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হতে হল। খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরিয়ে বেড়াতে লাগল। বসন্তের সমাগমে খুল্লনার হৃদয়ে নিদারুণ স্বামীবিরহ জাগল। একদিন ক্লান্ত হয়ে খুল্লনা নিদ্রা যাচ্ছে। এমন সময় শৃগালে তার সব ছাগল খেয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে ছাগলগুলিকে না দেখে খুল্লনা খুব ভয় পেল। ছাগল খুঁজতে সে বেরিয়ে পড়ল। পথে পঞ্চ দেবকন্যার সঙ্গে তার দেখা। তারা খুল্লনাকে মঙ্গলচণ্ডীর স্তব করতে বলল। বনমধ্যে খুল্লনা চণ্ডীপূজা করল। চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়ে খুল্লনাকে স্বামীপুত্র-লাভের বর দিলেন এবং খুল্লনার আদর-যত্ন করার জন্য লহনাকে স্বপ্নাদেশ করলেন। চণ্ডী ধনপতিকেও খুল্লনার উপর লহনার অত্যাচারের কথা জানালেন।

খুল্লনা ঘরে ফিরে এল। লহনা পূর্বের মতই তাকে আবার আদর-যত্ন করতে লাগল। ধনপতিও গৃহে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে অনেক আত্মীয়-স্বজন এলেন। এখন মালা-চন্দন দেওয়া নিয়ে গণ্ডগোল উপস্থিত হল। খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরিয়ে বেড়াত; কাজেই সকলে তার সতীত্বে সন্দেহ করলেন। তাঁরা ধনপতিকে বললেন, সতীত্বের পরীক্ষায় খুল্লনা উত্তীর্ণ না হলে কেউই অন্নগ্রহণ করবেন না, ধনপতিকে একলক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

ইহাতে সওদাগর লহনার গর্হিত আচরণের জন্য তাকে অনেক ভৎর্সনা করলেন এবং দুর্মুখ আত্মীয়-স্বজনের মুখ বন্ধ করার জন্য লক্ষ টাকা দিতে রাজী হলেন। কিন্তু খুল্লনার মন এতে সায় দিল না। সে

পরীক্ষা দিতে সম্মত হল। সীতার চেয়েও আরও ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল খুল্লনাকে। সাপকে দিয়ে তাকে দংশন করান হল, তপ্ত লৌহদণ্ড দিয়ে তাকে বিদ্ধ করা হল, শেষে জতুগৃহে রেখে তাকে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সতীত্বের পরীক্ষায় খুল্লনা জয়ী হল।

সওদাগর এরপর চললেন সিংহলে। গর্ভবতী খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলের জন্য ঘট স্থাপন করে চণ্ডীকে পূজা করল। শিবভক্ত ধনপতি তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে লাথি মেরে চণ্ডীর ঘট ভেঙ্গে দিলেন। সপ্ত ডিঙ্গা সাজিয়ে ধনপতি সিংহল অভিমুখে রওনা হলেন। চণ্ডী এবার প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পেলেন। তিনি অকূল সমুদ্রের মধ্যে সওদাগরের ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দিলেন। মধুকর ডিঙা নিয়ে অনেক কষ্টে সওদাগর এগিয়ে চললেন। সিংহলের পথে চণ্ডী আবার ধনপতিকে 'কমলে-কামিনী'র মূর্তি[১] দেখালেন। কমলবনে পদ্মের উপর বসে এক সুন্দরী রমণী একটি করে হাতী গিলছেন, আর উগরে ফেলছেন। ইহাই চণ্ডীর 'কমলে-কামিনী' রূপ। ধনপতি সিংহলে গিয়ে রাজার কাছে এ অদ্ভুত দৃশ্য বর্ণনা করলেন। সিংহলরাজ এব্যাপার আদৌ বিশ্বাস করলেন না। শেষে বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, ধনপতি যদি 'কমলে-কামিনী' দেখাতে পারেন তাহলে তাঁকে অর্ধেক রাজত্ব দেবেন, অন্যথায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ধনপতি স্বীকৃত হলেন। কিন্তু চণ্ডীর ছলনা ধনপতি বুঝতে পারেননি। রাজাকে তিনি 'কমলে-কামিনী' দেখাতে পারলেন না। ধনপতিকে সিংহলে কারারুদ্ধ হয়ে থাকতে হল।

এদিকে ধনপতির পুত্র, খুল্লনার গর্ভজাত সন্তান, শ্রীমন্ত (শাপভ্রষ্ট মালাধর) বড় হয়ে পড়ল। মায়ের অনুমতি নিয়ে সে একদিন বাবার খোঁজে সপ্ত ডিঙ্গা নিয়ে সিংহল যাত্রা করল। শ্রীমন্তও যাওয়ার পথে 'কমলে-কামিনী'র অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রাজাকে বলল। রাজা কিছুতেই তার কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি শ্রীমন্তকে বললেন, সে যদি রাজাকে ঐ দৃশ্য

১। 'কমলে-কামিনী' পরিকল্পনা একেবারে অবাস্তব নহে। আসলে ইহা সমুদ্র-মরীচিকা। সমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত হলে অনেক সময় সমুদ্রের উপর অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। ইহাই সমুদ্র-মরীচিকা।

রচনা করেন। ভণিতাতে কবি কোথায়ও বলেছেন, 'দ্বিজমাধব গায় সারদা চরিত' আবার কোথায়ও বলেছেন, 'দ্বিজমাধবে গায় সারদা-মঙ্গল'। ইহাতে বোঝা যায়, কবির কাব্যের নাম 'সারদা-চরিত' কিংবা 'সারদা-মঙ্গল' ছিল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বাস্তবচিত্র অঙ্কনের প্রতি কবিদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। দ্বিজমাধবের মধ্যে এই চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার সম্যক্ স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় না। রসসৃষ্টির চেয়ে তথ্যসংগ্রহের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকেছিলেন। মুকুন্দরাম যেমন বস্তুকে একটা শিল্পরূপের মর্যাদা দান করেছিলেন, দ্বিজমাধব তেমন পারেননি। তবে, বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের ছবি দ্বিজমাধবের কাব্যে বেশ সজীব হয়ে উঠেছে। যেমন, লহনার সপত্নী-বিদ্বেষের চিত্রটি :

খুল্লনা বসিলা ছেলী থুইয়া অজাশালে।
মানের পাতে লহনায় ক্ষুদের অন্ন বাড়ে॥
অল্প অন্ন দিল ছেছা পোড়া বহুল।
পাট শাক রান্ধি দিল পাকা কলার মূল॥
ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী।
ভোজন করিতে বৈসে খুলনা বাণ্যানী॥
অন্ন লইয়া লহনায় দুহাতে ধরে পাত।
খুলনারে দিল নিয়া ঢেঁকিশালে ভাত॥
ছেছা পোড়া অন্ন দেখি নাড়ি চাড়ি চায়।
ক্ষুধার কারণে রামা তাহা কিছু খায়॥

* * *

খুলনায় বলে দিদি গায়ে মোর জ্বর।
হস্ত দিয়া চাহ মোর ললাট উপর॥
অবসাদ মাত্র দেয় আজি না যাইমু।
কালিকা প্রভাতে দিদি ছেলী লইয়া যাইমু॥
লহনায় বলে বিটি লজ্জা নাই তোর গায়।
আপনা গৌরব রাখি ছেলী লইয়া যায়॥
লহনার বাক্যে রামা সহিতে না পারে।
ছাগল লইয়া চলে কানন ভিতরে॥

চরিত্র সৃষ্টিতে দ্বিজমাধব উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে মাঝে মাঝে একটু হাস্যকৌতুকের ছটায় রচনাকে সরস করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, লহনা খুল্লনার মাছের মুড়ো খাওয়ার দৃশ্যটি :

খুল্লনায়ে বলে দিদি মুড়া খাও তুমি।
তবে এক লক্ষ ধন পাইব যে আমি॥
ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি কেহ নাহি খায়।
মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চক্ষে চায়॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে।
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ী পিছে॥

দুঃখ বর্ণনায় কবি কোন কোন স্থলে বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। যেমন, 'সুশীলার বারমাস্যা'তে ভাদ্র মাসের দুঃখ বর্ণনা :

কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভাদ্র মাসে।
হেনকালে যাইতে চাহ দূর পরদেশে॥
কিরূপে বঞ্চিমু মুঞি অভাগিনী নারী।
রান্ধিয়া যোগাইমু অন্ন কেঅ সঙ্গে করি॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির জন্য তাঁর উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কণ'। কাব্যমধ্যে কবি কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করে যাননি।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

আত্মপরিচয় দান কালে তিনি কিছু কিছু ঐতিহাসিক-তথ্য পরিবেশন করে গিয়েছেন; এখন ইহাই একমাত্র ভরসা। আত্মবিবরণীতে কবি মানসিংহকে 'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' বলেছেন। মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীঃ অঃ থেকে ১৬০৬ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। কাজেই মুকুন্দরাম ইহার মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে কাব্যরচনা করে থাকবেন।

মুকুন্দরামের কাব্যের নাম, খুব সম্ভব, 'অভয়া-মঙ্গল' ছিল। কবি কাব্যের কোন স্থানে 'অম্বিকা-মঙ্গল,' কোন স্থানে 'গৌরী-মঙ্গল', কোন স্থানে 'চণ্ডিকা-মঙ্গল' নামের ব্যবহার করেছেন। তবে, 'অভয়া-মঙ্গল' নামটি বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মত মুকুন্দরামও আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ইহা মামুলি ধরনের নহে। ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র পটভূমিকায় কবি

সে-যুগের একটা সামগ্রিক পরিচয় উজ্জ্বল করে তুলেছেন। অন্তরের দুঃখ-ক্ষোভ কোথাও উগ্রমূর্তি ধারণ করেনি। একটা সুস্থির চিত্তের গভীর প্রশান্তি সর্বত্রই বিরাজিত। আত্মবিবরণীতে কবি বলেছেন,—ছয়-সাত পুরুষ ধরে তাঁরা দামুন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি চাষ করে খাচ্ছেন। রাজা মানসিংহ তখন গৌড়-বঙ্গের অধিপ। তাঁর প্রধান কর্মচারী মামুদ সরিপ, প্রজাদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার শুরু করল। তখন উজির, সরকারী কর্মচারী, পোদ্দার—এদেরও সুদিন এল :

উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হইলা কাল খিলভূমি[১] লেখে লাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥

বিপাকে পড়ে গোপীনাথ বন্দী হলেন, তাঁর সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। দেশে অকাল উপস্থিত হল। কবি ভাই রামনাথ, শিশুপুত্র ও এক অনুচর দামোদরকে নিয়ে মেদিনীপুরের দিকে রওনা হলেন। পথে রূপ রায় নামে এক ডাকাত কবির সর্বস্ব অপহরণ করে নিল। কোনক্রমে কবি গোড়াই নদী পার হয়ে, ভেঙ্গুটিয়া গ্রাম ছেড়ে, দারুকেশ্বর-নারায়ণ-পরাশর-দামোদর প্রভৃতি নদী অতিক্রম করে কুচট্টা নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁকে তৈল বিনা স্নান করতে হল, অন্নাভাবে জলপান করতে হল। শিশুটি ভাত খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি ধরল। ক্ষুধা-ভয়-পরিশ্রমে কবি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় চণ্ডী এসে স্বপ্নে কবিকে দেখা দিলেন, তাঁকে মন্ত্র দান করলেন এবং নিজ মহিমা-কীর্তন করে কাব্যরচনার নির্দেশ দিলেন। কবি তারপর শিলাই-নদী পার হয়ে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ-ভূমি জমিদার বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হলেন। বাঁকুড়া রায় কবির বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজপুত্র

১। অনাবাদী জমি।

রঘুনাথের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। বাঁকুড়া রায় কিছুকাল পরে মারা গেলেন, তাঁর পুত্র রঘুনাথ রাজা হলেন। কিন্তু কবি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশের কথা ভুলেই গেলেন। শেষে তাঁর অনুচর [illegible] মন্ত্রী তাঁকে আবার কাব্যরচনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কবি দীর্ঘদিনের অতন্দ্র সাধনার পর ‘অভয়া মঙ্গল’ রচনা করলেন।

মুকুন্দরামের ধর্মমত নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কেহ বলেন, তিনি বৈষ্ণব; কেহ বলেন, তিনি শৈব, কেহ বলেন তিনি শাক্ত, আবার কেহ বলেন তিনি পঞ্চোপাসক অর্থাৎ গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু শিব ও দুর্গা এই পাঁচটি প্রধান দেবতার উপাসক। মুকুন্দরামের কাব্যে গণেশ, সরস্বতী, মহাদেব, লক্ষ্মী, শ্রীরাম, চণ্ডী প্রভৃতি দেবতা এবং চৈতন্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে কবিকঙ্কণ কাব্য রচনা করেন। সে-সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল বন্যায় শুধু নদে-শান্তিপুর নয়, সমগ্র বাংলাদেশ ভেসে গিয়েছিল। বৈষ্ণব মত প্রবল হওয়ার পূর্বে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সমাজে স্মার্ত আচার, পুরাণ-কেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাস, শৈব ও শাক্তমতের বিশেষ প্রাচুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। এ অবস্থায় কোন সজ্জন ব্যক্তির ধর্মমত মিশ্র না হয়ে পারে না। মুকুন্দরামের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। কবিরা পুরুষানুক্রমে শৈব। শিবের কৃপায় তিনি কবি হয়েছেন, সে-কথা তিনি আত্মকথায় বলেছেন। আবার কবি বলেছেন যে, তাঁর পিতামহ জগন্নাথ মৎস্য-মাংস ছেড়ে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র জপ করতেন। ইহাতে বোঝা যাচ্ছে, জগন্নাথ পরম বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও স্বীকার করতে হবে, তাঁদের বংশ প্রধানত শৈব বংশ। মুকুন্দরামের কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি, তিনি শাক্ত দেবী। কবি আবার তাঁকে পরম বৈষ্ণবীও বলেছেন। আরো বিস্ময়ের বিষয়, কবি শাক্তকাব্যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্তের মত পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে চৈতন্যবন্দনা করেছেন :

অবনীতে অবতরি চৈতন্যরূপেতে হরি
বন্দিব সন্ন্যাসিশিরোমণি।
নদীয়া-নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচীঠাকুরাণী ॥

* * *

সার্বভৌম সান্দীপনি ভট্টাচার্য শিরোমণি
ষড়্ভুজ দেখি কৈল স্তুতি।
প্রেম-ভক্তি-কল্পতরু অখিল জীবের গুরু
গুরু কৈল কেশব ভারতী॥

* * *

সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর ভুবন-লোচন-চৌর
করঙ্গ-কৌপীন-দণ্ডধারী।
নয়নে গলয়ে লোর গলে দোলে প্রেমডোর
সতত বলেন হরি হরি॥

ইহা ছাড়া কবি কাব্যের অনেক স্থলে হরি, বিষ্ণু, কৃষ্ণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে বৈষ্ণবপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মুকুন্দরামের কুলধর্ম ছিল শৈব, কিন্তু তাঁর কাব্যের দেবতা হল শক্তি; আবার ভাবাদর্শের দিক থেকে তিনি হলেন বৈষ্ণব। তাই মুকুন্দরামের ধর্মমত সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। আসলে তাঁর ধর্মমত ছিল মিশ্র। তা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমস্থল—সেখানে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের ধারা এসে একত্র মিলিত হয়েছে।

মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে কেউ তাঁকে বলেছেন বাস্তববাদী, আবার কেউ তাঁকে বলেছেন দুঃখবাদী। সমালোচকগণের এই অভিমত কতখানি গ্রাহ্য তা একবার বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে একটা বাস্তবসম্মত রূপ দান করার জন্য একা মুকুন্দরাম কেবল প্রশংসার অধিকারী হতে পারেন না। তাঁর পূর্ববর্তী কবিগণ ইহার একটা সুসম্পূর্ণ রূপ দান করে গিয়েছেন। চণ্ডী-মঙ্গলের আদি কবি মাণিকদত্তকে এজন্য মুকুন্দরাম বন্দনা করেছেন। দ্বিজমাধবের কাছে কবি ঋণী ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। মুকুন্দরামের সঙ্গে হয়তো দ্বিজমাধবের কোন যোগ ছিল না। মুকুন্দরামের কিছু পূর্বে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বিজমাধব কবি হিসেবে অসাধারণ না হলেও, তাঁর কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী সম্পূর্ণতা লাভ করে। তথাপি মুকুন্দরামের কাহিনী গ্রন্থনের নৈপুণ্য, জীবন সম্পর্কে একটা দার্শনিক বোধ, চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক সহানুভূতির যে নিবিড় পরিচয় লাভ করা যায় সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে

তার তুলনা নেই। কবির এই বাস্তববোধের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেছেন,—"The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature.[১]

কিন্তু কবি কেবল বস্তুস্বভাবের নিখুঁত বর্ণনাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেননি, সেইসঙ্গে তিনি তাকে জীবনরসে জারিত করে পাঠক-শ্রোতার উপভোগ্য করে তুলেছেন। "মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ, যে স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রচুর জীবনরস-রসিকতা পাওয়া যায় তাহা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহার কৃতিত্ব কেবল বস্তুসঞ্চয়ে নহে, বাস্তব-রসের পরিবেশন-নৈপুণ্যে, তাঁহার কাব্য হইতে কেবল যে সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহা নহে, ইহাতে সমাজজীবনের স্বচ্ছন্দ-লীলায়িত গতিচ্ছন্দ, ইহার বহির্ঘটনার অন্তরালশায়ী মর্মস্পন্দন চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দরাম যে সহজ কৌতুক ও সুস্থ, বলিষ্ঠ উপভোগশক্তির সহিত তাঁহার আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে আমরা আমাদের সাধারণ ঘরোয়া জীবনকে নতুনভাবে আস্বাদন করিতে শিখিয়াছি। তাঁহার প্রসন্ন কৌতুকপ্রিয়তা, বঙ্কিম কটাক্ষ, ঈষৎ তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গী দারিদ্রের ঊষর উপরিভাগের অভ্যন্তরে যে রসনির্ঝর প্রচ্ছন্ন আছে, তাহাই আবিষ্কার করিয়াছে।"[২]

মুকুন্দরামের কাব্যে উপন্যাস-রচনার প্রচুর সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস-সাহিত্য মূলত বস্তুতান্ত্রিক। যে স্বাভাবিক জীবনস্রোত ধরণীর পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, অরণ্য-প্রান্তর, গ্রাম-নগরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে তারই একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দান করা ঔপন্যাসিকের কাজ। ইহার জন্য প্রয়োজন নিপুণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে স্থির প্রত্যয়, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি। মুকুন্দরামের মধ্যে ঔপন্যাসিকের এ-সকল গুণ অল্পবিস্তর বিদ্যমান ছিল।

মুকুন্দরামকে কেহ কেহ দুঃখবাদী কবি বলে গ্রহণ করতে চান।

১। The Literature of Bengal—R. C, Datta.

২। ভূমিকা (কবিকঙ্কণ চণ্ডী) —ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি ব্যক্তিজীবনে যে অত্যাচার-নিপীড়ন, দুঃখ পরিতাপ সহ্য করেছেন কাব্যের মধ্যে তা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই অভিমতের সত্যতা সন্দেহের অতীত নহে। কাব্যের মধ্যে দুঃখের নিপুণ বর্ণনা বা গভীর অনুভূতি থাকলে কবিকে দুঃখবাদী বলা যায় না। দুঃখকে একমাত্র সত্য ভেবে জীবনের শান্ত-স্নিগ্ধ-মধুর রূপকে যারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, নৈরাশ্যের তাড়নায় জগতের কোন কিছুর উপরে যারা আস্থা রাখতে পারে না দুঃখবাদী আসলে তারাই। মুকুন্দরাম জীবনে অনেক দুঃখ-তাপ পেয়েছিলেন; কাব্যে তার উল্লেখও আছে। কিন্তু তার জন্য কবিকে কোথাও দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে বা কপালে করাঘাত করে হাহাধ্বনিতে ফেটে পড়তে দেখা যায়নি। মামুদ সরিপের অত্যাচারে কবিকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, পথিমধ্যে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে সর্বস্ব খোয়াতে হয়েছে, কুচট্যা নগরে পৌঁছে তাঁকে তৈল বিনা স্নান এবং অন্নাভাবে উদক পানও করতে হয়েছে। তথাপি কবিচিত্ত অশ্রুবাষ্পোচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েনি। চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ লাভ করে তিনি আশায় বুক বেঁধে কাব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

বন্যপশুদের অভিযোগের মধ্যে কেহ কেহ কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। বনের ভালুক দেবীর কাছে এই বলে দুঃখ করেছে—"বনে থাকি বনে খাই বনের ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।" চণ্ডীর কাছে ভালুকের এই উক্তির তাৎপর্য হল এই যে, অত্যাচার জমিদার-ডিহিদার শ্রেণীর উপর অনুষ্ঠিত হলে সঙ্গত হয়, তা সাধারণ পশু বা মানুষের উপর অনুষ্ঠিত হলে সঙ্গত হয় না। কবি যদি ভালুকের মধ্যে দিয়েই নিজের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা এখানে প্রকাশ করে থাকেন তাহলে তা ব্যক্তিসীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, তা সার্বজনীন মানববেদনাতে পরিণত হয়েছে।

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ বর্ণনাতেও কেহ কেহ কবির দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু একটা কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে, যুবতী-বেশিনী চণ্ডীকে ঘর হতে বিদায় দেওয়ার জন্য ফুল্লরা তাঁর কাছে বারমাসের দুঃখ বর্ণনা করেছে। দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে হয়ত যুবতী সহজেই তাদের ঘর ছেড়ে চলে যাবেন। তাহলে ফুল্লরাকে স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা হতে হবে না। এজন্যই ফুল্লরার দুঃখ-কষ্টকে একটু

দীর্ঘ-প্রসারিত করেই বলতে হয়েছে। তা না হলে যার ঘরের ভেরেণ্ডার খুঁটি কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে তার ঘরে অবিচল শান্তি ও সন্তোষ বিরাজ করতে পারে না। যে কবি দরিদ্র কালকেতুর অন্নের গ্রাসকে 'তে-আটিয়া-তালে'র সঙ্গে তুলনা করে রসিকতা করেন, তিনি যে অভাব-অনটনে মুহ্যমান হয়ে পড়বেন এমন মনে হয় না।

চরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দরাম অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক উপন্যাস-শিল্পীর মত নিপুণ বাস্তবজ্ঞান ও সূক্ষ্ম দার্শনিক শক্তির দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দৈব চরিত্রগুলির উপর মনুষ্যের গুণ-ধর্ম আরোপ করে তাদের তিনি একেবারে মানুষের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছেন। যে-যুগে মানুষ দেব-দেবীর লীলাকথা শুনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত, অন্য কথায় কান দিতে চাইত না, সে-যুগে জন্মগ্রহণ করে মানুষের চরিত্র-কথা বর্ণনা করা কম দুঃসাহসের পরিচায়ক নহে। সমগ্র মধ্যযুগীয়-সাহিত্যে মুকুন্দরাম সেকারণে অনন্যসাধারণ।

প্রথমে তাঁর পুরুষ চরিত্রগুলির কথা আলোচনা করা যাক। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে কালকেতুর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে :

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
মাতঙ্গ জিনিয়া গতি রূপে জিনি রতিপতি
সবার লোচন সুখ-হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল।
রূপে গুণে শীলে বাড়া বাড়ে যেন শাল-কোঁড়া
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল ॥

ভাস্কর যেমন মূর্তির নাক-মুখ-চক্ষু-কান ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে কুন্দে কুন্দে নির্মাণ করে, তেমনি এখানে কবি কালকেতুর বাল্যরূপ বর্ণনা করার জন্য কত নিশিই না জেগে জেগে কাটিয়েছেন। রূপে-গুণে কালকেতু এখানে আর ব্যাধনন্দন নয়, ক্ষত্রিয়কুল-গর্ব সিংহ-শিশু।

কালকেতু-চরিত্রটি আমাদের মহাভারতের ভীমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভীম ছিলেন যেমন পরাক্রমশালী, তেমনি ভোজনবিলাসী। কালকেতুকে তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম বলে মনে হয় না। হাতী-সিংহ-বাঘ-ভাল্লুক সবই তার হাতের ক্রীড়নক। গরীব ব্যাধের ছেলে এত

বলশক্তি পায় কোথা থেকে? এ-প্রশ্নের সমাধান আছে কালকেতুর ভোজন-দৃশ্য বর্ণনায়:

মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া।
কচুর সহিত খায় করঞ্জা আমড়া॥
অম্বল খাইয়া বীর বনিতারে পুছে॥
রন্ধন করাছ ভাল আর কিছু আছে॥
এন্যাছি হরিণী দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া অন্ন বীর খায় তিন হাঁড়ি॥
শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোটগ্রাস তোলে যেন তেঁয়াটিয়া তাল॥

পুরুষকারের জলন্ত বিগ্রহ চাঁদসওদাগরের কাছে চেঙ্গমুড়ি কানি মনসা যেমন অনেক সময় নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, কালকেতুর সাধারণ মনুষ্য বৃত্তিতে দেবী চণ্ডীর মহিমা কোন কোন ক্ষেত্রে তেমনি সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যেমন, দেবী এক ঘড়া ধন কাঁথে করে বীরের পিছনে পিছনে আসছেন, আর কালকেতু বারে বারে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, যাতে দেবী ধন নিয়ে চম্পট না দিতে পারেন:

পশ্চাতে চণ্ডিকা যান আগে কালু যায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছুপানে চায়॥
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন ঘড়া নিয়া পাছে পালায় পার্বতী॥

কালকেতুর চরিত্রোৎকর্ষের পরিচয়টি কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরনারীর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। বুঝি নিয়তির পরিহাস। তাই চণ্ডী কালকেতুকে ছলনা করার জন্য পরম রূপসীবেশে কালকেতুর গৃহে উপস্থিত হলেন। ফুল্লরা-সুন্দরী যুবতীকে দেখে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে শেষে কালকেতুকে সন্দেহ করল। তার ধারণা তার স্বামীই তাঁকে নিয়ে এসেছে। ফুল্লরা এভাবে কিছু না জেনে-শুনে

কালকেতুকে অকারণ কটূক্তি করল। কালকেতু তখন ফুল্লরাকে বুঝিয়ে বলল :

শুন শুন আল প্রিয়ে বচন আমার।
আমার যেমন মতি গোচর তোমার॥
অতি শিশুকালে বিভা করিনু তোমারে।
মোর ভাল-মন্দ তুমি জানহ অন্তরে॥
পরের রমণী দেখি হেঁট করি মাথা।
তবে কেনে এত মোরে বল কটূকথা॥

কালকেতু দেবীকে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে গেল। বুঝতেই পারল না কেন তিনি এসেছেন। দেবীর আসার কারণ কালকেতু জিজ্ঞাসা করল। ঘর থেকে তাঁকে চলে যেতে বলল। কিন্তু দেবী কোন উত্তরই দিলেন না। ইহাতে কালকেতু ঈষৎ কুপিত হয়ে বলল :

ছাড় এই স্থান মাগো ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥
একেলা যুবতী তুমি ছাড় নিজ ঘর।
উচিত বলিতে কেন না দেহ উত্তর॥
বড়র বহুরী তুমি বড়লোকের ঝি।
বুঝিয়া ব্যাধের ভাব তোমার লাভ কি॥

ইহাতেও দেবী যখন উঠলেন না বা কোন উত্তর দিলেন না, তখন কালকেতু—

শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্মাণ॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
বলবুদ্ধিহত হৈল আক্ষটা-নন্দন॥

কালকেতুর বীরত্ব, চরিত্রোৎকর্ষ নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেও কবি কিন্তু ইহার শেষ রক্ষা করতে পারেননি। যে কালকেতুকে দেখে বনের হাতী-গণ্ডার, সিংহ-বাঘ ভয়ে থরহরি কম্পমান, সেই কালকেতুকে যখন কলিঙ্গরাজের কাছে পরাজিত হয়ে ধান্যগৃহে আশ্রয় নিতে দেখি তখন তার প্রতি আমাদের মনে আর কোন সহানুভূতির ভাব জাগে না।

মুরারি শীলের চরিত্রটি মুকুন্দরামের নিজস্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রটির

সন্ধান ইতিপূর্বে কোন কবির কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়নি। কালকেতুর দেবীপ্রদত্ত অঙ্গুরীয় বিক্রয়ের সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুরারির চরিত্রটি বিকাশ লাভ করেছে। মুরারি জাতিতে বেনে, স্বভাবে খল কপট ধূর্ত। ধনের বাসে খিড়কীর পথে প্রথম তাকে প্রবেশ করতে দেখা যায়। কালকেতু মুরারির কাছে তার অভিপ্রায় জানাল :

খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হয়্যা মোরে অনুকূল, উচিত করিবে মূল,
বিপদ সমুদ্রে যেন তরি ॥

ধূর্ত মুরারি মূল্যবান অঙ্গুরী হাতে পেয়ে লোভ সংবরণ করতে পারল না। কালকেতুকে ঠকিয়ে কেমন করে সে সস্তায় অঙ্গুরীটি কিনে নিবে সেই চিন্তাই সে করতে লাগল। শেষে অঙ্গুরীটি হাতে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শেষকালে একটু তিরস্কারের সুরে সে বলল,—

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জল ॥

তারপর সে একটা ইহার দর-দস্তরও করে ফেলল,—

রতি প্রতি হয় যদি দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর ॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি ॥
একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ॥

মুরারি ভাবল কালকেতু এতেই সন্তুষ্ট হবে। দরিদ্র ব্যাধের ছেলে রত্নের মূল্য আর কি বুঝবে! কিন্তু ফল হল ঠিক তার উলটো। কালকেতুর দৃঢ় বিশ্বাস দেবী প্রদত্ত অঙ্গুরীর মূল্য কখন কম হতে পারে না। মুরারিকে তাই সে সরাসরি জানিয়ে দিল,—'খুড়া, মূল্য নাহি চাই। যে জন দিয়েছে বস্তু দিব তার ঠাঁই'। নিরুপায় হয়ে মুরারি তখন কালকেতুকে লক্ষ্য করে শেষ বাণ নিক্ষেপ করল :

ধর্মকেতু দাদা সনে কৈলুঁ লেনাদেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো হয়্যাছ সেয়ানা ॥

কালকেতু মুরারির এই কথায় কর্ণপাত মাত্র না করে সহজ ভাবেই বলল,—'অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া।' মুরারি এতক্ষণে বুঝতে পারল, কালকেতু সত্যই 'সেয়ানা'; তার কাছে তার কোন জারিজুরি আর খাটবে না। নিজের ভুল সংশোধন করার অভিপ্রায়ে সে গালভরা হাসি হেসে কালকেতুকে বলল,—'এতক্ষণ পরিহাস কৈলুঁ ভাইপোরে'। বেনিয়া জাতি সরলপ্রাণ মানুষকে যে কিভাবে পথে বসায় তার একটি নজির পাওয়া গেল মুরারির চরিত্রে।

মুকুন্দরামের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি হল ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটি। ভাঁড়ু জাতিতে কায়স্থ হলেও, স্বভাবের দিক থেকে সে নীচ, ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক। কালকেতু বন কেটে গুজরাট নগর পত্তন করলে ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর নিকট আগমন করে। ভাঁড়ু লোকে যে বিশেষ সুবিধার নয় তা তার এই প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়। কাঁচকলার ভেট নিয়ে ভাঁড়ু কালকেতুর সম্মুখে উপস্থিত হল। তারপর—

প্রণাম করিয়া ধীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছেঁড়া কম্বলেতে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া॥

নিজের বংশমর্যাদার পরিচয় দিয়ে ভাঁড়ু কালকেতুর কাছে তার অভিপ্রায় জানাল:

হাল বলদ দিবে খুড়া দিবে হে বিছন-পুড়া
ভাল্যা খাত্যে ঢেঁকী কুলা দিবে।
আমি পাত্র রাজা তুমি আগে পূজা পাব আমি
পরিণামে ভাঁড়ুরে জানিবে॥

কালকেতুর অনুগ্রহ লাভের পর ভাঁড়ুকে জানতে আর বেশি দেরী হল না। হাটুরিয়াদের নিকট তোলা দাবি ও তাদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের কথা কালকেতুর কর্ণগোচর হল। ভাঁড়ু কালকেতুর কাছে নিজেকে মণ্ডল বলে পরিচয় দিলে কালকেতু তাকে তিরস্কার করল এই বলে,—

মণ্ডল বলাতে তোর মুখে নাহি লাজ।
খর্ব হয়্যা ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ॥

প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলি ঠকা করিয়া কন্দল ॥

কালকেতুর এই ভৎর্সনায় ভাঁড়ু ক্রোধে ঈর্ষায় দগ্ধীভূত হতে লাগল। নীচ ব্যাধ জাতির কাছে তার উচ্চ বংশোদ্ভূত ব্যক্তির অপমান নির্বিবাদে সহ্য করতে হবে, একথা ভেবে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। কালকেতুর মুখের উপর সে বলে বসল,—

শুন শুন মহাবীর শুন মোর কথা।
উচিত কহিতে তুমি পাবে মনে ব্যথা ॥
যেখানে আমার খুড়া ঘুচালে মণ্ডলী।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালি ॥
তিন গোটা শর ছিল এক গোটা বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস ॥
এতেক নিষ্ঠুর বল আমার কপাল।
তুমি ধনমন্ত এবে আমি সে কাঙ্গাল ॥

ভাঁড়ুর মুখে এই দুর্বাক্য শুনে কালকেতু তাকে তাড়িয়ে দিল। ভাঁড়ু তখন তর্জন গর্জন করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এবং একাকী পথ চলতে চলতে কালকেতুকে এই বলে শাসাতে লাগল,—

হরিদত্তের বেটা হই জয়দত্তের নাতি।
হাটে লয়্যা বেচাইব বীরের ঘোড়া হাতী ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনর্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥

ভাঁড়ুর মধ্যে এতদিন ধরে যে প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল সহসা যেন তা কালকেতুর উস্কানিতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ভাঁড়ু কালকেতুকে জব্দ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করল। কলিঙ্গরাজ ভাঁড়ুর কথামত গুজরাট নগর আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে কালকেতু বন্দী হল। কিন্তু দেবীর কৃপায় কালকেতু কারামুক্ত হয়ে পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করল। ভাঁড়ু নিজের সব দোষ গোপন করে কালকেতুকে গিয়ে বলল,—

খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।

তাঁদের এই কান্না কুমীরের কান্না ছাড়া আর কি ?

নারীচরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দরাম তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ফুল্লরার চরিত্রটির কথা ধরা যাক। ফুল্লরা ব্যাধবনিতা। তার দরিদ্রের সংসার। মাংসের পসরা নিয়ে হাটে গিয়ে বিক্রী করা তার পেশা। এহেন ফুল্লরা যখন ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর কাছে রামায়ণ-মহাভারত হতে পাতিব্রত্যের নজির গাইতে থাকে তখন তাকে আর রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। চণ্ডীর কাছে ফুল্লরা যে বারমাসের দুঃখ নিবেদন করেছে তা তার বেদনাহত চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। ছদ্মবেশিনী চণ্ডী যাতে তার ঘর ছেড়ে চলে যায় সেজন্য ফুল্লরা বারমাসের দুঃখ তার কাছে বর্ণনা করেছে। দুঃখ প্রকাশের মূলীভূত কারণ হল সপত্নী-বিদ্বেষ। চণ্ডী আগেই ফুল্লরাকে বলেছেন,—'থাকিব দুজনে যদি না বাসহ লাজ'। কোন বিবাহিতা হিন্দু নারীর পক্ষে চণ্ডীর এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। চণ্ডীর বাসনাকে নিবৃত্ত করার জন্য ফুল্লরাকে নিজের দুঃখকথাকে অতিরঞ্জিত করে বলতে হল।

তবে কবি ফুল্লরার মুখ দিয়ে বারমাসের দুঃখ কথা এমন সুকৌশলে বলিয়েছেন যে তাকে আর কিছুতেই অবাস্তব বলে মনে হয় না। অবশ্য ইহার সবটা ফুল্লরার বানান নয়। ইহার মধ্যে এমন কিছু কিছু বস্তু আছে যেগুলিকে ফুল্লরা চণ্ডীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যেমন,—

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী।
ভেরাণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে।
প্রথমে বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥

* * *

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥

দ্বিজরামদেব

সম্প্রতি ত্রিপুরা হতে চট্টগ্রামের কবি দ্বিজরামদেবের 'অভয়া-মঙ্গল' কাব্যের দুখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। কাব্যখানি আশুতোষ দাসের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যমধ্যে কবি কোন আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ

করে যাননি বলে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। শুধু ভণিতাতে তাঁর পিতার নামের উল্লেখ দেখা যায়:

দেবীপদ দ্বন্দ্ব নিন্দিয়া অরবিন্দ
আনন্দ-কন্দ মনোহর।
কবি বিধুসুত ভাবিয়া অবিরত
রোপিত মানসসরোবর॥

কাব্যমধ্যে কবি কাব্যরচনার কালনির্দেশক যে পদ রচনা করেছেন—'ইন্দুবাণ ঋষিবাণ শক নিয়োজিত' তা বামদিক হতে পড়ার রীতি ব্যতিক্রম করে যদি ডানদিক থেকে পড়া যায়, তাহলে ইহাতে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।[১] তাছাড়া কাব্যমধ্যে কবি কালকেতুর নগর-পত্তনকালে মগ-ফিরিঙ্গিদের আগমনের কথাও উল্লিখিত করেছেন:

ফেরাঙ্গি বান্ধিল টঙ্গি গোলন্দাজ তার সঙ্গী
মগ তেলঙ্গ ত্রিপুরার ঠাট।
দ্বিজ রামদেবে ভণে সারদা ভাবিয়া মনে
নগর পত্তন গুজরাট॥

মগ-ফিরিঙ্গিদের বাংলাদেশে বসতিস্থাপন সম্ভব হয়েছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে। সুতরাং, দ্বিজ রামদেবের কাব্য যে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী-কালে (১৬৫৩ খ্রী:) রচিত হয়েছিল তা একরকম স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

কাব্যরচনার দিক থেকে দ্বিজ রামদেব কোন অভিনবত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। প্রতি পদে পদে তিনি দ্বিজ মাধবের অনুকরণ, অনুসরণ করেছেন। এরূপ পুচ্ছগ্রাহিতা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে একান্তই দুর্লক্ষ্য। ভাব, ভাষা, ছন্দ, ভণিতা এমনকি কাহিনী পর্যন্ত অনুকরণ করেছেন। নিম্নে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

(১) ভণিতা—

সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজমাধব তথি অলি হইয়া শোভে॥

—দ্বিজমাধব।

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডা: আশুতোষ ভট্টাচার্য।

দেবীপদ সরোজ সৌরভ অতিশয়।
দ্বিজরামদেব তথি অলি হইয়া রয়॥

—দ্বিজরামদেব।

(২) গণেশ বন্দনা—

হেরম্ব মহাশয় হইয়া সদয়
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
বিঘ্ন করয়ে নাশ রক্ষয়ে নিজ দাস
সুচারু হউক মোর গান॥

—দ্বিজমাধব।

বন্দহ লম্বোদর সিন্দুরে সুন্দর
ঘটেতে কর অধিষ্ঠান।
সৃজিয়া মধু বৃষ্টি নায়কের কর দৃষ্টি
গায়নেরে কর অবধান॥

—দ্বিজরামদেব।

(৩) লহনার নিকট ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ করায় প্রস্তাব—

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুন মোর বাণী।
তোম্মার আজ্ঞা পাইলে বিহা করিব খুলনী॥
যেন মাত্র কৈল সাধু বচন প্রকাশ।
লহনার মুণ্ডে যেন পড়িল আকাশ॥

—দ্বিজমাধব।

ধনপতি বোলে প্রিয়া শুনিছ কাহিনী।
বিবাহ করিমু তোমার খুলনা ভগিনী॥
এই মাত্র শুনে রামা সাধুর বচন।
লহনার মুণ্ডে যেন ঠেকিল গগন॥

—দ্বিজরামদেব।

দ্বিজরামদেব এভাবে দ্বিজমাধবের অনুকরণ করায় কাব্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁর কোন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না।

চণ্ডীমঙ্গল-শ্রেণীর কাব্যরচনায় ভারতচন্দ্র রায় অসাধারণ কবিত্বশক্তির

পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা সৃষ্টি ও অলংকার প্রয়োগে তাঁর সমকক্ষ কবি মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নেই। বর্তমান বর্ধমান জেলার ভুরস্থট পরগনার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর জন্মকাল নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের জন্মকাল ১৭১২ খ্রীঃ বলে গ্রহণ করেছেন। এবিষয়ে সর্বশেষ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ভারতচন্দ্র ১১১৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রীঃ পেঁড়ো (ওরফে রাধানগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরস্থট পরগনার অধিপতি ছিলেন। ভারতচন্দ্র ভণিতাতে সে-কথা উল্লেখ করেছেন,—

ভারতচন্দ্র রায়

ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদে নরেন্দ্র রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যান। ভারতচন্দ্রের বয়স তখন এগার বছর। পিতার নিঃস্ব অবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা ঘটায় এই অল্প বয়সে কবি মাতুলালয়ে পালিয়ে যান। সেখানে এক সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান তিনি যত্ন-সহকারে অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে কবি বিবাহ করেন। এসময় তাঁর পাঠাভ্যাসও সমাপ্ত হয়ে যায়। কবি আবার গৃহে ফিরে আসেন। এখন যেমন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কদর বেশি, তখন সেরূপ পারসীভাষা শিক্ষার বিশেষ সমাদর ছিল। পারসী না শিখে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হওয়ায় জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাদের কাছে কবি ভৎ র্সিত হন। অভিমানে কবি গৃহত্যাগ করে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র মুন্সী তাঁর আগ্রহ দেখে স্বগৃহে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এসময় ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করে তিনি সকলকেই চমৎকৃত করে দেন। পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে বিশ বছর বয়সে কবি আবার গৃহে ফিরে আসেন। আত্মীয়-স্বজনেরা ভারতচন্দ্রের

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাঁকে মোক্তার নিযুক্ত করে বর্ধমানের রাজধানীতে তাঁদের হয়ে দরবার করতে পাঠান। রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন। কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে কবি কটকে মারহাট্টাদের সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবভট্ট তাঁকে শ্রীক্ষেত্রে বাসের অনুমতি দেন। শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণব সংসর্গে এসে কবি শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণবশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন এবং বৈষ্ণব হয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে ধর্মচিন্তায় কালকাটাতে থাকেন। তারপর বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পদব্রজে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে কবির শ্যালীপতির ভ্রাতার সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয়। তাঁরই অনুরোধে ভারতচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশ ছেড়ে আবার সংসারী হন। কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস ও কিছুকাল শ্বশুরগৃহে বাস করে কবি অর্থোপার্জনের জন্য ফরাসডাঙ্গায় ডুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তখন তাঁকে পরম বিদ্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় প্রেরণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে ৪০৲ টাকা বেতনে সভাকবি নিযুক্ত করেন। তাঁরই আদেশে ভারতচন্দ্র তাঁর বহু-বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে খুশি হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন। এই গ্রামেতেই কবি ১৭৬০ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

কাব্য-নাটক করে ভারতচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। 'সত্যপীরের পাঁচালী' কবির প্রথম রচনা। ১৭৩৮ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচিত হয়। নবদ্বীপের রাজসভায় নিযুক্ত হয়ে কবি কয়েকটি কবিতা রচনার পর 'রসমঞ্জরী' কাব্য প্রণয়ন করেন। কাব্যটি মৈথিল কবি ভানু দত্তের রসমঞ্জরীর অনুবাদ। এই গ্রন্থে অলংকারশাস্ত্রের নায়ক-নায়িকাদের লক্ষণ, বিদূষক, বিট প্রভৃতির স্বরূপ এবং শৃঙ্গার রসের লক্ষণ-ভেদ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৭৩৮ হতে ১৭৪৯ খ্রীঃ মধ্যে রচিত। কবি যখন মূলাজোড় গ্রামে বাস করতেন সে-সময় স্থানীয় জমিদার রামদেব নাগের অত্যাচারের কথা বিবৃত করে 'নাগাষ্টক' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে

তা উপহার দেন। মহারাজ কবির রচনা নৈপুণ্য ও চাতুর্যের পরিচয় পেয়ে মূলাজোড় গ্রামে নাগের অত্যাচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৭৪৫-৫০খ্রীঃ মধ্যে 'নাগাষ্টক' রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি হল 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশ এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদর্শে কাব্যখানি রচিত হয়। ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়। ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত—(১) অন্নদামঙ্গল; (২) বিদ্যাসুন্দর ও (৩) ভবানন্দ মজুমদারের পালা। ভারতচন্দ্র বসন্ত, বর্ষাবর্ণনা, পাদপুরাণ প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন। এগুলি ছাড়া কবির 'গঙ্গাষ্টক' নামক একখানি গ্রন্থ ও 'চণ্ডীনাটক' নামক একখানি বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দী মিশ্রণে রচিত নাট্যগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। এজন্য তাঁর কাব্যে পরিস্কৃত বুদ্ধি, মার্জিত রুচি ও বাক্‌শক্তির নিপুণ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। রাজসভার উচ্ছৃংখল বিলাসময় জীবনের প্রভাবও তাঁর কাব্যে পড়েছে। স্থানে স্থানে তাই তিনি রসিকতার ছলে আদিরস পঞ্চমে তুলে গেয়েছেন। কবি-কল্পনার বিশলতা, গভীরতা ভারতচন্দ্রের রচনায় দৃষ্টিগোচর না হলেও তাঁর কাব্যরচনার রীতিটি বড়ই চমৎকার। তাঁর রচনার প্রসাদগুণের তুলনা নেই। প্রত্যেকটি কথা একেবারে ঝকঝকে পালিশ করা। ভাষার এমন অপরূপ রূপ ইতিপূর্বে আর কোথায়ও দেখা যায়নি। খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির আধিকারী ছিলেন কবি। তাঁর কাব্যে বর্ণনশক্তির অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে। অলংকার প্রয়েগেও কবি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কতিপয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করলে ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার অভিনবত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' আদিরসের বাড়াবাড়ি ঘটেছে। বিবাহ বাসরে শিবের চিত্রখানি একটু লক্ষ্য করলে হিমালয়রাজের মত পাঠকবর্গও হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন। বিবাহ-বাসরে প্রবেশ করে—

ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥

তারপর স্ত্রী-আচারের সময়—

বাঘছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর।
এয়োগণ বলে ও মা এ কেমন বর॥

মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই।

ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' এভাবে দেব-দেবীদের নিয়ে অনেক স্থলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করে দিয়ে যান। মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে কাব্যরচনা করলেও তাঁর দৃষ্টি স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ ছিল না; মর্তের ধূলিভরা জীবনের প্রতি তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। দৈবাধারে তিনি মানবরস পরিবেশন করেছেন। তাঁর অন্নদাকে যখন আমরা জরতীবেশে ব্যাসদেবকে ছলনা করতে দেখি তখন তাঁকে আর দেবী বলে চিনতে পারি না। মনে হয় যেন তিনি নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের ঘরের জরাতুরা অনাথা নারী। মধ্যযুগের কবিদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের তফাৎ এখানেই। জরতী অন্নদার যে রূপ কবি অঙ্কন করেছেন তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল:

মায়া করে মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাতদিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥

*　　*　　*

কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম সার॥

ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কান ঢেকে যায়
কুঁজভরে পিঠভাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥

উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে।
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই ॥

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের দেবদেবীর মধ্যে একটা ঘোরতর পার্থক্য আছে। চণ্ডী, মনসা ইঁহারা মূলত দেবী। মর্তের মানুষের সঙ্গে ইঁহাদের কোন যোগ নেই। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে, স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইঁহারা ভক্তের দ্বারে পূজা ভিক্ষা করে বেড়িয়েছেন। ভক্তের সুখে-দুঃখে কাতর হয়ে কখন জননীমূর্তিতে তাঁরা তার কাছে আবির্ভূত হয়নি। ভারতচন্দ্রের অন্নদা ইহার ব্যতিক্রম। কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থের খাতিরে তিনি ভক্তগৃহে হানা দেননি। ভক্তের চোখের জল মুছিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করার জন্য তিনি তৎপর। ভক্ত তাঁর কাছে অন্য কেউ নয়, সে যেন একেবারে তাঁর স্নেহের সন্তান, তাঁর অঞ্চলের নিধি। ভক্তকে 'ওরে বাছা' এই মধুর সম্বোধন করে তিনি বলেন,—

দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধনপুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর ॥
* * *
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে ॥

ভক্তসন্তানের প্রতি দেবীর এতখানি দরদ যেন আশাতীত, স্বপ্নবৎ বলেই মনে হয়। হরিহোড়কে তাই বলতে শুনি,—

অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে।
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদা অঘটনঘটনপটীয়সী ভয়ঙ্করী চণ্ডী নন, তিনি বরাভয়া অন্নপূর্ণা। জনে জনে করুণা বিতরণ করাই তাঁর কাজ। ভবানন্দভবনে

যাত্রাকালে দেবীকে আমরা এমনি অযাচিতভাবে করুণা দান করতে দেখি। প্রসন্নচিত্তে অন্নদা ঈশ্বরী পাটুনীকে বলেছেন,—'বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব।' তারপর—

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবে তোমার সন্তান॥

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—পাটুনীর এই তুচ্ছ বর চাওয়ার মধ্যে একটা গভীর অর্থ নিহিত আছে। জগতে সোনা-দানা, হীরে-জহরত ইত্যাদি এত সব মহামূল্য বস্তু থাকতে পাটুনী কেন সন্তান দুধে-ভাতে থাকার এই সামান্য বর চাইল? ইহার উত্তর এই যে, নিঃস্ব ব্যক্তি সাধারণ মানুষের কাছে যৎসামান্য ভোজ্যদ্রব্য ছাড়া আর অন্য কিছু চায় না। এখানে অন্নদা মানবী রূপেই পাটুনীর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছেন। তাঁর আচার-আচরণ, হাব-ভাব, কথা-বার্তা সবই মানুষের মতই। তাই পাটুনী দেবীর কাছে সামান্য একটু খেতে পাওয়ার উপায় করে নেওয়া ছাড়া আর বড় কিছু আশা করতে পারেনি।

পুরুষ চরিত্রের বেলাও দেখি ভারতচন্দ্র দেব গড়তে গিয়ে মানুষ গড়ে ফেলেছেন। মঙ্গলকাব্যের শিব অন্নদামঙ্গলে পাগল, ভিখারী মাত্র। শিব ভিক্ষায় বেরুলে পাড়ার ছেলেরা তাঁকে নিয়ে রঙ্গ করে, এমনকি পাগল ভেবে তাঁর গায়েতে ছাইমাটি পর্যন্ত ছুঁড়ে মারে:

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥

পাঁচঘর ঘুরলে ভিখারীর তবু কিছু জোটে। শিব এমনই হতভাগ্য তিনি

ত্রিভুবন ঘুরে কোথাও এক মুষ্টি ভিক্ষা পেলেন না। তাঁকে দেখে সকলেই বলে,—

কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥

অন্নদামঙ্গলের মধ্যে আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করি, এখানে কবি দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কাব্যরচনা করেননি; তিনি ধরণী ঈশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় কাব্যরচনা করেছেন। ভণিতাতে তাই তিনি বারে বারে বলেছেন,—

আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

এমনি করে অন্নদামঙ্গলের অনেকস্থলে আমরা মাটির ডাক শুনতে পাই। মাটির আকুলকরা ডাক শুনে ভারতচন্দ্র স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে মর্তে নেমে এসেছেন সুখে-দুঃখে ভরা মানুষের মাঝখানে। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ইহাই।

ভারতচন্দ্রের পর আরো কয়েকজন কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। জয়নারায়ণ বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত জপসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কাহিনী—কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী অবলম্বন করে ভারতচন্দ্রের রচনাদর্শে কাব্য রচনা করেন। ভবানীশঙ্কর ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও কবি। অনেক ক্ষেত্রে কবিত্বের চেয়ে পাণ্ডিত্য অধিক প্রকাশ পেয়েছে। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর কাব্যখানিও আকারে দীর্ঘ। কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী—এই দুই খণ্ডে তাঁর কাব্যখানি বিভক্ত। করুণ রসের বর্ণনায় অকিঞ্চন বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অকিঞ্চনই সম্ভবত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্য

রাঢ়ে ধর্মপূজা ॥

ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে (মধ্য-পশ্চিম বাংলা) ব্যাপক প্রসারলাভ করে। ইহা প্রধানত আর্যেতর জাতির মধ্যে উদ্ভূত হয়ে কালক্রমে বৌদ্ধ-হিন্দুর প্রভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে। ধর্মপূজা অনার্যসমাজ-সম্ভূত বলে ডোম জাতি ধর্মঠাকুরের পূজারী। ধর্ম নামটির উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কেহ বলেন, ধর্ম শব্দের অর্থ বুদ্ধ। কেহ বলেন, ধর্ম সূর্যের এক নাম। ধর্মঠাকুরের পূজারিগণও এবিষয়ে একমত নন। তাঁরা তাঁকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব কোথাও যম, আবার কোথাও বা সূর্য বলে ধ্যান করেন। ধর্মঠাকুরের একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য হল, ইঁহার কোন মূর্তি নেই। একখণ্ড ডিম্বাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ধর্মদেবতা নামে পূজিত হয়ে থাকে। ছাগ, কবুতর, মুরগী, শূকর ইত্যাদি বলি দিয়ে ধর্মঠাকুরের পূজা করা হয়। সাধারণ ডোমজাতিভুক্ত লোকই এই দেবতার পূজারী হয়ে থাকেন। ইঁহাদের উপাধি পণ্ডিত, ইঁহাদের দেয়াসীও বলা হয়। ধর্মঠাকুরের পূজারিগণের বাহুতে তামার তাগা এবং হাতে তামার আংটি পরতে হয়। কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগ, বন্ধ্যারোগ, চক্ষুরোগ প্রভৃতির কবল হতে মুক্তিলাভের জন্য লোকে ধর্মঠাকুরের কাছে পূজা মানসিক করে। পুরোহিতগণ এসমস্ত রোগের ঔষধও দিয়ে থাকেন।

ধর্মঠাকুরের পূজা তিনভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমত গৃহস্থের বাড়ীতে ইঁহার নিত্যপূজা; দ্বিতীয়ত সর্বসাধারণের হিতার্থে ইঁহার বার্ষিক পূজা এবং তৃতীয়ত 'ঘর-ভরা' অর্থাৎ রোগমুক্তি বা অন্যকারণে ব্যক্তিবিশেষের নামে মানসিক করে ইঁহার আড়ম্বরপূর্ণ পূজা। ঘর-ভরা অনুষ্ঠান বার দিন ধরে চলে এবং ইহাতে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি গীত হয়। ঘর-ভরা ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠানে সাধারণত ধর্মমঙ্গল গান হয় না।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ॥

গৌড়ে ধর্মপাল নামে এক রাজা ছিলেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর নাম মহামদ।

মহামদ সম্পর্কে গৌড়েশ্বরের শ্যালক। একদিন গৌড়েশ্বর শিকারে বেরিয়ে দেখলেন, তাঁর একজন অনুগত প্রজা সোমঘোষ মহামদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হয়ে আছেন। গৌড়েশ্বর মহামদকে ভর্ৎসনা করে সোমঘোষকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁকে রাঢ়ের সামন্তরাজা কর্ণসেনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। সোমঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের প্রাসাদ আক্রমণ করে তাঁকে গড় থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ইছাই নতুন গড় নির্মাণ করে তার নাম দিলেন ঢেকুর। গৌড়েশ্বরের রাজস্ব দেওয়া তিনি বন্ধ করে দিলেন। গৌড়েশ্বর ইহাতে ক্ষুব্ধ হয়ে লক্ষ সৈন্য নিয়ে ঢেকুর আক্রমণ করলেন। কিন্তু অজয় নদের বন্যায় তাঁর অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হয়ে গেল। কোনমতে তিনি গৌড়ে ফিরে এলেন। ইহাতে কর্ণ সেনের মহা বিপদ উপস্থিত হল। যুদ্ধে তাঁর ছয় পুত্র মারা গেল; ছয় বধূ আবার তাদের সঙ্গে সহমৃতা হলেন। রাণীও শোক সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতিনী হলেন। রাজা ইহাতে পাগল হয়ে গেলেন।

গৌড়েশ্বর দয়াপরবশ হয়ে কর্ণসেনের সঙ্গে নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিলেন। বিবাহকালে মন্ত্রী মহামদ উপস্থিত ছিলেন না। পাছে বিবাহে বাধা দেন, এজন্য গৌড়েশ্বর কৌশল করে মহামদকে কামরূপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কামরূপ থেকে ফিরে মহামদ সব খবর শুনে কর্ণসেনের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

অনেক দিন মাতাপিতার কোন সংবাদ না পেয়ে রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে গৌড়ে পাঠালেন। মহামদ প্রকাশ্য রাজসভায় কর্ণসেনকে আঁটকুড়ো এবং রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে নিন্দা করলেন। লজ্জায় অপমানে কর্ণসেন আবার নিজ রাজধানীতে ফিরে এলেন। স্বামীর মুখে সব কথা শুনে রঞ্জাবতীও দুঃখিত হলেন। বন্ধ্যার অপবাদ ঘুচাবার জন্য তিনি ধর্মঠাকুরের পূজা করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। অবশেষে পুরোহিতের নির্দেশে পুনরায় ধর্মপূজা করে লৌহশলাকায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। ধর্ম ইহাতে সন্তুষ্ট হয়ে রঞ্জাবতীর প্রাণদান করে তাঁকে পুত্রবর দিয়ে গেলেন। রঞ্জাবতী পর পর দুই পুত্র লাভ করলেন। বড়টির নাম লাউসেন এবং ছোটটির নাম কর্পূরসেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় তাঁরা দুজনেই মল্লবিদ্যায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। পিতামাতার অনুমতি নিয়ে তাঁরা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্যে

গৌড়ের পথে যাত্রা করলেন। পথে অনেক বিপদ কাটিয়ে, প্রলোভন জয় করে তাঁরা গৌড়ে পৌছালেন। মহামদ তাঁদের বিপদে ফেলার জন্য চক্রান্ত করতে লাগলেন। গৌড়ে পৌছে লাউসেন ও কর্ণসেন বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মহামদ তাঁদের শিয়রে পাটহস্তী বেঁধে রাখলেন এবং তারপর তাঁদের হাতী-চোর বলে কারারুদ্ধ করে রাখলেন। লাউসেন রাজার কাছে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করলেন। রাজা খুশি হয়ে তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ একটি অশ্ব দান করলেন। দুভাই তারপর স্বদেশের পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তেরজন ডোমের সাক্ষাৎ পেয়ে লাউসেন তাঁদের সকলকে সঙ্গে নিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রধান যে (কালুডোম্) তাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করলেন।

মন্ত্রী মহামদ এদিকে লাউসেনকে বিপদে ফেলার জন্য নিত্য-নতুন উপায় সন্ধান করতে লাগলেন। তিনি রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে লাউসেনকে কামরূপ জয় করার জন্য পাঠালেন। লাউসেন অনায়াসে কামরূপ জয় করলেন। কামরূপের রাজা তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজকন্যা কলিঙ্গাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। বিজয় গৌরবে লাউসেন গৌড়ে ফিরে এলেন। গৌড় হতে তারপর গৃহে ফেরার পথে মঙ্গলকোটের রাজার কন্যা অমলা এবং বর্ধমানের রাজার কন্যা বিমলাকে বিবাহ করলেন। পিতামাতা আনন্দের সঙ্গে তাঁদের বরণ করে নিলেন।

গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করতে চাইলেন। হরিপাল এই বিবাহে সম্মতি দিলেন না। গৌড়েশ্বর তখন নয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিমুল আক্রমণ করলেন। কানড়া গৌড়েশ্বরকে একটি লৌহগণ্ডার দিয়ে বললেন, যিনি ইহাকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবেন, তিনি তাঁকে বিবাহ করতে পারবেন। গৌড়েশ্বর ইহাতে বিফল হলেন। মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর তখন লাউসেনকে ডেকে পাঠালেন। লাউসেন লৌহগণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করে কানড়াকে বিবাহ করে নিজ রাজধানী ময়না নগরে ফিরে এলেন।

মন্ত্রী মহামদের লাউসেনের প্রতি ঈর্ষা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি আবার এক ফন্দি বার করলেন। তিনি বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য লাউসেনকে পাঠাবার কথা গৌড়েশ্বরকে

বললেন। গৌড়েশ্বর কোন দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গে লাউসেনকে ইছাই ঘোষের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠালেন। লাউসেনের সঙ্গে ইছাই ঘোষের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। ইছাই যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। মহামদ ভাবলেন, ধর্মঠাকুরের ভক্ত বলে লাউসেন এত বড় বীর হতে পেরেছেন। বীরত্ব অর্জনের জন্য মহামদ নিজে ধর্মঠাকুরের পূজা করতে লাগলেন। ধর্মঠাকুর ইহাতে বিরক্ত হয়ে তাঁর পূজায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। অবিরাম বর্ষণে সমগ্র গৌড় নগর ভেসে যেতে লাগল। রাজার অনুরোধে লাউসেন তখন রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলবিধানের জন্য ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা পশ্চিম আকাশ হতে সূর্যোদয় ঘটানর কঠোর তপস্যায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। লাউসেন নিজের দেহকে নয় খণ্ড করে কেটে ধর্মের নামে আহুতি দিলেন। ধর্মঠাকুর লাউসেনের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে অমাবস্যা রাত্রে সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার আদেশ দিলেন। রাজ্যের সব অমঙ্গল দূর হয়ে গেল। পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের ব্যাপারটাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে গিয়ে মহামদ বিফল হলেন। ধর্মঠাকুর তাঁর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁর গায়ে কুষ্ঠ হওয়ার অভিশাপ দিলেন। নিদারুণ কুষ্ঠব্যাধিতে মহামদ আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। লাউসেন আবার দয়া পরবশ হয়ে কুষ্ঠরোগ থেকে মহামদকে আরোগ্য করে দিলেন। কেবল তাঁর দুষ্কর্মের জন্য তাঁর মুখে শ্বেতকুষ্ঠের একটি চিহ্ন রেখে দিলেন। লাউসেন এভাবে মর্তে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করে পুত্র চিত্রসেনের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে স্বর্গারোহণ করলেন।

ধর্মমঙ্গলের কবিকুল ॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম ময়ূর ভট্ট। এপর্যন্ত তাঁর রচিত কোন পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। পরবর্তিকালের কবিগণ তাঁদের কাব্যে ময়ূর ভট্টকে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর আদি-রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। ইহাতে বোঝা যায় ময়ূর ভট্ট ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। যেমন, মাণিক গাঙ্গুলী লিখেছেন—

ময়ূর ভট্ট

বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্মমঙ্গল ॥

বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম[1]।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান॥

ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন—

হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূর ভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম সভায়।

ঘনরামের এই উক্তি থেকে অনুমিত হয়, ময়ূর ভট্টের কাব্যের নাম ছিল 'হাকন্দ পুরাণ'।

সীতারাম দাস লিখেছেন –

ময়ূরভট্ট মহাশয় যোগে নিরমল।
প্রকাশ করিল ধর্মের মঙ্গল॥
তাহার স্মরণ করি সবে গাই গীত।
সেই অঙ্ক শুনিলে ধর্মেতে যাবে চিত॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় ময়ূরভট্টের রচিত শ্রীধর্মপুরাণ নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ঘনরাম চক্রবর্তীর উক্তিতে দেখা গিয়েছে ময়ূর ভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ-পুরাণ'। কাজেই অনুমান হয় 'শ্রীধর্মপুরাণ' ময়ূর ভট্টের রচনা নয়, উহা অর্বাচীন কালের কোন ব্যক্তির রচনা হবে।

মাণিকরাম

ধর্মমঙ্গলের পরবর্তী কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী ষোড়শ শতকের শেষার্ধে আবির্ভূত হন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের বিদ্যাবত্তার যে পরিচয় কবি লিপিবদ্ধ করেছেন তা তাঁর নিজের পরিচয় হিসেবে গৃহীত হতে পারে:

অবশেষে পড়িলেন সাহিত্যসকল।
মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল॥
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শাস্ত্র॥

১। রূপরাম ময়ূর ভট্টের পরবর্তী কবি। কারণ, তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় তিনি ময়ূর ভট্টকে, 'ময়ূর ভট্টের পদ মনে অনুমানি'—এই বলে, বন্দনা করেছেন। সুতরাং আদি কবি বলতে এখানে ময়ূর ভট্টকেই বোঝান হয়েছে।

ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তারপর।
উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বছর॥

ধর্মমঙ্গল কাব্য বীররসাত্মক। এই বীররস সৃষ্টির উপযুক্ত ওজস্বিনী ভাষার নমুনা মাণিকরামের কাব্যে পাওয়া যায়। অলংকার প্রয়োগেও কবি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। সংস্কৃত রসশাস্ত্র অনুশীলনের ফলে তাঁর কাব্যে আদিরসের আধিক্য ঘটে।

রূপরাম

রূপরাম মাণিকরামের সমসাময়িক কবি। মাণিকরামের কাব্য রচনার অল্পকয়েক বছর পরে তাঁর কাব্য রচিত হয়। বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরাম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে রূপরাম অত্যন্ত দুর্বিনীত ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার চর্চা বিশেষ কিছু না করায় গুরুজনদের তিনি বিরাগ ভাজন হয়েছিলেন। তাঁদের গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে গৃহত্যাগ করে তিনি রাজা গণেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা তাঁকে চামর মন্দিরা উপহার দিয়ে গানের দল বেঁধে দিলেন। সেই থেকে ধর্মের আসরে গীত গাওয়া শুরু করেন। রূপরাম উচ্চ কবি-প্রতিভার অধিকারী না হলেও তার রচনা স্থানে স্থানে বেশ সরল ও মধুর হয়ে উঠেছে। বর্ণনশক্তির নিবিড় পরিচয়ও তার কাব্যে পাওয়া যায়। যেমন, জামতি পালায় কুলটা নয়ানীর রূপ-সজ্জা বর্ণনার কিয়দংশ—

কপালে সিন্দুর পরে তপন-উদয়।
চন্দন-চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়॥
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া ছিল বিন্দু বিচক্ষণ॥
এক ঠাঞি রবি শশী তারাগণযুতা।
আনন্দ অম্বুদকুলে বিজুরীর লতা॥

দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে রূপরাম সমাজজীবনের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এবিষয়ে মুকুন্দরামের সহিত তিনি তুলনীয়।

সীতারাম দাস

ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি সীতারাম দাস বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সীতারাম পূর্বসূরীদের গতানুগতিক পথে চলেছেন। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্য বা কবিত্ব কোনটাই তেমন লক্ষ্য করা যায় না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ১৭১১ খ্রীঃ বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র, খুব সম্ভব কবির পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ছিলেন। কাব্যমধ্যে কবি কীর্তিচন্দ্রের কল্যাণ-কামনা করেছেন :

ঘনরাম চক্রবর্তী

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান ॥

মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত ঘনরাম দেবতার স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা করেননি। তিনি গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুর আদেশেই তিনি কাব্যরচনা করেন। ভণিতাতে পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি গুরুর নামোল্লেখ করেছেন :

গুরুপদে হয়ে যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
বিরচিল শ্রীধর্মমঙ্গল।

ঘনরামের কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে গুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। গুরুকে উদ্দেশ্য করে তিনি তাই বলেছেন,—

নিজগুণে করি যত্ন নাম দিলা কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা-আধান।

ঘনরাম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর কাব্যে একারণে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের বিমিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর কাব্যের ভাষা মার্জিত ও অলংকারমণ্ডিত। যেমন,—

ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে ॥
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা ॥

মনসামঙ্গল কাব্য যেমন করুণরসের আকর, ধর্মমঙ্গল কাব্য তেমনি বীর রসের আকর। এখানে করুণরসসৃষ্টির অবকাশ নেই বললে চলে। শোক-প্রকাশের চেয়ে কর্তব্যের আহ্বানটাই এই কাব্যে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সপত্নীর (কলিঙ্গা) মৃত্যুশোকে কানড়া যখন কাতরভাবে অশ্রুবিসর্জন

করেছেন তখন দুর্মুখা দাসী তাঁকে শোক ত্যাগ করে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলছেন :

এলাল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দুর্মুখা পেতায়॥
কেঁদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ পেল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে॥

সহদেব চক্রবর্তী ১৭৩৫ খ্রীঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি কালুরায় ধর্মের স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করেন। সহদেবের কাব্যে লাউসেনের কাহিনী নেই। তাঁর কাব্যে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী, শৈব কাহিনী, মীননাথ-গোরক্ষনাথের জীবনী, পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনী স্থান পেয়েছে। সহদেবের রচনা স্থানে স্থানে বেশ সরস হয়ে উঠেছে ; যেমন,—

সহদেব চক্রবর্তী

মিছা মায়া মধুরসে বন্দী হয়্যা মায়াপাশে
হরিপদে না রহে ভকতি।
তসরের পোকা যেন লুতায় বসিয়া হেন
নিজ সুখে মজে লঘু গতি॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান ত্রুটি হল একই বিষয়বস্তু ও কাহিনী অনুসরণ করে সকল কবি কাব্যরচনা করেছেন। রচনা তাই রসহীন বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে। তথাপি ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ইতিহাসমূলক বলে মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজের ইতিহাস রচনায় ইহা অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল।

পঞ্চম অধ্যায় : শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য

শিবদেবতার স্বরূপ ও শিবের গীত ॥

শিব অতি প্রাচীন দেবতা। প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকে তাঁর পূজোপাসনা চলে আসছে। কালক্রমে বৈদিক রুদ্রদেবতা, অনন্তপুণ্য ধ্যানী বুদ্ধ, জৈন-তীর্থঙ্কর, নাথধর্ম ও বাংলার বিভিন্ন লৌকিক ধর্মের প্রভাবে পড়ে আদ্যযুগের এই দেবতাটি এক বিচিত্র সঙ্করমূর্তিতে পরিণত হন। পুরাণকারেরা তাঁকে কোথাও মঙ্গলকারী দেবতা, কোথাও প্রলয়ের অধিকর্তা, আবার কোথাও ধ্যানী-যোগীরূপে কল্পনা করেছেন। শিবের চরিত্রগত এই পৌরাণিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মিলিত হল জনগণের নানাবিধ আচার-ধর্ম ও জীবনযাত্রার সহজ প্রণালী। ফলে, মঙ্গল-কবিদের হাতে সত্যসুন্দর শিব হলেন এক আধপাগল, নেশাখোর, চাষাভূষা, ভিখারী, শ্মশানচারী দেবতা। পরিধানে বাঘছাল, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল, গলায় হাড়ের মালা, সর্বাঙ্গে ছাইমাখা, সঙ্গে ভূতপ্রেত, বাহন আবার একটা ষণ্ড—এহেন যে শিব, তার আবার ঘরসংসার, ছেলেপিলে সবই আছে। এমন হাস্যকর অসঙ্গতিপূর্ণ চরিত্র আর কী হতে পারে! বিধাতার সাধ্য নেই এমন চরিত্র সৃষ্টি করেন। এ সম্ভব কেবল মঙ্গল-কবিদের পক্ষে যাঁদের কল্পনার অলকাপুরী বাংলার নিভৃত পল্লীর পানাপুকুরের ধারে প্রতিষ্ঠিত। শিবচরিত্রটি একারণে সমাজের উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে অতিশয় মুখরোচক হয়ে ওঠে। অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য এককালে বাংলাদেশে তাই ধান ভানতেও শিবের গীত গাওয়া হত।

শিবের কাহিনী অনুসরণ করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব ঘটে। অবশ্য ইহা কাব্যরূপ লাভ করার পূর্বে বাংলা-দেশে বিচ্ছিন্ন ছড়া ও গীতিরূপে প্রচলিত ছিল। কথায় বলে, 'ধান ভানতে শিবের গীত'। শিবায়ন ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও শিব-কাহিনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেছে। শিবের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়ে চণ্ডী ও মনসা আর্যপরিবারের অন্তর্ভূত হন।

মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে শিববিষয়ক বিচ্ছিন্ন ছড়া ও বিবিধ লোকগীতিগুলি সুসংবদ্ধ কাহিনীরূপ লাভ করে প্রত্যেক প্রকারের মঙ্গলকাব্যে

স্থান পায় এবং কালক্রমে শিবের চরিত্রে, আচরণে ও কার্যকলাপে বিচিত্র বিচিত্র উপাদানের সমাবেশ ঘটায় শিবকাহিনী প্রাধান্য লাভ করে এক শ্রেণীর নতুন শিবমঙ্গল কাব্যে পরিণত হয়। ইহাতে শিবচরিত্রের গৌরব যে অধিক-মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়। শিবচরিত্রের দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট করার বা তার বিভেদের মধ্যে সঙ্গতিস্থাপন করার কোনো প্রয়াস এখানে পরিলক্ষিত হয় না। কেবল শিববিষয়ক লৌকিক, পৌরাণিক ও কিংবদন্তীমূলক সকল তথ্যের একত্র সন্নিবেশ ঘটেছে শিবমঙ্গলে। ইহাতে মঙ্গলকাব্যের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কিংবা সমাজজীবনেও নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায় না। শিবের লীলা-মাহাত্ম্য প্রচারের প্রবণতাই শিবমঙ্গলে প্রকট হয়ে উঠেছে।

শিবের গীত

প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে শিবের গীত প্রচলিত হয়ে আসছে। শৈব বলে পরিচিত এক শ্রেণীর ভিক্ষুক শিবের গীত গেয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াত। অনুমিত হয় ১৬শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই গীত মুখে মুখে গীত হতে থাকে। প্রখ্যাত চৈতন্য-চরিতামৃতকার বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের মধ্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের লীলাবর্ণন প্রসঙ্গে তিনি একস্থলে বলেছেন,—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর॥

[বিশ্বম্ভর—শ্রীচৈতন্যের বাল্যনাম।]

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিবের চাষবিষয়ক-বিবাহবিষয়ক গীত, শিবের বিবাহে এয়োগণের গীত ইত্যাদি শিব-সম্পর্কিত বহুবিধ গীত গাওয়া হত। এই সকল গীত হতে প্রাপ্ত উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়ে পরবর্তিকালে শিবমঙ্গল কাব্য সৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে সুদূর বাখরগঞ্জ অঞ্চলে গীত শিবের বিবাহ বিষয়ক একটি গীত উদ্ধৃত করা হলো,—

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণা।
পাড়াপড়শী দেখতে এল বিয়ার কথা শুইনা॥

টিপ্ টিপ্ ডম্বুরা বাজে শিঙায় গুন্ গুন্ করে।
খৈস্যা পড়ল মৃগ চর্ম শিব ল্যাঙ্টা হইয়া নাচে॥
মেনকা সুন্দরী এল জামাই দেখিবারে।
পাগ্লা জামাই দেখ্যা সবে আউয়া ছিয়া করে॥
কিবা আকৃতি জামাইর কিবা জামাইর রূপ।
দুইটা চক্ষু ফুটা৷ রইছে পঞ্চখানি মুখ॥
না দিব গৌরারে বিয়া কার বা বাপের ডর।
ডঙ্কা মাইরা পাগল জামাই বাড়ীর বাহির কর॥

শিবমঙ্গলের কাহিনী॥

শিবমঙ্গলকাব্যের কাহিনী দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে—(১) মৃগলুব্ধ কাহিনী অর্থাৎ ব্যাধের শিবানুগ্রহ লাভের কাহিনী এবং (২) শিবমঙ্গলের কাহিনী। মৃগলুব্ধ কাহিনীতে পৌরাণিক আদর্শ প্রাধান্য লাভ করেছে এবং শিবমঙ্গলের কাহিনীতে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটলেও লৌকিক আদর্শটিই প্রকট হয়ে উঠেছে।

মৃগলুব্ধ কাহিনী

এক মৃগলুব্ধ ব্যাধ শিব-পূজা করে কেমন করে শাপমুক্ত হন তারই বিচিত্র বিবরণ মৃগলুব্ধ কাহিনীর প্রধান উপজীব্য বিষয়। মহাভারত, হরিবংশ, দেবীভাগবত, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ইত্যাদিতে বর্ণিত বিবিধ উপাখ্যান ভাগকে আশ্রয় করে এই কাহিনী গড়ে উঠে। কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পৌরাণিক; ইহাতে লৌকিক শিব-চরিত্রের কোন প্রভাব নেই। কাহিনীটি নিম্নরূপ:—

হস্তিনার রাজা মুচুকুন্দ সস্ত্রীক শিবচতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপন কালে রানী রুক্মিণীর কাছে এক অদ্ভুত শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক গল্প শুনলেন: বিদ্যাধর চিত্রসেন স্বর্গে নৃত্যপ্রদর্শনকালে এক ব্যাধের হরিণ শিকার দেখে তালভঙ্গ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র অমনি ক্রুদ্ধ হয়ে চিত্রসেনকে মর্তলোকে ব্যাধ হয়ে জন্মানর অভিশাপ দিলেন। এই নিদারুণ অভিশাপ দেওয়ার পর ইন্দ্র আবার চিত্রসেনকে এক আশ্বাস বাণী শুনালেন,—ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাতে শাপমুক্তি ঘটবে।

চিত্রসেন ব্যাধ হয়ে জন্মাল। বনের পশুশিকারই হল তার একমাত্র জীবিকা। একদিন চিত্রসেন শিকারার্থে দূর বনে গমন করল। সারাদিন

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোন শিকার জুটল না। অন্ধকার হয়ে এল, আকাশে ঝড় উঠল। ভয়ে তখন সে একটি বেলগাছে উঠে পড়ল। সেদিন ছিল শিবচতুর্দশী। বেলগাছে ওঠার সময় একটি সজল বেলপাতা নীচে শিবলিঙ্গের উপর পড়ল। শিব এতে সন্তুষ্ট হয়ে চিত্রসেনকে বর দিতে চাইলেন। চিত্রসেন শিবের কাছ থেকে পশুবধে সাফল্যলাভের বর চেয়ে নিলেন।

পরের দিন চিত্রসেন ব্যাধের জালে এক হরিণ ধরা পড়ল। হরিণী হরিণের শোকে কাতর হয়ে পড়ল। সে স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প করল। ব্যাধের কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইল; ব্যাধকে অনেক ধর্মকথা শুনাল। হরিণীর কথা শুনে ব্যাধ হরিণকে ছেড়ে দিল। হরিণ-হরিণী শাপমুক্ত হয়ে শিব-লোকে চলে গেল। ব্যাধ চিত্রসেনও চন্দ্রভাগা নদীতীরে গিয়ে ভক্তিভরে শিবপূজা করে শাপমুক্ত হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হল।

রানীর এই গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকাল হল। রাজা মুচুকুন্দ চন্দ্রভাগা নদীতীরে গিয়ে খুব ঘটা করে শিবপূজা করলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন; রাজা তারপর সস্ত্রীক শিবলোকে চলে গেলেন।

পৌরাণিক উপাদানের সহিত লৌকিক উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে শিব-

শিবমঙ্গলের কাহিনী

মঙ্গলের যে কাহিনীটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা এই—একদিন দেবসভায় শিব শ্বশুর দক্ষপ্রজাপতিকে নমস্কার করে যথোচিত সম্মান না প্রদর্শন করাতে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দক্ষ এক শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করলেন। শিব ছাড়া সকল দেবতা এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হলেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। দক্ষ সতীর সম্মুখেই শিবনিন্দা শুরু করে দিলেন। নিন্দার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করলেন। সংবাদ পেয়ে শিব প্রচণ্ড ক্রোধ ভরে দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করে দিলেন।

সতী আবার গিরিরাজ-মেনকার ঘরে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। শৈশবকাল থেকে শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য গৌরী তপস্যারত হলেন। গিরিরাজ তারপর গৌরীকে ভিখারী শিবের সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

গৌরী শিবের ঘরে এসে নিদারুণ অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলেন। অনাহারের তাড়নায় দিন যেন আর কাটতে চায় না। শেষে তিনি শিবকে চাষবাস করার যুক্তি দিলেন। শিব অলস প্রকৃতির; কাজেই চাষে তিনি কোন উৎসাহ দেখালেন না। ব্যবসা করার ইচ্ছা, কিন্তু পুঁজিপাটা নেই।

অগত্যা চাষ করতে মন দিলেন শিব। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তিনি ত্রিশূল গলিয়ে লাঙ্গল, জোয়াল, মই তৈরি করে নিলেন। কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান ধার করে আনলেন।

অনুচর ভীমকে নিয়ে শিব চাষাবাদ শুরু করে দিলেন। প্রচুর ধান হল। নারদের কাছ থেকে ঢেঁকি এনে ভীম ধান ভানল। গৌরীর সংসারে আর কোন অভাব রইল না। শিব মর্তে চাষাবাদে এমন প্রমত্ত হয়ে পড়লেন যে কৈলাসে ফিরে যেতে তিনি ভুলেই গেলেন। মর্তে তাঁর আবার কতকগুলো কুচনী সঙ্গিনী জুটল। গৌরী অতিষ্ঠ হয়ে মর্তে উঁডানি মশা পাঠিয়ে দিলেন; তারপর ডাঁস মাছি পাঠালেন। শিব কোনরকমে এদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি লাভ করলেন। আবার জোঁকের ভীষণ উপদ্রব শুরু হল। শিবের পাকা ধানে পোকা পড়ল। শিব তথাপি নির্বিকার; কৈলাসে ফেরার আর নামটি করেন না।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে পার্বতী শিবকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাগ্দিনীর ছদ্মবেশে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বাগ্দিনীর রূপে শিবের মন মজে গেল। তিনি বগ্দিনীকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বাগ্দিনী মোহগ্রস্ত শিবকে ভুলিয়ে কৈলাসে উপস্থিত করলেন। তারপর নারদের পরামর্শে স্বামীকে বশ করার জন্য পার্বতী শিবের কাছে এক জোড়া শাঁখা চাইলেন। কিন্তু শিব ভিখারী, শাঁখা পাবেন কোথায়! শিব ভেবে আর কূল পেলেন না। পার্বতী অভিমান করে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। গিরিরাজের ঘরে তখন দুর্গোৎসব। শিব শঙ্খবণিকের বেশ ধরে শ্বশুর-গৃহে উপস্থিত হলেন। পার্বতী শিবকে চিনতে পারলেন। তিনি দশহাত বাড়িয়ে শিবের কাছে শাঁখা পরে নিলেন। পার্বতীর অভিমান দূর হল। হরপার্বতী আবার কৈলাসে ফিরে এলেন।

মৃগলুব্ধ কাব্যের কবিকুল ॥

মৃগলুব্ধ কাব্যের আদি কবির পরিচয় অজ্ঞাত। পরবর্তিকালের অনেকেরই পরিচয় বিস্তৃতভাবে জানা যায়নি। রামরাজা এবং রতিদেব এই শ্রেণীর কাব্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। রামরাজার কাব্যের রচনাকাল নির্ধারিত হয়নি; তবে অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তাঁর পুঁথিকে প্রাচীন বলেই মনে হয়। কাব্যমধ্যে কবি আত্মপরিচয়কে তেমন বিশদভাবে উল্লেখ করে

যাননি। তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল। অনুমান হয়, তিনি জাতিতে মগ ছিলেন। কারণ, চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মগেরা নামের সঙ্গে 'রাজা' উপাধি যোগ করে নিতেন। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে, রামরাজা বৌদ্ধ হয়ে কেন শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করলেন ; তার উত্তর এই যে, কবি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে শৈব হয়ে যান।

রামরাজা

কাব্যমধ্যে কবি স্থানে স্থানে বর্ণনশক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেমন, শিবচতুর্দশীর ঘোর দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে নিঃসঙ্গ ভয়বিহ্বল ব্যাধের চিত্রটি,—

বিজুলি চমকে মেঘ করিল গর্জন।
মুষল সমান ধার হইল বরিষণ ॥
ঠাটারের ঘায় অগ্নি পড়ে নিরন্তর।
ঘোর অন্ধকার হইল বনের ভিতর ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে ভয় উপজিল।
তরাসে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল ॥

মৃগলুব্ধ কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি হলেন রতিদেব। চট্টগ্রাম জেলায় ব্রাহ্মণ কুলে রতিদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যরচনার কাল ১৬৭৪ খ্রীঃ। রামরাজার চেয়ে রতিদেবের রচনা আরো সরল, ঝরঝরে ও সুন্দর। যেমন, হরিণকে ব্যাধের জালে আবদ্ধ দেখে হরিণীর খেদোক্তি,—

রতিদেব

উঠ উঠ প্রাণনাথ অখনে আসিবো ব্যাধ
ঝাটে উঠ চলি যাই ঘর।
মোর প্রভু সঙ্গে রঙ্গ কোন বিধি কৈল ভঙ্গ
পলকে হরিল প্রাণেশ্বর ॥

শিবমঙ্গলের কবিকুল ॥

শিবমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বিজ মাণিকরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রামকৃষ্ণরায় খ্রীঃ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাব্য রচনা করেন। কাব্যমধ্যে তিনি সর্বত্র 'শিবায়

রামকৃষ্ণ রায়

অথবা 'শিবের-মঙ্গল' কথা দুটির ব্যবহার করেছেন। বিবিধ পুরাণগ্রন্থ— 'কাশীখণ্ড', 'হরি-বংশ', 'কালিকা-পুরাণ', 'বৃহন্নারদীয়', 'শান্তিপর্ব', 'স্কন্দ-পুরাণ', ইত্যাদি হতে শিব-প্রসঙ্গ সঙ্কলন করে রামেশ্বর তাঁর সুবৃহৎ 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করেন। শিবমঙ্গল কাব্যের যাবতীয় তথ্যবস্তুর সন্ধান এই গ্রন্থে পাওয়া যায় বলে ইহাকে শিব বিষয়ক কাব্যের কোষগ্রন্থ (encyclopaedia) বলা হয়ে থাকে। কাব্যমধ্যে কবির সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পবিত্র মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। যৌবনের প্রথম দিকে কবিহিসেবে রামকৃষ্ণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একারণে যৌবনেই কবি 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হন।

রামকৃষ্ণের 'শিবায়ন' কাব্য ছাব্বিশটি পালায় বিভক্ত। বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান একত্র সন্নিবিষ্ট হওয়াতে ইহার অধিকাংশ পালা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একে অন্যের থেকে পৃথক। কাব্যের কাহিনীর মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র নেই। ফলে, বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক সংমিশ্রণে শিবচরিত্ররূপ অভিনব পদার্থ-বস্তুটি সম্ভব হয়ে উঠতে পারেনি। আখ্যানকাব্য রচনার দিক থেকে ইহা একটি মারাত্মক ত্রুটি।

কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু দোষ-ত্রুটি ঘটে থাকলেও দুঃখবর্ণনা, ব্যঙ্গ-কৌতুক সৃষ্টি প্রভৃতি ছোটখাট ব্যাপারে রামকৃষ্ণ বেশ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মাত্র সাড়ে আট বৎসর বয়সে গৌরী যখন বনে গিয়ে শিব-সাধনার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন তখন মা মেনকা গৌরীকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তা সত্যিই মর্মস্পর্শী। মেনকা বলেছেন,—

তনু তোর যেন কাঁচ লুনি।
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী।
হিমপাতে হারাবে পরাণি॥
তপেবে না যাইয় মা গ উমা।
গলায় বান্ধিয়া থাকো তোমা॥

গৌরীর বিবাহকালে দোজবর শিবকে দেখে এয়োগণ যে কৌতুক অনুভব করেছেন তা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এয়োগণ বলাবলি করছেন,—

দোজ বর্যা বরে সই কিছু নহে হারা।
ঊর্ধ্ব মুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা॥

মোল্লা নাহি যায় কেহ ঘরের নিকট।
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাহে কটমট॥
আইয় বলে হের দেখ নারদের নাট।
উঠানে দাণ্ডাল্য ঘর যেন ইন্দ্র কাঠ॥

শিবের সঙ্গে উমার সহবাসের দুঃখ কবি ব্যঙ্গের খোঁচায় সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। শিবকে লক্ষ্য করে আশাহতা দুঃখিনী উমা বলছেন,—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁস ফোঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুণি
পালাইতে পরম আকুলি॥
হস্তপদ যদি নাড়ি চামড়ার খড়খড়ি
শয্যে সাপ করে ইলি মিলি।
এমত সুখের শয্যা ইতে পতি পরিচর্যা
যদি করে নারী তাবে বলি॥

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য স্থান পেয়েছে। সেকারণে ইহা লোকসমাজে এত বড় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। রামকৃষ্ণ রায় তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যের মধ্যে লৌকিকের চেয়ে পৌরাণিক উপাদানগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিবসম্পর্কিত জনপ্রিয় লৌকিক প্রসঙ্গ তিনি পরিত্যাগ করেছেন। এজন্য রামকৃষ্ণ বিদগ্ধ কবি হয়েও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি এবং তাঁর কাব্যাদর্শ বাঙালী পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারেনি।

দ্বিজ শঙ্কর চক্রবর্তী সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পানুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ এবং দুখানি মঙ্গলকাব্য—একখানি শিবমঙ্গল ও আর একখানি শীতলামঙ্গল প্রণয়ন করে শঙ্কর চক্রবর্তী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। কাব্যরচনার গুণে দ্বিজশঙ্কর 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে মল্লভূমির অধিপতি রাজা বীরসিংহের আমলে কবিচন্দ্র শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। ভণিতাতে তিনি সেকথা উল্লেখ করেছেন,—

কবিচন্দ্র

বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদা মতি ইষ্টের চরণে।

সংকার্ত্তন অভিলাষী ভাবায় [illegible] বলি
দ্বিজ কবিচন্দ্রে রস ভণে ॥

শঙ্কর কবিচন্দ্র তাঁর শিবমঙ্গল কাব্যে লৌকিক উপাদান মিশ্রিত করে [illegible] ধরা পালা' ও 'শঙ্খ পরা পালা' নামক যে দুটি পরিচ্ছেদ রচনা [illegible] বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তা পরবর্তী কবিদের জনপ্রিয়তা অর্জনের পথনির্দেশ করে। কবির ভাষা যেমন সহজ, তেমনি সরস। কবিত্বশক্তির নিপুণ প্রয়োগে বর্ণনীয় বিষয়গুলি স্থানে স্থানে বেশ সজীব হয়ে উঠেছে। যেমন, পার্বতীর বাগ্দিনীর বেশে শিবছলনার দৃশ্যটি ;—

সাক্ষাতে হইলা মাতা বাগ্‌দিনী বেশ।
সই সই বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ ॥
বিরলে শিবের সঙ্গে বঞ্চিলেন নিশা।
দেখিতে দেখিতে মূর্তি হইলা সুবেশা ॥
শ্রুতিমূলে পিঠে দোলে দুইকানে সোনা।
কপালে সিন্দুর সাজে নাকে নাকচনা ॥
বাগ্‌দিনী বেশ করি উভ করি খোঁপা।
ফুলমালা তাতে শোভে সুবর্ণের ঝাঁপা ॥
কান্ধেতে ঘুন্‌সিজাল ইসাদের বাড়ি।
পরিপাটি কান্ধে সাজে মৎস্যের চুপুড়ি ॥

শিবমঙ্গলের কবিদের মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য সর্বাধিক জনপ্রিয়। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে (আনুমানিক ১৭১২ খ্রীঃ) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যরচনা করেন। ভণিতাতে তাই কবি [illegible] প্রকাশ করে বলেছেন,—

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

যশোমন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু ॥

রামেশ্বরের কাব্যের নাম 'শিব-সংকীর্তন'। গ্রন্থখানির সমাদর মেদিনীপুর অঞ্চলেই বেশী এবং তথায় ইহা সবত্রই 'শিবায়ন' নামে প্রসিদ্ধ। মঙ্গল কাব্যের মত ইহা আটদিনের গীতব্য বিভিন্ন পালায় ভাগ করে রচিত। রামায়ণের প্রভাবজনিত ইহা 'শিবায়ন' নামে অভিহিত হয়েছে।

রামেশ্বর আত্মসচেতন শিল্পী ছিলেন। নিজের কাব্যগুণ প্রকাশ করতে গিয়ে কোথায়ও বলেছেন, তাঁর রচনায় 'অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু,' আবার কোথায়ও বলেছেন, তাঁর কাব্য হচ্ছে 'ভদ্রকাব্য'। নিজের সম্পর্কে কবির এই উচ্চধারণা অভ্রান্ত নহে। কারণ, তাঁর রচনা যেমন মধুক্ষরা নহে, তাঁর কাব্যও তেমনি ভদ্রকাব্য নয়। ভাষাকে শ্রুতিমধুর করার জন্য তিনি অনুপ্রাস অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ইহা কষ্টার্জিত বলে ফল একেবারে উল্টো হয়ে গিয়েছে। অনুপ্রাসের ঘনঘটায় ভাষা বড়ই শ্রুতিকটু ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। যেমন,—

ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চাণ্ডীপানে চান॥

ভদ্রকাব্য বলতে বোঝায় সেই কাব্য যার মধ্যে কোন অশ্লীল-গ্রাম্য ভাব নেই। কিন্তু কবি যেখানে শিবের লৌকিক কাহিনী বিবৃত করেছেন সেখানে তিনি গ্রাম্যভাবকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। যেমন,—

শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সুপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥

রামেশ্বর দারিদ্র্যপীড়িত শিবের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন। পেটের দায়ে শিব চাষ করতে গেলে, সকলে তাঁকে উপদেশ দিচ্ছে,—

আমার বচন ধর গোসাঁই তুমি কর চাষ
কোন দিন বা অন্ন জোটে কখন উপবাস॥

শিবের ভিক্ষান্ন রন্ধন করে পার্বতী উপবাসী স্বামীপুত্রকে পরিবেশন করছেন; আর তাঁরা হাঘরে দীন-দরিদ্রের মত আহার করে যাচ্ছেন। দশা দেখে পার্বতী বসনে মুখ ঢেকে হাসছেন।

তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি একপাশে।
বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥

সংসার যতই অসচ্ছল হোক, বাংলার বধূ দুহাতে দুগাছা শাঁখা সবসময় পরে থাকে। ইহা একদিকে যেমন স্বামীর জীবদ্দশাকে সংকেতিত করে, অন্যদিকে তেমনি অলঙ্কারের ন্যূনতম চাহিদাকে পূরণ করে। এজন্য বাঙালী

বিবাহিতা নারীর শাঁখা না পরলে নয়। রামেশ্বর পার্বতীর মধ্যে বাঙালী নারীর এই সুচিরবাসনাটি জাগ্রত করে তুলেছেন। হরের কাছে পার্বতী সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন এই বলে,—

দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই॥

কিন্তু ভোলানাথ, মহাদৈন্যমাঝারেও তিনি নত হননি। অভাবের তাড়নায় তাঁর রসনার ধার আদৌ কমেনি। পার্বতীকে দুকথা তিনি শুনিয়েই দিলেন,—

ভিখারীর ভার্যা হয়ে ভূষণের সাধ।
কেন আকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

শিবের কথায় রাগ করে পার্বতী বাপের বাড়ী চলে গেলেন।

দণ্ডবৎ হইয়া দেবেব দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥

উপরি-উদ্ধৃত চিত্রগুলি কবিব সুগভীর আন্তরিকতা ও নিপুণ বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। রামেশ্বরেব 'শিব-সংকীর্তন' একারণে পাঠকহৃদয়কে এত সহজে জয় করে নিয়েছে।

দ্বিজ মণিরাম

দ্বিজ মণিরাম 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' নামে একখানি শিবমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য রচনাব কাল আনুমানিক খ্রীঃ অষ্টাদশ শতক। বিহারের সাঁওতাল পবগণাব অন্তর্গত দেওঘরেব বৈদ্যনাথ শিবেব কাহিনী মণিরামের কাব্যের প্রধান অবলম্বন। এই কাব্যে কবি বৈদ্যনাথের মহিমাজ্ঞাপক মোট ছয়টি কাহিনী বিবৃত করেছেন। শিব এখানে রোগতাপহর, ধনদাতারূপে কীর্তিত হয়েছেন।

শিবমঙ্গলের অন্যান্য কবি

শিবমঙ্গল কাব্যের আরো অনেক কবির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দ্বিজ রামচন্দ্র ও প্রাণচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিজ রামচন্দ্রের কাব্যের নাম 'হর-পার্বতী'মঙ্গল এবং প্রাণচন্দ্রেব কাব্যের নাম 'হরিহর-মঙ্গল'।

[illegible]ীয় খণ্ড : অনুবাদ সাহিত্যের ধারা

প্রথম অধ্যায় : রামায়ণ

[illegible]ত্তিবাস ওঝার রামায়ণপাঁচালী ॥

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী অভিযানের পরে দেশে অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মুসলমান আক্রমণ ও শাসনের ফলে হিন্দুর সমাজ-জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে পর রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের প্রভাব অনুভূত হয়। তার উপর পাঠান সুলতানগণের বিদ্যোৎসাহিতার জন্য মূল সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ কার্য চলতে থাকে। এগুলি অবশ্য আক্ষরিক অনুবাদ নয় ভাবানুবাদ কার্য মাত্র। এভাবে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসরণ করে প্রাচীন যুগে যে-সকল বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত রচিত হয় সেগুলি বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য নামে অভিহিত হয়। এখন ইহাদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাচ্ছে। অনুবাদ সাহিত্য সর্বপ্রথম রামায়ণকে অনুসরণ করেই উদ্ভূত হয়। সেকারণে, রামাণের কথা প্রথমেই আলোচিত হল।

কবিগুরু বাল্মীকি ভারতের আদিকবি এবং তাঁর রামায়ণ ভারতের আদি মহাকাব্য। সাহিত্য জগতে দুই শ্রেণীর কবি আছেন। একশ্রেণীর কবি নিজের সুখ-দুঃখ.ক নিজের কল্পনা ও নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশ্বমানবের করে তোলেন।

রামায়ণী কথা

নিজের অন্তরের কথা শেষ পর্যন্ত সর্বসাধারণের মর্মকথায় পরিণত হয়। ইহারা হলেন গীতিকবি। আর এক শ্রেণীর কবি আছেন, যাঁরা নিজের কথা নয়, একটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথাকে বিশ্বজনের হৃদয়গোচর করে তোলেন। "তাঁদের রচনার ভিতর দিয়ে একটা সমগ্র দেশ, একটা সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে তাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে।"[১] এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে বলা হয় মহাকবি এবং মহাকবির

১। প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে কাব্য তাকে বলা হয় মহাকাব্য। বাল্মীকি হলেন মহাকবি এবং তাঁর রচিত রামায়ণ হল একখানি সার্থক মহাকাব্য। সমগ্র ভারতের জাতীয়-জীবনের আদর্শখানি রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যুগ যুগ ধরে এই রামায়ণ ভারতীয় কবি-মহাকবি-সাহিত্যিক ও আপামর জনসাধারণের স্তন্যদান করে তাদের জীবনকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। "রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্যপ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।"[১]

সাধারণভাবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাঁচালীকে বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ বলা হয়। তবে অনুবাদ কথাটি শুনলে আমাদের মনে যে পুচ্ছগ্রাহিতার ভাবটি জাগে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাঁচালীতে তা নেই।

বাল্মীকির রামায়ণ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাঁচালী

কৃত্তিবাস কোথাও বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, কোথাও তাঁর রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রকে পরিবর্তিত করে নিয়েছেন, কোথাও রামকথাবিষয়ক কাব্যপুরাণাদি হতে নূতন কাহিনী আমদানি করেছেন, কোথাও নিজের স্বকপোলকল্পিত কাহিনী যুক্ত করে দিয়েছেন, প্রয়োজন বোধে রামায়ণের কোন কোন কাহিনীকে এড়িয়েও গিয়েছেন। সুতরাং কৃত্তিবাস বাল্মীকির হুবহু নকল করেছেন একথা কিছুতেই বলা চলে না। কৃত্তিবাস যেখানে বাল্মীকিকে

১। প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুসরণ করে চলেছেন সেখানে তিনি ভণিতায় বাল্মীকির নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন :

বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ ॥

আবার যেখানে বাল্মীকির রামায়ণ ছেড়ে অন্য কোন উৎস হতে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। সেখানে ভণিতাতে তারও নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে হনুমানের ঔষধ আনয়নের ঘটনাটি বর্ণনা করে কবি বলছেন, –

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥

লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রামকর্তৃক নিহত হওয়ার পর বাল্মীকির প্রসাদে আবার তাঁরা পুনর্জীবন লাভ করেন। এই ঘটনাট কবি জৈমিনি ভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। ভণিতা;তে ক'ব সেকথা উল্লেখ করেছেন—'এসুব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে'।

বাল্মীকির রামায়ণ বহির্ভূত একপ অনেক কাহিনী কৃত্তিবাস অন্য গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করেছেন। দস্যু রত্নাকরের কাহিনী, বিশল্যকরণী আনার সময় কালনেমিব বাধাদানেব কাহিনী, রামের রাজ্যপ্রাপ্তির পর সীতাপ্রদত্ত স্বর্ণহারে রামনাম অঙ্কিত না থাকায় হনুমানের তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলার কাহিনী অধ্যাত্মরামায়ণের মধ্যে পাওয়া যায়। দেবীর অকালবোধনের কথা দেবীভাগবৎ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং কালিকাপুরাণে লক্ষ্য করা যায়। দশরথের রাজ্যে শ'ন র প্রকে পের বর্ণনা স্কন্দপুরাণ ও কালিকাপুরাণে পাওয়া যায।

অনেক কাহিনী কৃত্তিবাস নিজে সৃষ্টি কবে নিয়েছেন। যেমন, – সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী, গণেশের জন্ম, কৈকেয়ীর বর লাভ, সম্বরাসুর বধ, গুহকের সঙ্গে মিতালি, হনুমানের সূর্য কক্ষতলে ধারণ, বীরবাহুর যুদ্ধ, তরণীসেন-মহীরাবণ-অহিরাবণ কাহিনী, রাবণবধেব জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালবোধনের কাহিনী, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা, লবকুশের যুদ্ধ ইত্যাদি।

ফুলিয়া-পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা, যিনি বাংলাদেশে পাঁচশ বছর ধরে

কীর্তিতে অধিবাস করে আসছেন, তাঁর জীবনকথা সম্পর্কে এপর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাঁচালীর অনেক পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ইহাদের মধ্যে কৃত্তিবাসের যে আত্মবিবরণী পাওয়া গিয়েছে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, কবির আত্মবিবরণী এক এক পুঁথিতে এক এক রকম। সমস্যার জটিল আবর্তের মধ্যে না গিয়ে বিভিন্ন পুঁথি মিলিয়ে যেটুকু তথ্য প্রামাণিক বলে মনে হয় এখানে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

কৃত্তিবাসের জীবনকথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত চারখানি পুঁথিতে কৃত্তিবাসের পরিচয় অতি সংক্ষিপ্তাকারে পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে এবং ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সংগৃহীত পুঁথিতে কৃত্তিবাসের বংশপরিচিতি, পাঠাভ্যাস, গৌড়েশ্বরের নিকট সম্মানাদি প্রাপ্তি ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। দীনেশ সেনের গ্রন্থ ও ভট্টশালীর পুঁথি অনুসরণ করে কৃত্তিবাসের পরিচয় এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

পূর্ববঙ্গে বেদানুজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নারসিংহ ওঝা নামে এক পাত্র মতান্তরে পুত্র ছিলেন। বঙ্গে প্রমাদ উপস্থিত হলে নারসিংহ দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেস্থানে পূর্ব থেকে মালীরা ফুলবাগান করে বাস করত বলে তার নাম হয় ফুলিয়া। এই গ্রামের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গানদী প্রবাহিত। ফুলিয়াতে নারসিংহ বসতি স্থাপন করলেন। ক্রমে তাঁর পুত্র পৌত্রাদি হল। নারসিংহের পুত্রের নাম গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের আবার তিন পুত্র—মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ। মুরারির সাত পুত্রের মধ্যে একজনের নাম বনমালী। কৃত্তিবাস ওঝা এই বনমালীরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী। শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য) মাঘমাসে আদিত্যবার (রবিবার) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসরে পদার্পণ করে কৃত্তিবাস বিদ্যার্জনের জন্য উত্তরবঙ্গে গমন করেন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করে কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোক রচনা করে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। রাজা তখন পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে বসে আছেন। চারিদিকে নাটগীত হচ্ছে। মাথার উপরে পাটের চাঁদোয়া শোভা পাচ্ছে। রাজার নির্দেশে কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোক পড়লেন। রাজা খুশি হয়ে কবিকে পুষ্পমালা দান করলেন।

পাত্রমিত্র সবাই কবিকে রাজার কাছে তাঁর ইচ্ছামত যে কোন জিনিস চাইতে বললেন। কিন্তু কবি গৌরব ভিন্ন অন্য কিছু নিতে রাজী হলেন না। চতুর্দিকে ফুলিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাসের নামে জয়জয়াকার পড়ে গেল। সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল, "মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী।" বাপমায়ের আশীর্বাদে এবং গুরুর কৃপায় কৃত্তিবাস সাতকাণ্ড রামায়ণ রচনা করলেন।

কৃত্তিবাসের উপরি-উক্ত আত্মবিবরণীতে তিনটি জিনিস অস্পষ্ট রয়েছে। প্রথমত, বেদানুজ রাজার পরিচয়, দ্বিতীয়ত কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল এবং তৃতীয়ত গৌড়েশ্বরের নাম। এই তিনটি বিষয়ের যথাযথ পরিচয় এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতগণ এসম্পর্কে যাকিছু জানিয়েছেন তা সবই অনুমানের উপর নির্ভর করে। ইতিহাসে দুজন দনুজের সন্ধান পাওয়া যায়। একজন চন্দ্রদ্বীপের রাজা; ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন। নারসিংহ তাঁর পাত্র ছিলেন। এই দনুজই কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত 'বেদানুজ মহারাজা'। কিংবদন্তী বা ইতিহাসে দনুজ নামটি পাওয়া যায়; বেদানুজ নামটি কোথাও শুনা যায়নি। কৃত্তিবাসের জন্মসন নির্ণয়েব ব্যাপারে পণ্ডিতগণ একমত হতে পারেননি। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কৃত্তিবাসের জন্মসন ১৩৩৫ খ্রীঃ অঃ, নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ১৪১৩ খ্রীঃ অঃ, দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৩৮০ খ্রীঃ অঃ। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে কৃত্তিবাস ১৩৮৬—৯৮ খ্রীঃ অঃ মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর কৃত্তিবাসের জন্মসন ১৩৯৮ খ্রীঃ অঃ বলে ধরা হয়েছে'। এই মতটি সত্য বলে মনে হয়। কারণ, ইহার সঙ্গে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর কিছুটা সঙ্গতি আছে। অল্পবয়স থেকে কৃত্তিবাসের কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে। আনুমানিক কুড়ি বছর বয়সে অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রীঃ অঃ তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় উপাস্থত হয়েছিলেন। এসময় গৌড়ের সিংহাসনে অধিপতি ছিলেন গণেশ। রাজা গণেশ রাজসাহীর প্রসিদ্ধ ভূস্বামী ছিলেন। প্রাধান্য লাভ করে তিনি ১৪১৪ খ্রীঃ অঃ বাংলার সুলতান হন। ১৪১৮ খ্রীঃ গণেশের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র যদু 'জালালুদ্দিন' নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যদু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুসমাজের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। সেজন্য মনে হয়, কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সভায় উপস্থিত হয়েছেন। রাজা তাঁকে যেভাবে পুষ্পমাল্য

দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন তাতে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং আত্মবিবরণীতে কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের কথা বলেছেন, তিনি সম্ভবত রাজা গণেশ।

কৃত্তিবাসের কবিযশে বাংলাদেশ পূর্ণ হলেও, তাঁর কবিকৃতির যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন বাঙালীর হস্তগত হয়েছে। পঞ্চদশ শতক হতে উনিশ শতক পর্যন্ত কৃত্তিবাসের অসংখ্য পুঁথি নকল হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও শান্তিনিকেতনে কৃত্তিবাসের যে সমস্ত পুঁথি আছে তার সংখ্যা দেড়হাজারের মত হবে। অধিকাংশ পুঁথি অষ্টাদশ শতকেই নকল হয়েছিল। ষোড়শ শতকের কোন পুঁথিই পাওয়া যায়নি। নতুনের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। তাই পুঁথি নকলের পর নতুন পুঁথির দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ত, আর পুরাতন পুঁথি অনাদর-উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকত। এভাবে প্রাচীন পুঁথিগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। পুঁথিগুলি প্রায়ই রামায়ণগায়ক বা কথকদের অধিকারে থাকত। তাঁরা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার জন্য অনেক নতুন পংক্তি ও বর্ণনা যুক্ত করে দিতেন, প্রাচীন দুর্বোধ্য শব্দগুলিকে পাল্টে আধুনিক শব্দ বসিয়ে দিতেন। ইহাতে যেমন নতুন পুঁথির সমাদর বাড়ত, তেমনি আসল পুঁথির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। পুঁথির পাঠ এভাবে গায়েন-কথকদের হাতে পরিবর্তিত হতে হতে এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে তাতে মনে হয়, পুঁথির মধ্যে কৃত্তিবাসের রচনার সামান্যতম অংশও নেই। কোন দুটো পুঁথির পাঠ একরকম নয়। তাছাড়া পুঁথিগুলি সব খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়েছে। ইহার কারণ, সম্পূর্ণ পুঁথি এককালে গান করা গায়েন-কথকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে তাঁরা কেবল জনপ্রিয় অংশগুলি গান করতেন, তাই এই অংশগুলি নকল করা ছাড়া তাঁদের কাছে পূর্ণ পুঁথির নকলের কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয়নি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি ও মুদ্রণ

কৃত্তিবাসের পুঁথি নকলের সময় যেমন লিপিকর ও কথকগণ ইচ্ছামত শব্দ বদলেছেন, পংক্তি পাল্টেছেন, এমনকি এক বর্ণনা বাদ দিয়ে অন্য বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত করেছেন, সেরূপ প্রকাশকগণও মুদ্রণের সময় স্বেচ্ছায় ইহার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। ইহাতে কৃত্তিবাসের রচনাতে যে কেবল আধুনিক শব্দ বা বাক্যাংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তা নয়, প্রকাশকগণের

রচিত বহু পংক্তিও ইহাতে স্থান পেয়েছে। এজন্য ছাপার আকারে আমরা কৃত্তিবাসের যে রামায়ণ দেখি তাতে হয়ত অনুসন্ধান করলে কৃত্তিবাসের রচনার একছত্রও পাওয়া যাবে না। উইলিয়ম কেরীর চেষ্টায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সর্বপ্রথম ১৮০২ খ্রীঃ শ্রীরামপুর মিশন হতে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ এদেশীয় পণ্ডিতগণের সহায়তায় পুঁথির পাঠ মুদ্রিত করেছিলেন। তথাপি পণ্ডিতগণ যে তৎকালীন ভাষা ও শব্দ অনুসারে পুঁথির পাঠ বদলে ফেলেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৩৪ খ্রীঃ পুনরায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনা করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্করত্ন। জয়গোপাল অল্পসল্প কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। এজন্য গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রথম সংস্করণের পাঠ বহু স্থলেই তিনি পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। সেকালের সাহিত্যরসিকগণ মনে করতেন, কৃত্তিবাসের পুঁথিতে অনেক ভুলত্রুটি আছে, মুদ্রণের সময় সেগুলির সংশোধন ও পরিমার্জন করা প্রয়োজন। জয়গোপাল হয়ত, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পুঁথির সংস্কারসাধন করেছিলেন। জয়গোপালের দক্ষ সম্পাদনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমাদর বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে আপন সত্তার অনেকখানি বিসর্জন দিতে হয়েছে।

বটতলার সুলভ ছাপাখানা হতে বহু রামায়ণ মুদ্রিত হয়েছে। ছাপাখানার কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশকদের বিশেষ কোন শিক্ষাদীক্ষা ছিল না বলে মুদ্রণকার্যে বহু ভুলভ্রান্তি ঘটে। বটতলার মোহনচাঁদ শীল নামক জনৈক পুস্তকব্যবসায়ী পণ্ডিত জয়গোপালের সংস্করণটিকেও নাকি নানাস্থানে পরিবর্তিত করে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই সংস্করণ পরে খুবই জনপ্রিয় হয়। ইহাতে বোঝা যায়, এক পুঁথি কত লিপিকর-কথক-গায়েনদের হাতে পড়ে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে এবং সেগুলি মুদ্রিত হওয়ার সময় আবার কত পরিবর্তন লাভ করেছে।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস বাংলাদেশে অসামান্য কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর নাম শোনেনি এমন বাঙালী বাংলাদেশে নেই বললে চলে। কৃত্তিবাসের কবিখ্যাতির এরূপ ব্যাপকতা ও চিরস্থায়ীত্বের কারণ, কৃত্তিবাস বাঙালীর হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ কাব্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালী যা চায়, তা সে কৃত্তিবাসী রামায়ণে পেয়েছে। রামায়ণ-কাব্য তাই যেন বাংলারই জাতীয় কাব্য।

কাহিনী-পরিকল্পনা, চরিত্র-চিত্রণ ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকির অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যে যেমন ঘটনা ও চরিত্রের দৃঢ় গাঁথুনি লক্ষ্য করা যায়, তাতে যেমন বলিষ্ঠ বীর্য, করুণরসের অশ্রুপ্রবাহ, আবেগার্দ্র উচ্ছ্বাস, নিয়তি-পরিচালিত জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লক্ষ্য করা যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা একান্ত দুর্লভ বলেই মনে হয়। বাল্মীকির রামায়ণের কাহিনীকে বহুস্থলে কবি সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন। তবে কয়েকটি কাহিনী রচনায় কৃত্তিবাস উচ্চতর কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। দশরথের সিন্ধুবধ, রামের বনবাস ও ভরতের সঙ্গে তাঁর মিলন, সীতাহারা রামের বিলাপ, লক্ষ্মণের শক্তিসেল, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার নির্বাসন, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ-বর্জন ইত্যাদি কাহিনীভাবে মানবজীবনের বিচিত্র সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে কবিগুরু বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। কবিগুরু রামায়ণেব বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে উচ্চ আদর্শ ও বৃহৎ জীবনের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায় কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার একান্ত অভাব। বাল্মীকির সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী যেন কৃত্তিবাসের কাব্যে জোৎস্না-পুলকিত বসুধাতে পরিণত হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের সেই তেজ নেই, বীরের সেই অনমনীয় দৃঢ় পৌরুষ নেই, নারীর সেই কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠেব ঝংকার নেই, বর্বরের সেই প্রচণ্ড দম্ভ নেই – কৃত্তিবাসেব রামায়ণের মধুপেলব পরিবেশের মধ্যে পড়ে সবই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। বাল্মীকির রাম ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যানুরাগী, সর্বংসহ, আদর্শবান, নরকুলগৌরব। কৃত্তিবাসের রাম কোমলস্বভাব, ভক্তবৎসল, অশ্রুসজল, অক্ষম, কালপুরুষ মাত্র। বাল্মীকির সীতা অচপলদামিনী; তিনি প্রয়োজনবোধে পরুষবাক্য প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হন না, দুঃখ-বিপদকে বুকপেতে গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা-সঙ্কোচে জড়িত হয়ে পড়েন না। কৃত্তিবাসের সীতা পতিভক্তিপরায়ণা, কোমল-স্বভাবা, দুঃখের কঠিন আঘাত সহ্য করা দূরে থাক, তাঁর আলতারাঙ্গা চরণদুখানি কুশাঙ্কুরেও ক্ষতবিক্ষত হয়। বাল্মীকির রামায়ণে যে লক্ষ্মণকে আমরা বলিষ্ঠ পৌরুষের জ্বলন্ত বিগ্রহরূপে দেখি, কৃত্তিবাসী রামায়ণে তিনি এক অপরিণামদর্শী উদ্ধতপ্রকৃতি পুরুষে পরিণত হয়েছেন। রাবণ তাঁর হিংস্র-বর্বর প্রকৃতি বিসর্জন দিয়ে কৃত্তিবাসের কাব্যে শেষপর্যন্ত ভক্ত-পুরোহিতে পরিণত হয়েছেন।

রামায়ণ করুণ রসের আকর। পুত্রশোকে দশরথের প্রাণত্যাগ, রামের

বনবাসে অযোধ্যাবাসীর বিলাপ, সীতাহরণে রামলক্ষ্মণের বিলাপ, রাবণের সবংশে নিধন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার পাতালপ্রবেশ ইত্যাদি ঘটনা পাষাণহৃদয়কেও বিগলিত করে দেয়। করুণরস বর্ণনায় কৃত্তিবাস অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে বাল্মীকির সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা বড় একটা বেশী নয়। বাংলার কোমল মৃত্তিকাগুণে বরং কৃত্তিবাসী রামায়ণে করুণরস আরো জমে উঠেছে। করুণরসের এই আধিক্যের জন্যই বাল্মীকির রামায়ণের স্থানে স্থানে যা একটু বীররসের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা একেবারে মাটি হয়ে গিয়েছে।

কৃত্তিবাসের কবিত্ব

কৃত্তিবাস পণ্ডিতরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। মধুসূদন সত্যই বলেছেন,—'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, হে বঙ্গের অলংকার'। সংস্কৃত ভাষার পরশমণির স্পর্শে তিনি বাংলা ভাষার কলেবরটিকে স্বর্ণমণ্ডিত করে তুলে বাংলা ও বাঙালীর অশেষ মঙ্গল সাধন করে দিয়েছেন। এজন্য বাঙালী তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। বাংলা ভাষার দীন পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ স্বর্ণহীরকদ্যুতির ঝলকানি লেগে কেবল সেযুগের বাঙালীর চিত্ত ঝলমল করে উঠেনি, তা এযুগের সাহিত্যরসিকের চিত্তকেও মুগ্ধ করে দিয়েছে।

পণ্ডিতকবি কৃত্তিবাসের অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন,—

(১) নয়নে কাজল রেখা সিঁথায় সিন্দুর।
দিনমণি দীপ্ত যেন শোভে কর্ণপুর॥

(২) দশমুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে॥

(৩) সশোক থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্বদা রাম, সলীল নয়নে॥

(৪) গায়ে ময়লা পড়িয়াছে মলিন দুর্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা॥

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা, সীতার সতীত্ব, জটায়ু ও ভরতের আত্মত্যাগ প্রভৃতি কৃত্তিবাসের কাব্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি বাঙালী হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা কৃত্তিবাসী রামায়ণে

ভাষারূপ লাভ করেছে। কৃত্তিবাস তাই ভণিতাতে যা বলেছেন বাঙালী তা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য বলে মনে করেছেন। সত্যই—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের এ বিত্ত মধুর।
শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ॥

কৃত্তিবাসের পরে বহু কবি রামায়ণ রচনা করে বিখ্যাত হন। ইঁহাদের মধ্যে অদ্ভুতাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অদ্ভুতাচার্যের গ্রন্থের কোন আদর্শ সংস্করণ সম্পাদিত না হওয়ায় তাঁর কাব্যসম্পর্কে বিশদভাবে কিছু আলোচনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। অদ্ভুতাচার্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তাঁর পিতার নাম শ্রীনিবাস আচার্য (মতান্তরে কাশী আচার্য) এবং মাতার নাম মেনকা দেবী। নিত্যানন্দ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শুনা যায়, নিত্যানন্দ সাত বছর বয়সে স্বয়ং রামচন্দ্রকর্তৃক কাব্যরচনার নির্দেশ লাভ করেন। রামচন্দ্র শরাগ্রে কবির জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখে দেন। এহেন অতি অল্প বয়সে সমগ্র রামায়ণ কাব্য প্রণয়ন করে কবি তাঁর অদ্ভুত কৃতিত্বের জন্য 'অদ্ভুতাচার্য' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ডাঃ সুকুমার সেন, অদ্ভুতাচার্য সম্পর্কীয় এই জনশ্রুতি বিশ্বাস করেননি। তিনি মনে করেন, অদ্ভুতাচার্য কবির নাম বা উপাধি নয়। সংস্কৃত অদ্ভুতরামায়ণ অবলম্বন করে নিত্যানন্দ কাব্য রচনা করেন, বাংলাদেশে এই অদ্ভুতরামায়ণ 'আশ্চর্য-রামায়ণ' নামেও পরিচিত ছিল। 'অদ্ভুতরামায়ণ' ও 'আশ্চর্য রামায়ণ' এই দুই নামের সংমিশ্রণে নিত্যানন্দের কাব্য 'অদ্ভুতাশ্চর্য-রামায়ণ' নামে পরিচিত হয়। 'অদ্ভুতাশ্চর্য' শব্দটি বিবর্তিত হয়ে 'অদ্ভুতাচার্যে' পরিণত হয়।

অদ্ভুতাচার্য সংস্কৃত 'অদ্ভুতরামায়ণ', 'অধ্যাত্মরামায়ণ', 'রঘুবংশ' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্যরচনা করলেও কাহিনীপরিকল্পনা ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কবি-প্রতিভার অভিনব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অত্যধিক জনপ্রিয়তার দরুন হয়তো জনমানসে অন্যান্য কবিদের রামায়ণ গ্রন্থ তেমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অদ্ভুতার্যের রামায়ণ সম্পর্কেও একথা খাটে।

মহিলাকবি চন্দ্রাবতী ॥

মহিলাকবি চন্দ্রাবতী সপ্তদশ শতকের প্রথমে মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের বিদুষী কন্যা। চন্দ্রাবতীর জীবনকথা অবলম্বন করে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'চন্দ্রাবতী' (নয়ান চাঁদ ঘোষ প্রণীত) কাব্য রচিত হয়েছে। চন্দ্রাবতীর জীবনটা ছিল দুঃখপূর্ণ। পরিণত বয়সে তিনি জয়ানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণকুমারের প্রেমে পড়েন। শুভ পরিণয়ের ব্যবস্থা যখন পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, তখন জানা গেল জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করে তাকে বিবাহ করেছেন। চন্দ্রাবতী অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করলেন। তিনি জীবনব্যাপী কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করে রইলেন। কিছুকাল পরে জয়ানন্দের চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হল। অনুতপ্তচিত্তে তিনি আবার ফিরে এসে প্রেমভিক্ষা করলেন চন্দ্রাবতীর কাছে। চন্দ্রাবতী শিবমন্দিরে সমাধি-মগ্না ছিলেন। তিনি জয়ানন্দের কাতর অনুনয়-বিনয়েও মন্দির দ্বার খুললেন না। ব্যর্থকাম হয়ে জয়ানন্দ নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন করেন। চন্দ্রাবতীও শিবারাধনায় দেহত্যাগ করেন।

চন্দ্রাবতীর পূর্ণকাব্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়নি। যতটুকু জানা গিয়েছে তাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, চন্দ্রাবতীর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য ছিল; তাঁর কবিত্বশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় এবং তাঁর কাব্যে করুণরস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

রঘুনন্দন গোস্বামী ॥

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কবি রঘুনন্দন গোস্বামী রচিত 'রামরসায়ন' কাব্য বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কবির বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার মাড়গ্রামে। ভাষা ও ছন্দসৃষ্টিতে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর 'রামরসায়ন' আকারে-প্রকারে মহাকাব্যেরই মত। তবে তাঁর কাব্যে শিল্পের আন্তরিকতা অপেক্ষা পাণ্ডিত্যের পরিচয়টি বড় হয়ে উঠেছে।

অন্যান্য কবি ॥

অন্যান্য রামায়ণরচয়িতাদের মধ্যে ভবানীদাস, কবিচন্দ্র শঙ্করচক্রবর্তী, বৃন্দাবতার রামানন্দ ঘোষ, কুচবিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়ের (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতা) নাম উল্লেখযোগ্য। এসব কবিদের রচনা শিল্পকলার উল্লেখ্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতে পারে না, তথাপি এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা রামায়ণকাব্যের ধারা বহুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মহাভারত

মহাভারতের আদি স্রষ্টা ব্যাসদেব। তাঁর বৃহৎ কাব্যকে সংক্ষিপ্ত করে রচনা করেন জৈমিনি। ব্যাসদেবের মহাভারত এবং জৈমিনিকৃত মহাভারত অনুসরণ করে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মহাভারত রচিত হয়।

রামায়ণের মত মহাভারতও বাঙালীর প্রিয় ধর্মগ্রন্থ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রাণতা, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞা, দ্রোণ-কর্ণ-অর্জুন-ভীমের বীরত্ব, দুর্যোধন-শকুনির শঠকারিতা, বিদুরের কৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব বাঙালী-হৃদয়কে প্রভাবিত করেছে। চৈতন্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা ও মমতাবোধ জাগ্রত হওয়ায় এবং সেইসঙ্গে মুসলমান সমাজের ও হিন্দু-ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মহাভারত অনুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ॥

মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদকদের মধ্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর-নন্দী ও সঞ্জয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবীন্দ্র পরমেশ্বর গৌড়ের প্রসিদ্ধ সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রীঃ অঃ) এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের (১৫১৯—১৫৩২ খ্রীঃ) আমলে মহাভারত রচনা করেন। পরমেশ্বর তাঁর কাব্যে হুসেনশাহ ও নুসরৎশাহ উভয়ের নাম উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) সুলতান হোসেন পঞ্চম গৌড়নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাথ ॥

(২) শ্রীযুক্ত নায়ক সে নসরত খান।
বয়াইল পাঞ্চাল্য যে গুণের নিদান॥

হুসেন শাহ পুত্র নুসরৎ এবং সেনাপতি পরাগল খাঁকে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা চট্টগ্রাম-ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করে সেখানে গৌড়েশ্বরের প্রাধান্য স্থাপন করেন। পরাগল খাঁ তারপর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। রাজ্যে শান্তি ফিরে এলে একদা পরাগল খাঁর মহাভারত-কথা শুনার ইচ্ছা হয়। তাঁর আদেশে তখন পরমেশ্বর ভারত পাঁচালী রচনা করেন। পরমেশ্বরের এই ভারত পাঁচালীই পাণ্ডব-বিজয় নামে পরিচিতি লাভ করে। পরাগল খাঁর আদেশে রচিত হয় বলে ইহা 'পরাগলী মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ। কাব্যের মধ্যে কবি কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর—এরূপ ভণিতা দিয়েছেন। ইহাতে মনে হয় 'পরমেশ্বর' কবির নাম এবং 'কবীন্দ্র' কবির উপাধি। আবার কেহ বলেন, শ্রীকরনন্দী কবির আসল নাম এবং 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' পরাগল-প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। কিন্তু ইহা সত্য নয়। শ্রীকরনন্দী ও পরমেশ্বর দুজন পৃথক কবি। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ব্যাসদেব এবং জৈমিনি ভারত উভয় গ্রন্থ অনুসরণ করে পাণ্ডববিজয় কাব্য রচনা করেন এবং শ্রীকরনন্দী তাঁর পর জৈমিনি ভারত অনুসরণ করে কেবল অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর কাব্যমধ্যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক পরাগল খাঁর গুণকীর্তন করেছেন :

লস্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণসম
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্য নিত্য।

অন্যত্র : শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি।
দরিদ্র ভুঞ্জন যেই অনাথের গতি॥

কবীন্দ্র ব্যাসদেবের মহাভারতই সংক্ষেপে অনুবাদ করেছিলেন। তবে এই অনুবাদ আক্ষরিক নয়, ভাবানুসারী মাত্র। সংক্ষেপে রচনা করার জন্য কবীন্দ্রের কাব্যে শিল্পচাতুর্যের বিশেষ কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। সহজ সরল ভাবে তিনি মহাভারতের কাহিনী বিবৃত করেছেন। যেমন,—

সর্ব্ব সন্য বেরিল অর্জ্জুন একশ্বর।
হেন কালে রণে আইল বির বৃকোদর॥

তবে ভিষ্মে পেচাইল সর্ব্ব বিরগণ।
সবে মিলি কর গিয়া ভীমের নিধন॥
কালান্তক যম জেণ ভীম মহাবির।
সাবধানে মার গিয়া রথে হইয়া স্থির॥
ভগদত্ত জাও ঝাটে বিলম্ব না কর।
ভীমের উপরে শবে মহা অস্ত্র কর॥
ততক্ষণে বেরিয়া মারন্ত যোধগণে।
অন্ধকারে করিলেক শর বরিষণে॥
মেঘে জেণ আবরিল না দেখি ভাস্কর॥
শর জালে আবরিল বির বৃকোদর॥

রূপবর্ণনায় কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন,—

পরিধানে পীতবাস কুসুম বসন।
নবমেঘশ্যাম অঙ্গ কমললোচন॥

অলংকার প্রয়োগেও কবীন্দ্রের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

(১) জৈন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল।
ভীষ্ম ধনঞ্জয় দুই মিশামিশি হৈল॥
(২) অগ্নি জেণ বন দহে নিদাঘ সময়।
অর্জুন এ ভীষ্ম বীরে সৈন্য করে ক্ষয়॥

কবীন্দ্রের ভণিতায় দুখানি মহাভারত পাওয়া যায়। একখানি সংক্ষিপ্ততর ও আর একখানি বৃহত্তর। কোন লিপিকার হয়ত কবীন্দ্রের আসল রচনাকে কাটছাঁট করে পরে তা বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত বলে চালিয়েছেন এবং বৃহত্তর কাব্যটি পূর্ববঙ্গে সঞ্জয়ের মহাভারত নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়।

শ্রীকরনন্দী॥

চট্টগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তা পরাগলখাঁর পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রীকরনন্দী মহাভারত রচনা করেন। জৈমিনির নামে সংস্কৃতে যে অশ্বমেধপর্ব পাওয়া যায়, শ্রীকরনন্দী তাই অনুসরণ করে কাব্যরচনা করেন। ছুটিখান ত্রিপুরার কিয়দংশ বীরত্বের সঙ্গে জয় করলে নৃপতি হুশেন শাহ তাঁকে সম্মানিত করেন এবং ইহাতে ছুটিখানের খ্যাতিও সর্বত্র রটিত

হয়। নিজের খ্যাতি-কীর্তিকে অবিনশ্বর করার জন্য ছুটিখান দেশী ভাষায় (মহামুনি জৈমিনির সংহিতা অনুসরণে) অশ্বমেধপর্ব রচনা করার জন্য শ্রীকরনন্দীর উপর ভার দেন :

দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারেকৈ কীর্তি মোর জগৎ সংসার॥

শ্রীকরনন্দী কবীন্দ্রের মত সংক্ষেপে কাব্যরচনা করেননি। তিনি অশ্বমেধ পর্বের বিস্তৃত অনুবাদ করেছিলেন। ব্যঙ্গরচনায় কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন,—

দেবী সত্যভামা তবে পাইয়া অবকাশ।
দ্রৌপদীকে বোলে তবে কিছু পরিহাস॥
ষোড়শ সহস্র নারী আহ্মি একত্রিত।
এক কৃষ্ণে করিবারে না পারি তাপিত॥
তুহ্মি একাকিনী নারী বড়াহি চাতুরী।
পঞ্চজন নায়কের থাকা আশা পূরি॥
কেমত উপাএ জান ভাল তুহ্মি দেবি।
উদ্দেশে জে তোহ্মাক চরণ আহ্মি সেবি॥

সঞ্জয়॥

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সঞ্জয়কে মহাভারতের আদি অনুবাদক বলেছেন। তিনি সঞ্জয়ের পুঁথি থেকে তাঁর কুলপরিচয় জ্ঞাপক একটি শ্লোকও আবিষ্কার করেন :

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারতকথা কহিলেক মর্ম॥

সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত পুঁথিতেও কবির পরিচয়জ্ঞাপক একটি শ্লোক আছে :

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালি প্রকার॥

দীনেশচন্দ্রের মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সঞ্জয়ের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন। আবার বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গবেষণা করে দেখিয়েছেন, কবীন্দ্রই আসল অনুবাদক; সঞ্জয়ের নামে কোন মহাভারত পাওয়া যায়নি।

বসন্তকুমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের পুঁথি মিলিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বাস্তবিক উভয় কবির পুঁথির মধ্যে এমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় যে তাতে মনে হয়, পুঁথির কোন লেখক বা গায়ক কবীন্দ্রের রচনা কিঞ্চিৎ রদবদল করে নিয়ে কবীন্দ্রের ভণিতার স্থলে সঞ্জয়ের ভণিতা যুক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুঁথি লেখক বা গায়কের নাম সঞ্জয় হতে পারে। কবিযশ অর্জনের জন্য তিনি এই কর্ম করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কবীন্দ্র ও সঞ্জয়ের পুঁথির পাঠ মিলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে উভয়ের মধ্যে আদৌ পার্থক্য নেই :

কবীন্দ্রের মহাভারত—

কচ [ ] ধিয়া তবে বোলে দেবজানি।
পুষ্পবনে গিয়া মোরে পুষ্প দেয় আনি॥
কৈন্যার বচনে কচ চলিল ত্বরিতে।
পুষ্পবন মধ্যে দিয়া পুষ্প আনি দিতে॥
কচকে পাইয়া লাগ কাটিলেক বেঢি।
প্রাণ নেইল তার অগ্নি দিয়া পুড়ি॥
খণ্ড খণ্ড করি মাংশ জল আনে রিতি।
যুক্ররে খোবাইল তার মদ্যের সংহতি॥
বিকাল সময় হৈল কচ নাইল ধবে।
কচ না দেখিয়া কৈন্যা ব্যাকুল সত্বরে॥
বাপের সাক্ষাৎ গিয়া কহে সুবদনি।
ঘরেত না আইল কচ কিহেতু না জানি॥

সঞ্জয়ের মহাভারত—

কচ সঙ্গে দিয়া বাক্য বোলে দেবজানি।
পুষ্পবনে গিয়া মোরে পুষ্প দেয় আনি॥
কন্যার বচনে কচ চলিলা তোরিৎ।
পুষ্পবন মৈদ্ধে যাএ পুষ্পের নিচিত॥
সর্ত্তরে আসিয়া দৈত্য মারিলেক বেড়ি।
প্রাণ লইয়া তারে অগ্নি দিয়া পুরি॥
খণ্ড খণ্ড করি মাংস যেন যাছে নিত্য।
যুক্রের খাবাইল নিয়া মৈদ্যের সহিত॥

বিকাল সময় হৈল কচ না বাইল।
কচ না আইল কন্যা ব্যাকুল হৈল॥
বাপের ধাইতে বোলে কন্যা যুবধনি।
ঘরেত না আইল কচ কি দৈব না জানি॥

তাই বলে সঞ্জয়ের অস্তিত্বকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কারণ, কবীন্দ্র-সঞ্জয়ের রচনার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও আছে। তাছাড়া 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' নামক একটি সম্পূর্ণ নতুন পালাও পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, সঞ্জয় নামে কোন কবি বা লিপিকর বা গায়ক বর্তমান ছিলেন।

সঞ্জয়ের 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' পালায় কবিত্বশক্তির বিশেষ কোন পরিচয় নেই। ইহাতে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে। ইহাতে রামকৃষ্ণদাসের ভণিতা আছে। তাই মনে হয়, 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' পালাটি সঞ্জয়ের মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইহা হয়ত সঞ্জয়ের রচনা নয়। নিম্নে ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল—

দ্রৌপদীরে কোলে করি রহিল রুকমিনি।
যুদ্ধান্ত হৈল সব ষুণ মোহামানি॥
একে একে কোলাহল করিল রমণি।
দ্রৌপদীর প্রসংসা করিল পুনি পুনি॥
পরম হরিসে তান জিনিআ সমর।
সঞ্জএ বোলেন রাজা ষুণ তারপর॥
দ্রৌপদীর জঅ অন্য কুরুগণ পরাজএ।
পদবন্ধ রচি রামকৃষ্ণ দাস কএ॥

রামচন্দ্র খান—দ্বিজরঘুনাথ॥

ষোড়শ শতকে রামচন্দ্র খান এবং দ্বিজরঘুনাথ জৈমিনি ভারত অনুসরণ করে অশ্বমেধপর্ব রচনা করেন। তাঁদের রচনা কাব্যগুণবর্জিত। জনসমাজে ইহাদের খ্যাতি তেমন রটেনি।

কবি অনিরুদ্ধ॥

কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের উৎসাহে কবি অনিরুদ্ধ ভারত পাঁচালী রচনা করেন। অনিরুদ্ধ কামরূপের ব্রাহ্মণকুলে

আবির্ভূত হয়েছিলেন। কাব্যমধ্যে তিনি রাম-সরস্বতী উপাধি প্রয়োগ করেন।

ষষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন ॥

ষোড়শ শতকের মহাভাবত রচয়িতাদের মধ্যে ষষ্ঠীবর সেন ও তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকা জেলার সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে ষষ্ঠীবর সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভণিতায় মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পূর্ববঙ্গে এককালে তাঁর কাব্যের বিশেষ সমাদর ছিল।

ষষ্ঠীবরের পুত্র গঙ্গাদাসও কাব্যরচনায় উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর ভণিতায় মহাভারত কাব্যেব আদিপর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। ভণিতায় প্রায়ই তিনি পিতামহ ও পিতার নাম শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেছেন ঃ

পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর।
যার যশ ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর ॥

কাশীরাম দাস ॥

মহাভারত কাব্যের কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন কাশীরাম দাস। তিনি ষোড়শ শতকের শেষভাগে বর্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরামের পিতার নাম কমলাকান্ত দাস। তিন ভাইই কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর কবিত্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। কবি কাব্যমধ্যে এরূপ আত্মপরিচয় দান করেছেন,—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গীগ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাস-পুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥

কাশীরাম, খুবসম্ভব, মহাভারত কাব্য সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সাড়ে তিন পর্ব রচনার পর তিনি লোকান্তরিত হন এবং অবশিষ্টাংশ তাঁর

ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম সমাপ্ত করেন। এসব অবশ্য অনুমান-নির্ভর। যাহোক কাশীরাম সম্পর্কে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

আদি সভা বন-বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

কাশীরামদাস লোকান্তরিত হলে তাঁর আরব্ধ কার্য যে নন্দরাম সমাপ্ত করেছিলেন তা নন্দরামের উক্তিতে পরিস্ফুট হয়েছে :

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ॥
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক॥
ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব-কথা পরম সাদরে॥
আশীর্বাদ দিয়ে মোরে গেলা সেইজন।
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্বাদ দিল।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল॥

কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে কাব্যরচনা করেন। সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য তিনি রচনা করে যান বা না যান তাঁর নামে সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের মত কাশীদাসের কাব্যেও অজস্র প্রক্ষেপ ঘটে। লিপিকর-গায়েন-কথকদের কৃপায় তাঁর কাব্যের বহু অংশ পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক স্থানে হয়ত কোন অখ্যাত কবির রচনা যুক্ত হয়েছে। এভাবে কাশীরামের মহাভারতের আসল রূপ বহুলাংশে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মহাকবির কাব্যের কোন নির্ভরযোগ্য সংস্করণ আজও প্রকাশিত হয়নি। বাঙালীর ঘরে ঘরে আজকে যে সুসম্পূর্ণ কাশীদাসী মহাভারত বিরাজ করছে তার মধ্যে খ্যাত-অখ্যাত কত কবির রচনা যে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

কাশীদাসী মহাভারতে যত ভেজাল থাক তাতে মহাভারতের রসাস্বাদে বাঙালীর কোন অসুবিধাই হয়নি। মহাভারত পাঠের চতুর্বর্গ ফল বাঙালী

হাতে হাতেই পেয়েছে। তাই আজও তারা ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে সুর করে করে কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করে থাকে।

চন্দ্রচূড়-জটাজালে জাহ্নবীর পাবনী ধারার ন্যায় সংস্কৃতভাষার মধ্যে মহাভারত কাব্যের রসস্রোত নিবদ্ধ হয়ে ছিল। মহাকবি কাশীরামদাস স্বীয় তপস্যার দ্বারা ভাষাপথ খনন করে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতেব রসস্রোত আনয়ন করেন। ইহাতে বাঙালীর চিরকালের মহাভারত-রসপিপাসা দূরীভূত হয়। কাশীরামদাস যে অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভাব অধিকারী ছিলেন তা তাঁর এই সংস্কৃত মহাভারতের সার্থক বাংলা অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে। কাশীরামের কাব্যে অলংকার প্রয়োগ ও বর্ণনশক্তির নিপুণ পরিচয় লাভ করা যায়। লক্ষ্যভেদের পূর্বে অর্জুনেব রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন,—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা॥

কাশীরামের ভাবসমৃদ্ধ কান্ত-কোমলপদ, মহাভারতের অমৃতসমান পুণ্য কাহিনীবিবৃতি বাঙালী মানস-পটে চিরজাগ্রত হয়ে রয়েছে। কাশীবাম মহাভারত রচনা করে কেবল বাঙালীব মহাভারত-রস তৃষ্ণা নিবারণ করেননি, সেইসঙ্গে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অশেষ উন্নতিবিধান করে গিয়েছেন—বহু কবিব কাব্যরচনায় অনুপ্রেরণা দান কবে গিয়েছেন। এজন্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষবে লিখিত থাকবে।

দ্বৈপায়ন দাস॥

কাশীরাম দাসের পুত্র দ্বৈপায়ন দাস একখানি ক্ষুদ্রাকৃতি মহাভারত কাব্য প্রণয়ন করেন। কাব্যমধ্যে তিনি পিতার অতুল কীর্তির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। ভণিতাতেও তিনি পিতার নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন,—

কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

মহাভারতের অন্যান্য কবি ॥

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অনেক কবি মহাভারত কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ দাস, শঙ্কর চক্রবর্তী, সরলাদাস ও রাজেন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রচনা একান্তই গতানুগতিক, কাব্যগুণবর্জিত। মহাভারতের সজীব রসস্রোত ইঁহাদের সময়ে একেবারে শুষ্ক প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ভাগবত

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের[১] অন্যতম এবং বৈষ্ণবধর্মসম্প্রদায়ের নিকট ইহা ভক্তি রসাত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সমাদৃত। পৌরাণিক মতে ব্যাসদেবই ভাগবত পুরাণের রচয়িতা। ব্যাসনন্দন শুকদেব পিতার কাছ থেকে ভাগবতের কাহিনী শুনেছিলেন এবং রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হলে তিনি তাঁকে ভাগবত শুনিয়েছিলেন। অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসদেবের নামে চলে আসছে। মহাভারতস্রষ্টা গীতসঙ্কলক ব্যাসদেব এই পুরাণগুলি সব রচনা করেছিলেন, একথা আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। ভাগবতপুরাণও তাঁর রচনা নয়। ভাগবত খুব প্রাচীন না হলেও ইহা অষ্টম শতকের পরবর্তী রচনা নয়।

ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে সমাপ্ত। ইহার তিনশ বত্রিশটি অধ্যায়ে আঠার হাজার শ্লোক গ্রথিত আছে। এই গ্রন্থে মহাভারত ও গীতার প্রভাব লক্ষিত হয়। ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষ প্রচলিত হয়।

মালাধর বসুর আত্মপরিচয় জ্ঞাপক কয়েকটি পংক্তি থেকে জানা

১। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

যায়, তিনি বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্ভুক্ত মেমারী রেল স্টেশনের নিকটবর্তী কুলীন গ্রামের বিখ্যাত কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে এই কুলীনগ্রাম বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যবন হরিদাস নাকি এই গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতেন। মহাপ্রভুর দৌলতে এই কুলীনগ্রাম পরবর্তিকালে বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়। কুলীন গ্রাম সম্পর্কে মহাপ্রভুর ধারণা খুব উচ্চ ছিল। তিনি বলতেন,—'কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর', 'সেহো মোর প্রিয় অন্যজনে বহুদূর॥' মালাধবেব পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতার নাম ইন্দুমতী। তাঁর পৌত্র (মতান্তরে পুত্র) রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন।

মালাধর বসুর পরিচয়

কেদারনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত মালধরেব শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মুদ্রিত সংস্করণে রচনাকালজ্ঞাপক একটি শ্লোক পাওয়া গিয়েছে :

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

এই শ্লোক হতে জানা যায়, মালাধর বসু ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খ্রীঃ অঃ) কাব্যরচনা আরম্ভ করে ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) সমাপ্ত করেন। এই সময় গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহ (১৪৫৯—৭৪খ্রীঃ অঃ)। এই বরবক্ শাহই কবিকে 'গুণরাজখান' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

মালাধর বসু ভাগবতের দশম-একাদশ স্কন্দের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানি 'গোবিন্দবিজয়' ও 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। বিজয় অর্থ বিজয়গৌরব এবং মঙ্গল অর্থ গৌরবপ্রচার। কৃষ্ণের মহিমা-প্রচারই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য, এই হেতু ইহার 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল' নাম যথোচিত হয়েছে। ভাগবতের অনুবাদ হিসেবে শ্রীকৃষ্ণবিজয় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে, ইহার বাইরে ইহার বড় একটা জনপ্রিয়তা ছিল না। চৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানিকে খুবই মান্য করতেন। এই কাব্যের একটি পংক্তি—'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' চৈতন্যকে বিমুগ্ধ করেছিল। এই পংক্তির 'প্রাণনাথ' শব্দটি পরবর্তিকালের বৈষ্ণব ভক্তদের মনে রাগানুগা-সাধনার আভাস দান করেছিল বলেই মনে হয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যপরিচয়

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা (কৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে মথুরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত), মথুরা লীলা (মথুরায় কংসবধ থেকে আরম্ভ করে দ্বারকাগমনের পূর্ব পর্যন্ত) এবং দ্বারকালীলা (দ্বারকাযাত্রা থেকে শুরু করে দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত) বর্ণিত হয়েছে। ভাগবতের মূল কাহিনী অনুসরণে মালাধর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু কবিত্বপ্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি তেমন মনঃসংযোগ করতে পারেননি। কাব্য-বিচারের মানদণ্ডে বিচার করলে মালাধরের রচনাশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় হবে বলে মনে হয় না। মূল সংস্কৃতের সেই ভাষাগাম্ভীর্য মালাধরের রচনায়' নেই বললে চলে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন স্থলে মালাধরের কবিত্বশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্বে গোপীদের দুঃখার্তি—

আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখী কল্পতরুমূলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধন লোভে লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥

অলংকারপ্রয়োগে কবির নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—

(১) চিয়াইয়া জসোদা পুত্র দেখি পাসে।
পুন্নিমার চন্দ্র জিন উদয় আকাসে॥

(২) পূর্ণিমার চাঁদ জেনি বদন কমল।
খঞ্জন জিনিঞা শোভে নয়ান জুগল॥

(৩) চৌদিকে গোপিনিগণ মদ্ধে নন্দবালা।
পুন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা॥

(৪) অচেতন হৈয়া দেবী পৃথুবিতে পড়ে।
কদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে॥

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে মাধবেন্দ্রপুরী বাংলাদেশে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রিত ভাগবত ধর্ম প্রচার করে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি জীবনে নতুন চেতনা সঞ্চার করেন। তারপর পঞ্চদশ শতকে মালাধার বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করে সেই চেতনাকে উদ্দীপিত করে তোলেন।

গোবিন্দ আচার্য ও পরমানন্দ গুপ্ত ॥

মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর সমকালে ভাগবত বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও তাঁর তিরোধানের পর এই গ্রন্থের সমাদর অনেকটা কমে যায়। ইহার প্রথম কারণ, চৈতন্যযুগে বা তার পরবর্তী যুগে ভাগবত রচনার নিমিত্ত কোন প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব হয়নি। দ্বিতীয় কারণ, চৈতন্য যুগে পদাবলী সাহিত্য ভক্তজনচিত্তে ভক্তিবারিনিষেকে অধিকতব কার্যরকী হয়েছিল। পদকতাগণ ভাগবতেব রসপিপাসা মধুব পদাবলীর দ্বারাই নিবৃত্ত করেছিলেন। এজন্য ভাগবতের অভাব তেমন অনুভূত হয়নি। তৃতীয় কারণ, ভাগবতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাই বর্ণিত হয়েছে; চৈতন্যপ্রভাবে কৃষ্ণের মাধুর্যলীলা বৈষ্ণবসমাজে অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ায় ভাগবতের ঐশ্বর্যলীলার আকর্ষণ অনেকটা কমে যায়। ভাগবতকারগণ অনুবাদকালে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলাকে অবহেলা করতে পাবেননি। তাঁরা চিরাচরিত প্রথানুসারে ভাগবতের দশম-দ্বাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা কবেন।

তথাপি চৈতন্যপ্রভাবে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মেব প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষ্ণলীলা ও ভক্তিধর্মের আকব গ্রন্থ ভাগবতের প্রতি ভক্তকবিদের দৃষ্টি পড়ে। চৈতন্যের অনেক ভক্ত ও অনুচর ভাগবতের অনুবাদকার্যে প্রয়াসী হন। গোবিন্দ আচার্য ও পবমানন্দ গুপ্তের ভাগবতানুবাদের কথা বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। গোবিন্দ আচাযের 'কৃষ্ণমঙ্গলে'র পুঁথি মুদ্রিত হয়নি এবং পরমানন্দের কৃষ্ণলীলার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষ্ণমঙ্গলের কবি গোবিন্দ আচার্য এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দভক্ত পদকর্তা গোবিন্দ আচার্য সম্ভবত একই ব্যক্তি। কাব্যমধ্যে কবি 'দ্বিজ গোবিন্দ' ভণিতা ব্যবহার করেছেন এবং কৃষ্ণলীলাকে সর্বত্র 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' বলেছেন। তিনি গোটা ভাগবত অনুসরণ করে কাব্যরচনা কবেন।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ॥

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ভাগবতেব দ্বাদশটি স্কন্ধ অনুসরণ করে 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' কাব্য রচনা করেন। রঘুনাথ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মূলকে অবিকৃত

রেখে অনুবাদকার্য সম্পাদান করেন। কোন স্বকপোলকল্পিত কাহিনী তিনি কাব্যমধ্যে যুক্ত করেননি। গ্রন্থমধ্যে রঘুনাথ আত্মপরিচয় দেননি। ভণিতাতে তিনি প্রায়ই সর্বত্র 'ভাগবতাচার্য' উপাধি ব্যবহার করেছেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত আছে, মহাপ্রভু রঘুনাথের ভাগবত-পাঠে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দান করেছিলেন :

প্রভু বলে ভাগবত এমন পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বৈ আর কোন না করিহ কার্য॥

চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎলাভের পর রঘুনাথ ভাগবত অনুবাদে মনোযোগী হন। মহাপ্রভু তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধি দিয়েছিলেন বলে কবি এই উপাধি ভণিতারূপে বেশি ব্যবহার করেছেন :

ভাগবত আচার্যের মধুরস বাণী ।
সাবধানে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

রঘুনাথ পণ্ডিতের ভণিতাও তিনি ব্যবহার করেছেন :

ভক্তিরসগুরু গদাধর শিরোমণি।
রঘুনাথ পণ্ডিতের প্রেমতরঙ্গিণী॥

রঘুনাথের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'তে কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি গোপীদের কৃষ্ণবিরহের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

তোমারে পড়িল মনে চাহি বৃন্দাবনপানে
ধ্যান করি ও রাঙ্গা চরণ।
ফুকরে কাঁদিতে নারি অনিমিষে পথ হেরি
যাবৎ না হয় দরশন॥
বুঝিতে না পারি মেনে নিদয় হইল কেনে
ওহে শ্যাম না কর চাতুরী।
ত্যজি সব পরিবার তুয়া পদ কৈল সার
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি॥
যে ভজে তোমার পায় তার কি এ দশা হয়
গৃহধর্ম সকল পাসরে।

যেন কাঙালিনী হঞা পথে পথে ভ্রমাইয়া
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে ॥
কোথা আছ প্রাণকানু বাজাও মোহন বেণু
তবে বাঁচে গোপীর জীবন।
ক্ষণেক বিলম্ব দেখি শরীর বিকল সখি
কোথা কৃষ্ণ দেহ দরশন ॥

রঘুনাথের কাব্যে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব উভয়ের পরিচয় আছে। তথাপি ইহা তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

মাধবাচার্য মূলত ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে ষোড়শ শতকের শেষার্ধে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। ভাগবত ছাড়া কবি হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে প্রয়োজনমত কাহিনী গ্রহণ করেছেন। কাব্যমধ্যে কবি তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন :

(১) রাজরাজ অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে ॥
(২) পারিজাত হরণ ঈষৎ ভাগবতে ॥
বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে ॥

মাধবাচার্যের কবিত্বশক্তি তেমন প্রশংসনীয় নয়। তাঁর রচনায় আদিরসের নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেছে। রাধাকৃষ্ণের মিলন দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন—

কমলে ভ্রমর যেন লাগে জড়াজড়ি।
আই আই করিয়া ডাকেন বড়াই বুড়ী ॥
চারিভিতে সখীগণ করে কানাকানি।
দেখিতে আসিতে লাজ না ধরে পরাণী ॥
রাধাকানুর ধামালি দেখিয়া সব সখী।
নয়নে বসন দিয়া ঘন হাস্যমুখী ॥

দুঃখী শ্যামাদাসের গোবিন্দমঙ্গল ॥

ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে শ্যামাদাস 'গোবিন্দমঙ্গল' রচনা করেন। অবশ্য প্রয়োজনানুসারে তিনি অন্যান্য স্কন্ধ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেন।

কবি কোথায়ও অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেননি, কেবল আখ্যানটিকে বিবৃত করেছেন মাত্র।

মেদিনীপুর জেলার কেদারকুণ্ড পরগণার হবিপুর গ্রামে শ্যামাদাস জন্মগ্রহণ করেন। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বা শেষভাগে তিনি কাব্যরচনা করেন। শ্যামাদাস তাঁর 'গোবিন্দমঙ্গল' কখন গান করে, কখন পাঠ করে শুনাতেন বলে জনসমাজে তিনি কিছু খ্যাতিপ্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তবে শ্যামাদাসের কাব্যে কবিত্বশক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন নেই। তাঁর রচনা থেকে কৃষ্ণের বংশীরবে গোপীদের চিত্তব্যাকুলতার বর্ণনাটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল:

গৃহে এক গোপ নারী গোরস নিয়োগ করি
কানুর মুরলী তারে ডাকে।
শুনিয়া মোহন বেণু ধরিতে না পারে তনু
চলে বেগে বৃন্দাবনমুখে॥
এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়া ভোজন করে
তার নামে মুরলী ডাকিল।
শ্যামগুণে মোহমতি চলিল সে দ্রুতগতি
হাত পাখালিতে না পারিল॥
চুলিতে বসায়ে দুগ্ধ এক গোপী হৈলা মুগ্ধ
বাজে বাঁশী তার নাম ধরি।
উন্মত্ত মদন-বাণে চলে সে কানুর স্থানে
গৃহকর্ম দূরে পরিহরি॥

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অনেক কবি ভাগবত অনুসরণ করে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণদাসের (কাশীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস', অভিরামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' দ্বিজ পরশুরামের 'কৃষ্ণমঙ্গল', বলরামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত', শঙ্কর চক্রবর্তীর 'ভাগবতামৃত' উল্লেখযোগ্য। ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থগুলি শিল্পকার্যের উল্লেখ্য নিদর্শন না হলেও বাংলা সাহিত্যের কলেবর-বৃদ্ধিতে ইহারা কিছুটা সহায়তা করেছে। বৈষ্ণব ভক্ত এবং কৃষ্ণলীলারস পিপাসু সাধারণ জনের তুষ্টিসাধনেও এগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। এসব কারণে ভাগবতগ্রন্থের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায় : লোকসাহিত্যের ধারা

লোকসাহিত্যের পটভূমি

লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ॥

যে সাহিত্য কোন বিশেষ ব্যক্তির চিন্তা বা সাধনা থেকে উদ্ভূত হয় না, যা মানুষের মনে আপনা থেকেই জন্মায়, যার মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্বকথা বা কোন রকমের নীতি-উপদেশ নিহিত থাকে না, কিন্তু নিতান্ত সরল প্রাণের সুখ-দুঃখ-কান্না, হাসি-খুশি ইত্যাদির অনাড়ম্বর প্রকাশ ঘটে এবং যা নিত্য-পরিবর্তনশীল নদীধারার মত মানুষের মনে বিরাজ করে তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য।

কাব্য-নাটক, গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি উচ্চতর সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, স্রষ্টার মধুরসসিক্ত মনন কল্পনা সেখানে একটি অপরূপ শিল্প শোভার সার নয়নভুলান মূরতি রচনা করে রেখে দিয়েছে। একটি বিশেষ-কালের আলো-হাওয়ার মধ্যে একটি ভক্তের পূজারতির ফলেই ইহার উদ্ভব ঘটেছে। উচ্চতর সাহিত্যের মধ্যে তাই আমরা এক বিশেষ সময়ের বিশেষ ব্যক্তির পরিচয় পাই। লোকসাহিত্যের কিন্তু কোন কালের বাঁধন নেই। কোন্ সুদূর অতীতে কে যে তাকে সৃষ্টি করে রেখেছে এসব তথ্য উদ্ধার করা কোন পুরাতত্ত্ববিদের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়ত ইহা প্রথমে কোন ব্যক্তির জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সহজ বোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল, কিন্তু তারপর ইহা লোকের মুখে মুখে যতই ফিরেছে ততই নিত্য নতুন পরিবর্তন লাভ করেছে। এজন্য বলা হয় লোকসাহিত্য ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, সমাজের সৃষ্টি। মাকে যখন আমরা শিশুকে এই গান গেয়ে ঘুমপাড়াতে দেখি—

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো।
সেজ নেই মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বোসো॥
বাটা ভরা পান দেব, গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব, ফুড়ুৎ করে যেয়ো॥

তখন মনে হয়, অতীতের কত অগণিত মায়ের কণ্ঠস্বর আমরা ইহার মধ্যে শুনতে পাচ্ছি। এমনি করে অতীতের কত মা শিশুকে ঘুম পাড়াতে

গিয়ে তাঁদের প্রাণের ক্ষুদ্র বেদনাটুকু এভাবে ব্যক্ত করে এসেছেন এবং ইহাই আবার ভবিষ্যতে কত মায়েব অপার স্নেহ-বাৎসল্যে ভবা প্রাণকে গভীরভাবে আকর্ষণ করবে। ছড়া-গান শুনতে শুনতে আমাদের হৃদয়ে ছোট ছোট সুখ, ছোট ছোট দুঃখ কথা জেগে ওঠে, কিন্তু কখন এমন প্রশ্ন মনে আসে না, ইহার বচয়িতা কে বা ইহার উৎপত্তি কোন সময়ে।

উচ্চতর সাধনসঙ্গীতের মধ্যে (চর্যাগীতি-বৈষ্ণবপদাবলী-শাক্তপদাবলী-বাউলগান) যেমন গূঢ় তত্ত্বকথা, সম্প্রদায়গত বিধি-বিধান আচাব-অনুষ্ঠানের নির্দেশ থাকে, লোকসঙ্গীতেব মধ্যে তেমন কোন তত্ত্বকথা বা বিধি-বিধানের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় না। ইহার মধ্যে সাদা প্রাণেব সাদা কথা শুনতে পাওয়া যায়:

মন আমার চিনির বলদ চিনি বয়, চিনে না চিনি,
ও! ভুলে কল্লি না একদিন চিনিব সাথে চিনা চিন।
কার কি কুমন্তলা পেলে,
ঘোল খেতে চাও মাখন ফেলে,
ওহে! বুঝবে মজা নোকৃবি পেলে
(তখন) সাব হবে শুধুই কাঁদুনী।
ওহে! সোনাব কমল গেছ ভুলে,
মজে আছ শুকনো ফুলে,
আবার সোজা পথে কাঁটা দিলে,
কি সাহসে বল শুনি
ওহে! জমির বলে অবোধ মন,
বাঁচবে যদি চিনি চিন,
কেন কড়ি দিয়ে জহর কিন,
আপন হাতে খাও আপনি।[১]

ছোট প্রাণের ছোট ছোট দুঃখকথাই লোকসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য:

ও পাবেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পাবেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমাব, মন কেমন করে॥

১। বাংলার লোক সাহিত্য—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত।

এ মাসটা থাক দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে॥
হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥[১]

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য॥

উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে লোকসাহিত্যের কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়:

(১) লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়, সমাজের সৃষ্টি।

(২) ইহা পরিবর্তনশীল (Dynamic)। নিত্যনতুন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইহা অগ্রসর হয়ে থাকে।

(৩) লোকসাহিত্যের মধ্যে একটা চিরত্ব আছে। কোন সুদূর অতীতে ইহা সৃষ্টি হয়েছিল; তারপর থেকে ইহা ঠিক লোকের মুখে মুখে চলে আসছে।

(৪) লোকসাহিত্যের কোন লিখিত রূপ নেই। মানবমনে সৃষ্টি হয়ে ইহা মানবমনেতেই বিরাজ করে।

(৫) লোকসাহিত্যের মধ্যে সামজিক আদর্শের স্বীকৃতি দান, ধর্মের জয় ঘোষণা, মানবজীবনের অতি সাধারণ সুখ-দুঃখের বর্ণনা দেখা যায়।

(৬) ইহার প্রকাশ সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনামণ্ডিত। কোন তথ্যবহুল বা ঘটনাবহুল কাহিনী ইহার মধ্যে থাকে না।

(৭) লোকসাহিত্য সাধারণত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে রচিত হয়।

(৮) কোন গূঢ় তত্ত্বকথা নয়, প্রাণের সহজ সরল সুরটি হৃদয়বীণার তারে ঝংকৃত করে তোলাই লোকসাহিত্যের কাজ।

(৯) লোকসাহিত্যের একটা সার্বজনীন আবেদন আছে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিত্তকে ইহা চকিতে স্পর্শ করে।

(১০) লোকসাহিত্য বাস্তবচেতনাসম্ভূত। কোন অলৌকিক ঘটনা বা কোন অবিশ্বাস্য কাহিনী বা কল্পনাজগতের কোন গভীর ভাব ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

লোকসাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্য॥

লোকসাহিত্য নিরক্ষর-অল্পশিক্ষিত মানুষের সৃষ্টি হলেও ইহার মধ্যে

১। লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিত্বশক্তির অপরূপ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। জীবনসত্যের সুগভীর ইঙ্গিত, দুঃখবর্ণনার নৈপুণ্য, সুন্দর প্রকাশভঙ্গী, ধ্বনিসৃষ্টি-রূপসৃষ্টির দক্ষতা ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন লোকসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে।

যেমন,—

(১) এমন রসের নদীতে, সই গো,
ডুব দিলাম না।
নদীর কূলে কূলে ঘুরে বেড়াই
সই, পাই না ত ঘাটের ঠিকানা॥
নিত্য ঘাটে স্নান করিতাম,
জলের ছায়ায় ঐ রূপ দেখিতাম (লো),
জলে নামিবার আশা করি
সই, মরণেব ভয়ে নামলাম না।
এমন রসের নদীতে, সই গো,
ডুব দিলাম না॥

(২) শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাসি।
একরাত্রে ফুটা ফুল ঝইবা হইল বাসি॥

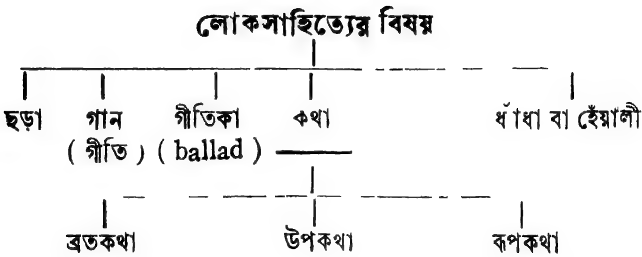
(৩) প্রথম যৌবন কন্যা কমনীয় লতা।
সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা॥
নাসিকা হালিয়া পড়ে শ্বাস বহে ঘনে।
মবণ বসিল আসি নয়নেব কোণে॥
বৈকালীর রাঙ্গা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায়॥

(৪) আয়বে আয় ছেলের পাল মাছ ধবতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই॥
এ নদীব জলটুকু টল্‌মল্ কবে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুরঝুর করে।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

(৫) ধন ধন ধনিয়ে
কাপড় দেব বুনিয়ে।
তাতে দেব হীরের টোপ,
ফেটে মরবে পাড়ার লোক ॥

লোকসাহিত্যের বিষয়বিভাগ ॥

লোকসাহিত্যের বিষয়কে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) ছড়া, (২) গান বা গীতি, (৩) গীতিকা (ballad), (৪) কথা এবং (৫) ধাঁধা বা হেঁয়ালী। ইহাদের মধ্যে 'কথা' আবার ব্রতকথা, উপকথা, রূপকথা ইত্যাদিতে বিভক্ত। বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য নিম্নে ইহার একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া হল:



দ্বিতীয় অধ্যায়: ছড়া

ছড়াই হল লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য ছড়ার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ভাল করে দেখতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছুই নেই। ছড়া শিশু-সাহিত্য। মানবসমাজে শিশু সবচেয়ে প্রাচীন, সেইসূত্রে তার জন্য সৃষ্ট ছড়াও প্রাচীন।

লোকসাহিত্যের যে একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য—ইহা ব্যক্তির একক সৃষ্টি নয়, সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি তা ছড়ার মত আর কোন বিষয়ের উপর এমন নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। ছড়া হল অসংলগ্ন অসংবদ্ধ রচনা। ইহার মধ্যে ভাবের পরিণতি বা ঘটনার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সঙ্গীত, গৃহের একটি আস্বাদ, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ছড়া যাদের জন্য সৃষ্টি, সেই শিশুমন কোন বিচারবিতর্কের অপেক্ষা করে না বলে ছড়ার মধ্যকার কোন ত্রুটিবিচ্যুতি ইহার রসাস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ছড়ার মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'ছেলেভুলানো ছডা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,—"আমি ছডাকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছডাও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহিব, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃংখল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহবসে বিগলিত হইয়া কল্পনা-বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতাগুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছডাগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধন-শূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।" নিম্নে ছড়ার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে :

(১) খোকা এল বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন খ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে॥

(২) পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো'সে।
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে, বেগুন কোটো'সে॥
ও বেগুন কুটো না, বীচ রেখেছে।
ও ঘরেতে যেয়ো না, বঁধু এয়েছে॥
বঁধুর পান খেয়ো না, ঝগড়া করেছে।
দাদাকে দেখে কদম-পানা ফুটে উঠেছে॥

(৩) মাসিপিসি বনকাপাসি বনের মধ্যে টিয়ে।
মাসি গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন—
আজ হতে জানলাম মা বড়ো ধন॥
মাকে দিলাম শাঁখা শাড়ি।
বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া॥
ভাইয়ের দিলাম বিয়ে—
কলসীতে তেল নেইকো, কিবা সাধের বিয়ে।
কলসীতে তেল নেইকো, নাচব থিয়ে থিয়ে॥

(৪) ওপারে তিল গাছটি
তিল ঝুর ঝুর করে।
তারি তলায় মা আমার
লক্ষ্মী প্রদীপ জ্বালে॥
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকুচ্ছেন।
বাবা আমার বুড়োশিব
নৌকা সাজাচ্ছেন॥
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর
ঘড়া ডুবাচ্ছেন।
ওই আসছে প্যাখনাবিবি
প্যাক্ প্যাক্ প্যাক্—
ও দাদা দেখ্ দেখ্ দেখ্॥

(৫) এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদ্‌লাতলায় বসে—
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যাব পরের ঘরে পর-অধীন হয়ে—
পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে॥

(৬) খোকামণির বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে।
তারা গাই বলদে চষে॥

তারা হীরের দাঁত ঘষে।
রুইমাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে॥
খোকার দিদি কোণায় বসে আছে।
কেউ দুটি চাইতে গেলে বলে আর কি আমার আছে॥

তৃতীয় অধ্যায়ঃ গীতি

যাঁর মধ্যে প্রাণের সহজ সুরটি ধরা পড়ে এবং যা লোকের মুখে মুখে ফিরে তাকে বলা হয় লোকগীতি (folk-song)। লোকগীতির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, ইহাতে জীবনের কোন জটিল জিজ্ঞাসা বা কোন কাহিনী থাকে না। অনেক সময় রূপকের সাহায্যে ইহার ভাবখানি লোকসাধারণের কাছে আরো সুস্পষ্ট করে তোলা হয়। তবে কথার চেয়ে সুরের আকর্ষণ লোকসঙ্গীতে বেশী। ইহা নিতান্ত আঞ্চলিক। এক এক অঞ্চলে এক এক রকম গীতি প্রচলিত আছে। যেমন পশ্চিম বাংলায়—পটুয়া, ভাদু, ঝুমুর; উত্তর বাংলায়—গম্ভীরা, জাগ, ভাওয়াইয়া; পূর্ব বাংলায়—জারি, ঘাটু, ভাটিয়ালি ইত্যাদি। এখানে বাংলার আঞ্চলিক গীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাচ্ছে।

চিত্রের উপর নির্ভর করে যে গীত রচিত হয় তাকে বলা হয় পটুয়া। পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভুম প্রভৃতি অঞ্চলে চিত্রকর বা পটুয়া নামে এক শ্রেণীর লোক আছে। তারা হিন্দুর পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর চিত্র অঙ্কন করে তার বিবরণ ঘরে ঘরে গান করে জীবিকা অর্জন করে। পটুয়াগণ রামায়ণ, ভাগবত, মনসামঙ্গল বিষয়ে নানাবিধ পট অঙ্কন করে থাকে। কোন্‌টি কোন্ বিষয়ক পট তা বন্দনা থেকেই বোঝা যায়। নিম্নে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। চিত্রের মধ্যে হয়ত রয়েছে, সাপের ফণার উপর একটি শিশু নৃত্যভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দুপাশে দুজন নাগকন্যা হাত জোড়া করে আছে। এই চিত্রটি উপলক্ষ্য করে পটুয়া গাইবে,—

কালীদহের কূলে ছিল কেলি কদম্বের গাছ।
তাতে চড়ে কৃষ্ণচন্দ্র দিয়েছিলেন ঝাঁপ॥

কালীনাগ আজ আহার বলে সকলে ঘেরিল।
নাগবতী তুইটি কন্যা উপস্থিত হইল॥
নাগের মাথায় পদ দিয়ে, দেখুন, ঠাকুর নাচিতে লাগিল॥[১]

ভাদু।

বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম অঞ্চলে ভাদ্রমাসে কুমারীদের মধ্যে এক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। ভাদ্রমাসে ইহা অনুষ্ঠিত হয় বলে ইহা ভাদু-উৎসব নামে খ্যাত এবং ইহার গান ভাদুগান নামে প্রসিদ্ধ। ভাদুগান অবলম্বন করে কুমারীজীবনের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশলাভ করে। ভাদুগানের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মানভূম জেলার কাশীপুরে নীলমণি সিংহ দেবশর্মা নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর একটি সুন্দরী কন্যা ছিল, নাম ভদ্রেশ্বরী (ভাদু)। রাজকন্যা কুমারী অবস্থায় দেহত্যাগ কবেন। বাজা ইহাতে নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করলেন। কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি রাজ্যমধ্যে প্রতি ভাদ্রমাসে পল্লীতে পল্লীতে ভদ্রেশ্বরীর (ভাদুব) নামে উৎসব পালন করার নির্দেশ দিলেন। প্রজারা রাজার আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। সেই থেকে ভাদু-উৎসব এবং এই উপলক্ষ্য করে ভাদুগান প্রচলিত হয়ে আসছে। কুমারীগণই এই উৎসব পালন করে থাকে। নিম্নে ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। ভাদ্রমাসের প্রথম দিন কুমারীগণ একটি মৃন্ময়ী নারী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে এই গানটি গেয়ে থাকে,—

ভাদুব আগমনে।
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে॥
ভাদু আজকে এলো ঘবে গো এলো গো শুভদিনে।
মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো যত সব সঙ্গিগণে॥
মোরা সারারাতি করব পূজা গো ফুল দিব গো চরণে।
আনব সন্দেশ থালা থালা খাওয়াব ভাদুধনে॥
ভাদুপূজা নাই যেথায় যে গো, কি কাজ তাদের জীবনে।
কাশীপুরের রাজার পূজা গো, সে পূজা করে প্রথমে॥

১। বাংলার লোক-সাহিত্য—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

সে মনের মত বর পেয়েছে যা ছিল গো তার মনে।
ভাদু, বলি তোমায় চরণ তোমার দিবে আমায় মরণে॥

ভাদু-সম্পর্কিত জনশ্রুতিই ভাদুগানের প্রধান অবলম্বন। নিম্নে ভাদুকুমারীর বিবাহসংক্রান্ত একটি গীত উদ্ধৃত কবা হল :

ভাদুর বিয়া দিব আজ নিশীথে।
ভাদুর বর আসছে এবার উড়া জাহাজেতে॥
হলুদ মেখে অঙ্গখানি, বসে আছে চাঁদ-বদনী,
শুভ লগনে শুভ মিলন আশাতে॥
চল সবে জল সইতে, বাজনা বাজিবে সঙ্গেতে।
ভরিব ভর্তি করে নূতন কলসীতে॥
আমার ভাদুর বয়স যত, জামাই করবো মনের মত,
সরল প্রেম রসের প্রেমিক জনেতে॥
নবীনা প্রেমিকা ভাদু, কত শত জানে জাদু,
কত জনে মজায় চোখের চাওনিতে॥

ঝুমুর॥

ঝুমুর হল সাঁওতালি গান। সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জেলার সর্বত্র ইহা সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নায়ক-নায়িকার প্রেমই ইহার বিষয়। নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হলে উভয়ের মধ্যে যে নিদারুণ চিত্তব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় তা ঝুমুর গানে সুন্দর ফুটে উঠেছে। যেমন,—

মায়ে বাপে আমার জনম দিল।
দশে পাঁচে আমার বিহা দিল॥
নদীপারে আমার শ্বশুর বাড়ী।
স্বরগের জল পড়ে নদীতে বান॥
আসা যাওয়ার আমার বারণ হইল।
আগু ত মন দৌড়ে পিছে ত বেঙ।
আঁখির লোর পড়ে মনে মনে॥

বিরহিণীর আক্ষেপ ঝুমুর গানে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে :

আমার মন তোমার মন
একই মন ছিল।
আর ও তুমি পালি (পাইলে)
দোসরের মন।
দেশ হইতে বিদেশ গেলি ল
কই পালি তুলালির ঘর ॥

গম্ভীরা ॥

মালদহ জেলার বিশিষ্ট লোকসঙ্গীতের নাম গম্ভীরা। বাংলার অন্যান্য জেলায় এই গানের প্রচলন নেই। সাধারণত বছরের শেষ তিন দিন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সামিয়ানার তলায় এই গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। নিঃস্ব রিক্ত মানবের অন্তরবেদনার নিবিড় পরিচয় গম্ভীরা গানে পাওয়া যায় :

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব ও শিব, ছেল্যাপিল্যার জান।
ও বুড়া শিব, দয়া কর ॥
পরণে নেতা নাই ও শিব, কবজে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব, ও শিব, মাইয়া লোকের মান।
ও বোকা শিব, দয়া কর ॥

এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করার আছে। এই গানে শিবের নামোল্লেখ থাকলেও শিবের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নেই। শিব এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। শিব সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন যেমন সৃষ্টি করেন, আবার ইচ্ছা করলে তেমন তা দূর করতেও পারেন—এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ তাদের সকল দুঃখ শিবের কাছে নিবেদন করছে।

জাগ ॥

রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করে জাগ গানের উদ্ভব ঘটে এবং পরে ইহা রাজসাহী-পাবনা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এই গান রাত্রি জেগে করা হয় বলে ইহার নাম জাগ গান। কোন লৌকিক আখ্যায়িকা কীর্তন করা জাগ গানের উদ্দেশ্য। উত্তর বাংলার কৃষকবালকগণ সারা পৌষ মাস ধরে রাত্রি

জেগে জেগে এই গান করে থাকে। অধিকাংশ জাগগানে সোনা রায় বা সোনাপীর নামক এক মুসলমান ফকিরের মহিমা কীর্তিত হতে দেখা যায়। যেমন,—

সোনাপীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
এসেছি গোয়ালপাড়া জাহির রেখে যাই॥
আগনড়ি পাছ করে বাতাসে দিল বাড়ি।
নব লক্ষ ধেনু মল বিশ লক্ষ বাছুরি॥
বাতানে পড়িয়া মল বাতানে ভাসুর।
দরবারে পড়ে মল দরবারে শ্বশুর॥
কান্দেরে গোয়ালিনী নারী হস্তে করে দাও।
গোধেনুর বদলে কেন না মরিল মাও॥
কান্দেরে গোয়ালের নারী হস্তে করি কাচি।
গোধেনুর বদলে মা মরিল চাচী॥
কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে করে ঝারি।
গোধেনুর বদলে ফেলাইলাম সাড়ি॥
সোনাপীর উঠে বলে মাণিক পীর রে ভাই।
মেরেছি গরীবের ধন জীয়াইয়া যাই॥
আগড়ি পাছ করি বাতাসে দিল বাড়ি।
নবলক্ষ ধেনু তারা পারে দোড়াদোড়ি॥
বাতানেতে চেতন পেল বাতানে ভাসুর।
দরবারেতে চেতন পেল দরবারে শ্বশুর॥
আগে যদি জানতেম তুমি সোনাপীর।
আগে দিতাম দুগ্ধ কলা পাছে দিতাম ক্ষীর॥
জিন্দা চার যুগের সার।
মারিয়া জীয়াতে পার, অপার মহিমা তোমার॥[১]

ভাওয়াইয়া॥

জলপাইগুড়ি, রংপুর, কোচবিহার অঞ্চলে ভাওয়াইয়া গানের বিশেষ

১। বাংলার লোক-সাহিত্য—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

প্রচলন। এই গানের মধ্যে নারীচিত্তের বেদনা ও অতৃপ্তির ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন,—

পর্থম যৌবনের কালে না হৈল মোর বিয়া,
আর কতকাল রহিম্ ঘরে একাকিনী হয়া,
রে বিধি নিদয়া।
হাইলা পৈল্ মোর সোনার যৌবন্ মলেয়ার ঝড়ে,
মাও বাপে মোর হৈল বাদী না দিল্ পরের ঘরে ;
রে বিধি নিদয়া।
বাপক্ না কও সরমে মুই মাওক্ না কও লাজে,
ধিকি ধিকি তুষির অঘুন জ্বলছে দেহির মাঝে,
রে বিধি নিদয়া।
পেট ফাটে তাও মুখ না ফাটে লাজ সরমের ডরে,
খুলিয়া কোলে মনের কথা নিন্দা করে পরে,
রে বিধি নিদয়া।
এমন মন মোব করে, বে বিধি, এমন মন মোর করে,
মনের মতন চেঙ্গ্ড়া দেখি ধরিয়া পালাও দূরে,
রে বিধি নিদয়া।
কহে কবে কলঙ্কিনী হানি নাইক মোর তাতে,
মনের সাধে করিম্ কেলি পতি নিয়া সাথে,
রে বিধি নিদয়া।

জারি ॥

পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বিশেষ প্রসিদ্ধ। কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত এই গানের বিষয়। জারিগানে করুণরসের সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে। নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে ধর্মযুদ্ধে কাসেমের মৃত্যুতে তদীয় পত্নী সাকিনার শোক মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

হা রে ও আমার প্রাণনাথ, এস এস প্রাণ হৃদি-বাসবে।
কে রঙ্গিল সোনার তনু গো খোনখোরাবি আবিরে (হা রে) ॥
ধর ধর গো পিয়া, এসেছি প্রাণ প্রিয়া
বুকে বিন্‌ছে বিষেব চিতা দেখ নজরে।
অঘোর যু মে ঘুম দিল লো, হা হা, সাকিনা লো তোর ঘরে হারে ॥

ঘাটু ॥

পূর্ব মৈমনসিংহের সংলগ্ন অঞ্চলে—পশ্চিম শ্রীহট্ট ও উত্তর ত্রিপুরাতে ঘাটু গানের বিশেষ প্রচলন আছে। নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী বালককে ঘাটু বলা হয়। ঘাটুগান উচ্চাঙ্গের প্রেমসঙ্গীত। ইহার বিষয় প্রধানত বিরহ। নিম্নে ইহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

(১) সই লো, আর না যাইবাম যমুনার জলে, (ওলো সই)
তোরা যা লো সই, যা লো তোরা, পরাণ আমার যায়! (লো সই)
জলের ঘাটে চিকন কালা, লো সই, জ্বালাইয়া দিল দ্বিগুণ জ্বালা—
কি যে জ্বালায় আমার পরাণ যায়, ওলো সই!
আর না যাইবাম যমুনার জলে।

(২) কি, বৈলেছ মধুর স্থতানে,
আরে আমার সোনার বরণ কোয়িলা
কুহুরব কেন শুনাইলে ॥
প্রিয়ার জ্বালায় কোয়িলারে
জিউ মেরা দগছে
কি আনল জ্বালাইলে ॥
শূন্য দেখিরে কোয়িলা না হেরি কালিয়া বরণে।
সেই না জ্বালায় কোয়িলারে জিউ মেরা দগছে ॥
আরে কোন না দেশে ডাকরে কোয়িল তমালে তোর বাসা,
কোন না দোষে প্রাণনাথে কৈরাছে নৈরাশা।
মরণ কালে ডাইকারে কোয়িল পিয়া নাম ধরে।
জিউ জ্বলেরে কৈয়িলা পিউ মেরা কাঁহারে ॥

চতুর্থ অধ্যায়: গীতিকা

গীতিকা আখ্যানমূলক রচনা। একটি দৃঢ়সংবদ্ধ আখ্যানভাগ অবলম্বন করে ইহা সৃষ্ট হয়ে থাকে। গীতির মধ্যে যেমন সুরের আকর্ষণ বেশি, গীতিকার মধ্যে তেমনি আখ্যানরসের। সাধারণ লোকসঙ্গীতের সঙ্গে

গীতিকার পার্থক্য এইখানে। গীতিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, ইহা শিক্ষিত-সচেতন কবিমনের সৃষ্টি এবং যে সমাজে ইহার উদ্ভব সে সমাজও কৃষ্টিসম্পন্ন। গীতিকার আখ্যানভাগ নিতান্ত গতানুগতিক নয়, ইহার মধ্যে নাটকীয় গতি থাকে। চরিত্রসৃষ্টির একটা প্রবণতাও ইহার থাকে, তবে সেগুলি এক একটি আদর্শ (type) স্বরূপ।

বাংলাদেশে যেসকল গীতিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত: (১) নাথ-গীতিকা, (২) মৈমনসিংহ গীতিকা ও (৩)পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

নাথ-গীতিকা ॥

ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে নাথ-গীতিকার উদ্ভব ঘটে। একদা এক তরুণ রাজপুত্র মাতার নির্দেশে যৌবনে পরিণীতা স্ত্রী ও রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এই কাহিনীকেই কেন্দ্র করে নাথ-গীতিকার উৎপত্তি হয়। ইহার মধ্যে দুটি কাহিনী আছে: একটি নাথগুরুদের সাধন-ভজনের কাহিনী ও অপরটি রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের কাহিনী। নাথগুরুদের যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তা 'গোরক্ষ-বিজয়', 'মীনচেতন' নামে প্রসিদ্ধ এবং গোপীচন্দ্রের যে কাহিনী তা 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', 'ময়নামতীর গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গান', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি নামে পরিচিত।

আদ্যদেব ধর্মের মৃতদেহ থেকে চার সিদ্ধা - মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা ও হাড়িপার উৎপত্তি হয়। আদ্যদেবের আজ্ঞায় শিব গৌরীকে বিবাহ করে সংসার পাতলেন এবং চার সিদ্ধা অবিবাহিত থেকে যোগাভ্যাসে রত হলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানুপা (কৃষ্ণপাদ) হাড়িপার (জালন্ধরিপাদ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করে রইলেন।

গোরক্ষবিজয়

একদিন শিব ক্ষিরোদসাগরে মঞ্চের উপর বসে গৌরীর সঙ্গে তত্ত্বকথা আলোচনা করছিলেন। মীননাথ মাছের রূপ ধরে সেই মঞ্চের নীচে থেকে 'মহাজ্ঞান' তত্ত্ব শুনে নিলেন। গৌরী সব জানতে পেরে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—কার্যকালে মীননাথ মহাজ্ঞান ভুলে যাবেন।

চার সিদ্ধা বিবাহ না করায় গৌরীর ইচ্ছা হল একবার তাঁদের মন পরীক্ষা

করতে। দেবীর ছলনায় এক গোরক্ষনাথ ছাড়া হাড়িপা, কানুপা, মীননাথ —তিনজনেই ভুললেন। দেবী তিনজনকেই অভিশাপ দিলেন। হাড়িপাকে বললেন, 'হাড়িরূপ ধরি যাও ময়নামতী-ঘর'; কানুপাকে বললেন, 'তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়া' এবং মীননাথকে বললেন কদলী-নারীর দেশে গিয়ে রাজা হতে।

শাপগ্রস্ত মীননাথ মহাজ্ঞান ভুলে কদলীর দেশে রাজা হয়ে রইলেন। ভোগসুখের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। গোরক্ষনাথ গুরুর এসব কাণ্ড কিছু জানেন না। একদিন তিনি বকুলতলায় বসে আছেন, এমন সময় কানুপা সেখান দিয়ে আকাশপথে যাচ্ছিলেন। তাঁর ছায়া গোরক্ষনাথের গায়ে পড়তে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পাদুকা ছুঁড়ে দিলেন উপরে। পাদুকা কানুপাকে ধরে গোরক্ষনাথের কাছে উপস্থিত করল। কোন সাহসে তিনি (কানুপা) তাঁর আসনের উপর দিয়ে যাচ্ছেন গোরক্ষনাথ তা জানতে চাইলেন। কানুপা তখন গোরক্ষনাথকে তাঁর গুরুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। গোরক্ষনাথ তখনি লঙ্গ-মহালঙ্গ দুই অনুচর সঙ্গে নিয়ে যোগীর বেশে কদলীর দেশে রওনা হলেন। রাজদ্বারে যোগীবেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় গোরক্ষনাথ নর্তকীর বেশে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু দ্বারী তাঁকে রাজার কাছে যেতে দিলেন না। অগত্যা গোরক্ষনাথ সভাদ্বারে থেকে মাদলে চাঁটি মারলেন। মাদলের ধ্বনি মীননাথের বুকের মধ্যে গিয়ে 'গুরু গুরু' করে বেজে উঠল। মীননাথ তখন নর্তকী তাঁর সামনে উপস্থিত হতে বললেন। গোরক্ষনাথ গুরুকে নমস্কার করে মাদল বাজিয়ে নাচ শুরু করে দিলেন :

নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর,
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর।
নাচন্তি যে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে,
কায়া সাধ কায়া সাধ মন্দিরাএ বোলে।

মীননাথ ইহাতেও যখন গোবক্ষনাথকে ঠিক চিনতে পারলেন না, তখন গোরক্ষনাথ গুরুকে 'হাত-তালে' আর 'মাদলের সানে' তত্ত্বকথা শুনাতে লাগলেন। ইহাতে মীননাথের মনে হল, 'মাদলের রাএ কেনে গুরু মোরে কহে'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন নর্তকীকে (গোরক্ষনাথকে), 'তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে'। গোরক্ষনাথ তখন মাদলে হাত দিয়ে নাচতে নাচতে বললেন, 'শিষ্য-পুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ'। এতক্ষণে মীননাথের

চেতন হল। তিনি কামিনীর ভোল থেকে নিজেকে কেমন করে রক্ষা করবেন গোরক্ষনাথের কাছে তার উপায় জানতে চাইলেন। গোরক্ষনাথ তখন হেঁয়ালীছলে মীননাথকে মহাজ্ঞান স্মরণ করাতে লাগলেন :

পোখরীতে পানী নাই পাড় কেন বুড়ে,
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘর চালে চাল,
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।
ঝিম যাউক বরিষা শীতলে যাউক মীন,
ঝাঁপিয়া তরীতে পাড়ি সমুদ্রে গহীন।
মুখখানি তল গুরু জিহ্বাখানি ফাল,
অমর-পাটনে গিয়া জোড় যেন হাল।

এবারে মীননাথের পূর্ণ চৈতন্য হল। কদলীদের শাপ দিয়ে বাদুড় করে দিয়ে গোরক্ষনাথ গুরু মীননাথকে নিয়ে স্বস্থান বিজয়নগরে ফিবে এলেন।

গোপীচন্দ্রের কাহিনী

গোপীচন্দ্র পাটিকার রাজা মানিকচন্দ্রের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম ময়নামতী। মানিকচন্দ্রের অকালমৃত্যু হলে ময়নামতীব ইচ্ছা হল পুত্র গোপীচন্দ্রকে যোগসাধনায় অমর করাবেন। ষোল বছর বয়সে অদুনা-পদুনার সঙ্গে গোপীচন্দ্রেব বিবাহ হল। এদিকে দেবীর শাপে ময়নামতীর ঘোড়াশালে হাড়িপা সশিষ্য মেথরের কাজ করে চলেছেন। একদিন হাড়িপা শিশু-পুত্রবেশী কানুপার কান্না থামাবার জন্য রাজোদ্যানে নারকেল পাড়তে গেলেন। তিনি হুঙ্কার দিবা মাত্র নারকেল গাছ হেটমুণ্ড হয়ে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল। নারকেল ছিঁড়ে কানুপার হাতে দিয়ে আবার তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন। ইহাতে গাছটি আবার খাড়া হয়ে দাঁড়াল। রাজপ্রাসাদ ময়নামতী এসব লক্ষ্য করলেন। হাড়িপাকে তিনি চিনতে পারলেন। তিনি মনস্থ করলেন, 'ইহারে করিব চেলা রাজা গোবিন্দাই'। গোপীচন্দ্র কিন্তু অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। মাকে তিনি বললেন,—

পাটশালে খাটে হাড়ি না করে সিনান,
তার ঠাঞি কেমনে আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞান।
আমি রাজা গোবিন্দচন্দ্র সর্বলোক জানে,
কেমনে ধরিতে বল হাড়ির চরণে।

ময়নামতী তখন পুত্রকে বুঝিয়ে বললেন,—

শোন পুত্র গোপীচন্দ্র তেজ অভিমান,
ভুবনে তুলনা নাহি জ্ঞানের সমান।
রূপ যৌবন পুত্র তিন দিনের ভোগ,
সিদ্ধি সাধিলে বাছা থাকে চারি যুগ।

গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য হতে রাজী হলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর গোপীচন্দ্রকে গুরুর কয়েকটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। গুরুর আদেশে তিনি কিছুকাল বিদেশে ভিক্ষা করে কাটালেন। তারপর গুরু তাঁকে এক অসতী নারীর কাছে বেঁধে রেখে এলেন। বার বছর পরে তিনি গিয়ে দেখলেন যে গেপীচন্দ্রকে ভেড়া করে রেখেছে। গোপীচন্দ্রকে উদ্ধার করে তিনি মহাজ্ঞান দিলেন। গুরুর আদেশে গোপীচন্দ্র আবার সংসারে প্রবেশ করলেন। গুরুর নিষেধ অমান্য করে একদিন তিনি পত্নীদ্বয়কে যোগবিভূতি দেখাতে লাগলেন। হাড়িপা ইহা জানতে পেরে হুঙ্কার করে গোপীচন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হরণ করে নিলেন। গোপীচন্দ্র আর যোগবিভূতি দেখাতে না পেবে পত্নীদ্বয়ের কাছে উপহাসাস্পদ হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তখন হাড়িপাকে মাটির নীচে পুঁতে রাখার আদেশ দিলেন। বার বছর হাড়িপা মাটির নীচে পোঁতা রইলেন।

এদিকে গোরক্ষনাথের কাছে কানুপা জানতে পারলেন যে তাঁর গুরু হাড়িপা মাটির ভিতর পোঁতা আছেন। কানুপা তখন শিশুযোগীর বেশে গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। কোটাল তাঁকে বড় রাণীর কাছে উপস্থিত করলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ-দেশে নাহিক যোগী তুমি আইলা কেনি'। শিশুবেশী কানুপা উত্তর দিলেন,—

গুরুহীন শিশু আমি নাহি মোর জ্ঞান,
নাহি জানি যোগতত্ত্ব নাহি জানি ধ্যান।
গৃহস্থ বালক আমি গেনু খেলাইতে,
এক যোগী সন্দেশ দিল মোর হাথে।
অজ্ঞান হইয়া আমি ফিরি একেশ্বর,
জানিতে না পারি আমি কোথা দেশ ঘর।

দয়াপরবশ হয়ে রাণী তাঁকে ছেড়ে দিলেন। কানুপা রাজার দরবারে

উপস্থিত হয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ষোলশ যোগী আবির্ভূত হল। রাজা তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে না পেরে কানুপার পায়ে পড়লেন। হাড়িপাকে মাটির ভিতর থেকে বার করা হল। রাজা গোপীচন্দ্রের তিনটি সোনার মূর্তি গড়িয়ে হাড়িপার সামনে পর পর বসিয়ে রাখা হল। ধ্যানভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রুদ্র দৃষ্টিতে মূর্তি তিনটি ভস্ম হয়ে গেল। রাজা গোপীচন্দ্রের বিপদ কাটল। হাড়িপা তারপর রাজাকে যোগীর বেশ পরিয়ে দক্ষিণদেশে চলে গেলেন।

মৈমনসিংহ গীতিকা ॥

মৈমনসিংহ গীতিকা বাংলা লোক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কাহিনী পরিকল্পনা, চরিত্রসৃষ্টি দুঃখ-বিরহাদি বর্ণনার দিক থেকে ইহা উচ্চতর সাহিত্যের সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। মৈমনসিংহ গীতিকা প্রেমমূলক। মানবচিত্তে প্রেমের বিকাশ যে কত বিচিত্র ভাবে ঘটতে পারে এবং আঘাতে-সংঘাতে তা কতখানি মহিমান্বিত হয়ে উঠতে পারে তার পরিচয় আছে এই গীতিকাতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট পালা--'মহুয়া' 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা', 'দেওয়ান ভাবনা' 'দস্যু কেনারাম', 'রূপবতী', 'কঙ্ক ও লীলা', 'দেওয়ানা মদিনা' রয়েছে। এর প্রত্যেকটি পালাগানের মধ্যে গীতিকার সার্থক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবিগুরু বলেছেন,—"বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকা বাংলার পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছধারা।"

মৈমনসিংহ গীতিকায় কবিদের বর্ণনশক্তির অপূর্ব দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, নবযৌবনে সমাগতা কন্যার লজ্জারক্তিম ভাবটি—

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন।
লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥

প্রিয়াসঙ্গ বিহনে বিরহিণীর দুঃখ—

রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষ্ণা পিয়াসে কাতর॥

কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনী ॥
কাহারে শুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি।
আমিও তোমার মত চির বিরহিণী ॥

দীর্ঘ বিরহের পর মিলন সুখের প্রগাঢ় অনুভূতি—

মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ॥
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন ॥

হারানোর নিঃসীম বেদনা—

শুন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুন্দরী।
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী ॥
খালি পিঞ্জরা পইড়া রইছে উইরা গেছে তোতা।
নিব্যাছে নিশার দীপ কইরা আন্ধাইরতা ॥

নারীর বলিষ্ঠ কণ্ঠের বিদ্রূপ—

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥

প্রেমনিবেদনের মধুর প্রস্তাব—

জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিচ্ছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥

পূর্ববঙ্গ গীতিকা ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলি গীতিকা পূর্ব মৈমনসিংহ হতে সংগৃহীত হয়েছে। সুতরাং এই গীতিকাগুলি মৈমনসিংহ-গীতিকারই সামিল। 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র অবশিষ্ট গীতিকাগুলি খাটি পূর্ববঙ্গের গীতিকা, এগুলির উৎপত্তি দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে।

পূর্ববঙ্গের গীতিকার কয়েকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য আছে। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনী প্রেমের কাহিনী, আর পূর্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনী দস্যুর কাহিনী। মৈমনসিংহ গীতিকায় নারীচরিত্রের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, পূর্ববঙ্গ গীতিকায় পুরুষচরিত্রের মর্যাদা নারীবই সমান। পূর্ববঙ্গ গীতিকার কবিগণ সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী। সবসময়ে তাদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সতর্ক থাকতে হত, দুঃসাহসিক কার্যের সাধনা করতে হত। এজন্য দেখা যায়, পূর্ববঙ্গ গীতিকা দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। নিভৃত পল্লীর সেই সুখ-শান্তি এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে না থাকায় ইহাদের বচিত গীতিকা সাহিত্যরসে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি। আর একটি জিনিস পূর্ববঙ্গ গীতিকার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমানের বাস বেশি থাকায় এই অঞ্চলেব গীতিকাব উপব মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে। মুসলমান ধর্মেব আদর্শ প্রচারেব জন্য বহু সাধু-ফকিরের আবির্ভাব হয় এই অঞ্চলে। এইসব সাধু-ফকিরদের অলৌকিক কাহিনী গীতিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে। পূর্ববঙ্গ-গীতিকাব মধ্যে 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'কাফেন চোরা', 'চৌধুরীর লড়াই', 'ভেলুয়া' ও 'নুরন্নেহা ও কবরের কথা' প্রভৃতি গীতিকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে 'ভেলুয়া'তে প্রেমের আখ্যান এবং 'নুবন্নেহা ও কববের কথা'তে পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রবেব বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: কথা

মানুষের গল্প শোনার আকর্ষণ দুর্নিবার ও চিরন্তন। গদ্য-পদ্য উভয় রচনাতে গল্প-কাহিনী বর্ণিত হতে দেখা যায়। পদ্যের মধ্য দিয়ে যে কাহিনী প্রকাশিত হয় তা গীতিকা নামে প্রসিদ্ধ এবং গদ্যের ভিতর দিয়ে যা প্রকাশিত হয় তা কথা নামে পরিচিত। কথার বৈশিষ্ট্য হল, ইহাতে কোন মৌলিক বিষয়বস্তুর সমাবেশ দেখা যায় না, লোক-পরম্পরায় যা চলে এসেছে তাই ইহাব একমাত্র উপকরণ। কথাকে স্থূলভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়: রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথা।

অবাস্তব কল্পনার উপর নির্ভর করে যে কথা সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় রূপকথা। রূপকথার বৈশিষ্ট্য হল, "ইহার পরিবেশটি সম্পূর্ণ অসম্ভব ও স্বপ্নিল—সুনির্দিষ্ট কোনও স্থান ও সুস্পষ্ট কোনও চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হয় না, অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ। ইহার নায়ক সাধারণতঃ কোনও অপরিচিত দেশের রাজপুত্র এক নূতন অপরিচিত দেশে প্রবেশ করিয়া অসম্ভব কতকগুলি বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরিণামে সেই দেশের রাজার কন্যাকে বিবাহ ও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিবে।"[১] মৈমনসিংহ গীতিকার 'কাজল রেখা' পালা' এবং আমাদের বিশেষ পরিচিত 'ঠাকুমার ঝুলি' রূপকথা উল্লেখ্য নিদর্শন।

রূপকথা

পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করে যে কথার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় উপকথা। উপকথার উদ্দেশ্য হল, রস-রসিকতার সাহায্যে নীতি-শিক্ষা দান। এখানে পশুপক্ষীর আচারণ, হাবভাব সবই মানুষের মতই। ইহাদের নির্বুদ্ধিতা হাস্যরসের উদ্রেক করে এবং সেই সঙ্গে তা মানুষকে নীতিশিক্ষা প্রদান করে। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, কথাসরিৎ-সাগর ইত্যাদিতে পশুপক্ষীর রূপকের ছদ্মবেশে উপদেশ মূলক কথাকাহিনী প্রচলিত আছে। পশুর মধ্যে শৃগাল, বাঘ, পক্ষীর মধ্যে কাক, চড়ুই, টুনটুনি ইহাদের চরিত্রকথা বাংলা উপকথায় স্থান পেয়েছে।

উপকথা

লৌকিক দেবদেবীর কাহিনী অবলম্বন করে বাংলার ব্রতকথাগুলি রচিত হয়েছে। দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনই ব্রতকথার প্রধান উদ্দেশ্য। রূপকথার মধ্যে যেসব অসম্ভব ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে, ব্রতকথার মধ্যে সেগুলি দেবনির্দেশেই সংঘটিত হয়ে থাকে। রূপকথার সঙ্গে ব্রতকথার এইখানে পার্থক্য। ব্রতকথাতে ললাট-লিপির অবশ্য সম্ভাব্যতার কথা বর্ণিত হয়ে থাকে বলে অদৃষ্টবাদী সমাজ ইহার দ্বারা নিজের জীবনের দুঃখশোকে সান্ত্বনা লাভ করে। ব্রতকথার চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় না। ইহাতে সৌভাগ্যের

ব্রতকথা

১। বাংলার লোক-সাহিত্য—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

চিত্র নির্দেশ করাব কালে বাজা-সওদাগর এবং দুর্ভাগ্যের চিত্র নির্দেশ করার কালে দরিদ্র বামুনের চরিত্র হয় প্রধান। ব্রতকথার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধাঁধা

ধাঁধা লোকসাহিত্যেব একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। আকারে ইহা ক্ষুদ্র হলেও ইহার মধ্যে বীতিমত বুদ্ধির ব্যায়াম দেখা যায়। তাই বলে ধাঁধা শুষ্ক বুদ্ধির প্রকাশমাত্র নয়, ইহাব ভিতরে সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঘরোয়া-বাস্তবজীবনেব যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করে ইহা সৃষ্টি হয়। ঘরের উনুন, শিল, নোড়া, ছাতা, লাঠি, হুঁকা হতে আরম্ভ করে প্রকৃতির চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ পর্যন্ত সবই ইহার বিষয়। নিম্নে কয়েকটি ধাঁধা উল্লেখ কবা যাচ্ছে :

(১) বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপব মাথায় দিয়ে। —(আনারস)

(২) বিধাতা নির্মাণ ঘরে নাহিক দুয়াব।
তাহাতে পুরুষ এক বৈসে নিরাহাব ॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতার সৃজন ঘব করে খান্ খান্ ॥ —(ডিম)

(৩) বিষ্ণুপদ সেবা কবে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছ পল্লব নয় কিন্তু অঙ্গে পত্র হয় ॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসব চল্লিশে ॥ —(পাখী)

(৪) বেগে ধায় বথখান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তাব পসারিয়া গা ॥
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি ॥ —(ঘুড়ি)

(৫) তৃষ্ণায় আকুল সেই জল খাইলে মরে।
স্নেহ নাহি করিলে তিলেক নাহি তরে॥
উগারয়ে অন্য বস্তু অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ॥ —(প্রদীপ)

(৬) দেখিতে রূপস দুই মুখ এক কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায়॥
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভামাঝে বৈসে॥ —(উনুন)

(৭) জীয়ন্তে মৌন সেই মৈলে ভাল ডাকে।
গায়েতে নাহিক ছাল বিধির পাকে॥
সেবা করিয়া থাকে দেবতার স্থানে।
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে॥ —(শাঁখ)

(৮) রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীবনকালে পৃথক্ মরণে এক ঠাঁই॥
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মূর্খে কিবা জানে।
হিঁয়ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে॥ —(পাশার গুটি)

(৯) যোগী নয় সন্ন্যাসী নয় মাথায় হুতাশন।
ছেলে নয় পিলে নয় ডাকে ঘন ঘন॥
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে।
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম খায় মুখে॥ —(হুঁকা)

(১০) কাল ধল দুই পক্ষ নহে কাক হাঁস॥
আট হাজার লক্ষ পণ, জল কৈলে মাস॥
পালিবে যে দুই পক্ষ কর অঙ্গীকার।
রোহিণী বলেন তবে করিবে বেহার॥
হর, জান প্রহেলিকা, হর, জান প্রহেলিকা।
নহে পুষ্প দেহ যুতি মৃালতী মল্লিকা॥ —(চন্দ্র)

পরিশিষ্ট

আরাকান রাজসভায় মুসলমান কবি

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পুনঃপুনঃ বিরোধ-বিসংবাদের ফলে মধ্যযুগের বাংলার আকাশ বিষবাষ্পে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ইহার সাক্ষ্য দেয় না। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির একটা সমন্বয় আদর্শ আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে দেখতে পাই। মাঝে মাঝে ধর্মান্ধতা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজাত প্রীতি ও মিলনের বাসনা-মূলে কুঠারাঘাত করেছে, ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত করেছে সে-কথা সত্য। তথাপি পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ভাব ও মিলনের প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। মুসলমান শাসকগোষ্ঠী যে মাঝে মাঝে হিন্দুর উপর প্রচণ্ড রোষ বর্ষণ করেছেন, অত্যাচারে-উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন তা শাসনব্যবস্থার পরিকল্পিত নীতির ফল নয়, তা উচ্চপদস্থ ক্ষমতালোভী ও বিদ্বেষ-পরায়ণ কর্মচারিগণের অত্যাচার-প্রবণতা ও আকস্মিক ঘটনাপ্রসূত বলেই মনে হয়। তা না হলে মুসলমান সুলতান-সেনাপতি-উজীর কখন হিন্দু কবিকে কাব্য-রচনার উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিতেন না, পুরাণাদি অনুবাদের আজ্ঞা দিতেন না, রাজসভায় হিন্দুধর্মের আলোচনা করতেন না। হোসেন শাহ্, নসরত শাহ্, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি গৌড়প্রধানগণের যে সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা হিন্দু কবিগণ লাভ করেছিলেন তাও সম্ভব হত না।

মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন যে কত গভীর হয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারি আরাকান রাজ্যের মগরাজাদের রাজ-সভায় মুসলমান কবিদের সাহিত্যসাধনা থেকে। আরাকান বাংলার বাইরে ব্রহ্মদেশের নিম্নাঞ্চলের একটি বিভাগ। সেখানে ধর্ম-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য সব দিকে ভিন্ন একটা পরিবেশের মধ্যে বাংলা কাব্যের এরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধি কিভাবে দেখা দিল তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। আরাকানীরা বর্মী। তাঁদের ভাষা-সাহিত্য, আচার-আচরণ সবই ব্রহ্মের থেকে ভিন্ন। আরাকান চট্টগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চল বলে ভাব-ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একে অন্যের দ্বারা

গভীরভাবে প্রবাভিত হয়েছে। আরাকানের বৌদ্ধরাজারা পালি-প্রাকৃতের সঙ্গে ধর্মসূত্রে জড়িত থাকলেও, তাঁদের সভাসদ ও প্রজাপুঞ্জের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। বৌদ্ধরাজগণ সিংহাসনে আরোহণ কবে একটি করে মুসলমান নামও গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। এ সকল কারণে আরাকান রাজসভা হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতিব একটা মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ইহার ফলে, খুব স্বাভাবিক কারণে মগবাজাদের রাজসভায় মুসলমানী সাহিত্য গড়ে ওঠে।

আরাকান রাজসভায় যে দুজন কবি আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করে গিয়েছেন তাঁদেব একজন হলেন দৌলত কাজি ও অপর জন আলাওল।

দৌলত কাজি

দৌলত কাজি রাজা সুধর্মের (১৬২২-১৬৩৮ খ্রীঃ অঃ) রাজত্বকালে আশরফ খাঁর (রাজার প্রধান অমাত্য) আদেশে 'সতী ময়না ও লোব-চন্দ্রানী' কাব্য রচনা কবেন। কাব্যটির আখ্যানভাগ কবি আশরফ খাঁব নির্দেশে হিন্দী হতে বাংলায় বর্ণনা করেন। দৌলত কাজির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তিনি এবং লস্কর উজীব আশরফ খাঁ উভয়েই চট্টগ্রামেব অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে।

'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী'র আখ্যানভাগ চিত্তাকর্ষক। রাজপুত্র লোর এক অপূর্ব-সুন্দরী পতিব্রতা কন্যা ময়নামতীকে বিবাহ কবেন। একবাব তাঁর কানন বিহারের ইচ্ছা হল।

'সতী ময়নাও লোরচন্দ্রানী'র কাহিনী

তিনি ময়নামতী ও প্রধান পাত্রমিত্রদের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত কবে বনে গেলেন। সেখানে তিনি এক যোগীর কাছে গোহারী-রাজকন্যা চন্দ্রানীর সুন্দব প্রতিকৃতি দেখে মুগ্ধ হলেন। চন্দ্রানী মহাবীর বামনের পত্নী। সেকথা জেনেও লোর চললেন গোহারী দেশে। সেখানে তিনি চন্দ্রানীর সঙ্গে দেখাকরলেন। তাবপব একদিন গভীর রাত্রিতে অন্তঃপুরে গিয়ে লোর চন্দ্রানীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এদিকে সংবাদ এল, বামন মৃগয়া থেকে ফিরে আসছেন। লোর-চন্দ্রানী তখন গোপনে অরণ্যপথে পলায়ন করলেন। পথিমধ্যে বামনের সঙ্গে দেখা। লোরের সঙ্গে বামনেব প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধল। সংগ্রামে বামন প্রাণ দিলেন। ততক্ষণে চন্দ্রানীও সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেছেন। লোর চন্দ্রানীর শোকে কাতব হয়ে পড়লেন। শেষে এক ঋষি এসে চন্দ্রানীর জীবনদান করলেন। লোরচন্দ্রানী আবার গোহারি রাজ্যে ফিরে এসে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে লাগলেন।

এদিকে সতী ময়নার দুঃখ-বিরহের আর অন্ত নাই। রতনা মালিনীকে ডেকে তিনি বললেন,—'মালিনী কি কহব বেদন ওর। লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।' রতনা মালিনী ছিলেন কপটস্বভাবা। তিনি 'ছাতন কুমারে'র সঙ্গে ময়নামতীর মিলনের চেষ্টায় রইলেন। কিন্তু সতী ময়না ইহাতে এতটুকুও বিচলিত হলেন না।

ইহার পর কবির মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার ত্রিশ বছর পরে আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মের মহাপাত্র সুলেমান এই অসম্পূর্ণ কাব্যটি সম্পূর্ণ করার জন্য আলাওলের উপর ভার দেন। পরিণত বয়সে আলাওল কাব্যটি সমাপ্ত করেন। কাব্যটির শেষাংশে দেখা গেল, ময়নামতী ধৈর্যহারা হয়ে মালিনীকে প্রহার করেছেন। মালিনী তারপর সখীর সঙ্গে পরামর্শ করে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে লোরের কাছে প্রেরণ করলেন। সুচতুর ব্রাহ্মণের দৌতকার্যে সতী ময়নার সঙ্গে লোরের মিলন হল। এভাবে কবি দ্রুত ও কৃত্রিমভাবে কাব্যের উপসংহার করেছেন।

দৌলতকাজির কবিত্ব

কাব্য রচনায় দৌলতকাজি উচ্চ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনাবিবৃতির ক্ষেত্রে কবির মনন ও অনুভূতির পরিচয় যেমন আছে, তেমনি ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্য ও সরস প্রকাশভঙ্গীও পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু পুরাণাদি থেকে উপমা ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে কবি কাব্যের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত একটা অধ্যাত্ম-ভাব-প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

আলাওল

আরাকান রাজসভার আর একজন শক্তিশালী কবি হলেন আলাওল। আলাওলকে শুধু কবি বললে ভুল হবে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত-কবি। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিপ্রতিভার এমন অপূর্ব সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর, দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার মধ্যে কবি কেমন করে জ্ঞান-সিন্ধু সিঞ্চন করে মুক্তা সংগ্রহ করলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। জ্ঞানের রাজ্যে আলাওল ছিলেন সব্যসাচী। একদিকে ইসলাম ধর্মে যেমন তিনি বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে তেমনি হিন্দুর যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয়ে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছিলেন।

আলাওলের ব্যক্তিজীবন দুঃখ-বিড়ম্বনাময়। তাঁর আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, তিনি রাজ-অমাত্যের পুত্র ছিলেন। একবার নৌকাযাত্রার সময়ে কবি ও তাঁর পিতা পোর্তুগীজ জলদস্যুর কবলে পড়েন। যুদ্ধে কবির পিতা প্রাণ দেন। কবিও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় আরাকানে এসে উপস্থিত হন এবং অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করেন। এসময় কবির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির স্ফুরণ ঘটে। ইহাতে মাগন, সোলেমান প্রভৃতি রাজ অমাত্যদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। কবি তাঁদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। এর পর কবির আবার নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিল। সাজাহানের পুত্র শাহ্ সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে আরাকান রাজের বিরাগভাজন হন এবং নির্মম চক্রান্তে পড়ে তাঁকে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হয়। আলাওলও শাহ্ সুজার পক্ষাবলম্বী বলে মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন এবং এর ফলে তাঁকে এগার বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কারামুক্তির পর আবার কবিকে দুঃসহ দারিদ্র্যের জ্বালা অনেককাল ভোগ করতে হয়।

আলাওলের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি হল পদ্মাবতী কাব্য। কাব্যখানি সুফী সাধক ও প্রখ্যাত হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের ভাবানুবাদ। আরাকান রাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মের (১৬৫২—১৬৮৪ খ্রীঃ অঃ) আমলে রাজ-অমাত্য মাগনঠাকুরের নির্দেশে আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেন। পদ্মাবতীর কাহিনী এরূপ,—চিতোররাজ রত্নসেন সিংহলরাজকন্যা পদ্মিনীর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে একটি শুকপাখি নিয়ে সিংহল গমন করেন। শুকপাখির সহায়তায় রাজা পদ্মিনীকে লাভ করে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। কিছুকাল পরে সম্রাট আলাউদ্দিনের লোলুপ দৃষ্টি পড়ল চিতোরের দিকে। তিনি পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন এবং রত্নসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে ফিরে এলেন। রত্নসেনের পরম সুহৃদ ছিল গৌরী ও বাদিনা। তাঁরা কৌশলে রত্নসেনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এদিকে রত্নসেনের অনুপস্থিতিতে রাজা দেওপাল পদ্মিনীকে বিপথগামিনী করার চেষ্টা করেন। রত্নসেন দেওপালকে যুদ্ধে নিহত করলেন এবং নিজেও গুরুতরভাবে আহত হয়ে কিছুকাল পরে প্রাণত্যাগ করেন। পদ্মিনী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হলেন। এসময় আলাউদ্দিনও চিতোরে এসে উপস্থিত হন। তিনি পদ্মিনীর

জীবনের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে দিল্লীতে ফিরে আসেন।

পদ্মাবতী ছাড়া আলাওল আরো কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ 'সয়ফুলমুল্লুক বদিউজ্জমাল' (১৬৫৯), 'সপ্তপয়কর' (১৬৬০), 'তোহফা' (১৬৬৪), 'সেকেন্দরনামা' (১৬৭৬) রচনা করেন। এগুলি উর্দু ও পারস্যভাষায় রচিত গ্রন্থের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। আলাওল কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতাও রচনা করেছিলেন।